শ্রী অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

# গয়া-কাহিনী

দ্বারভঙ্গাধিপতি অনারেবল মহারাজা বাহাদুর

স্যর, রামেশ্বর সিং কে, সি, আই, ই।

# গঙ্গা-কাহিনী * * *

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় * * *


প্রথম সংস্করণ

১৩২২

মূল্য দুই টাকা।

প্রকাশক

শ্রীমথুরানাথ সেন,

সিটীবুক সোসাইটী,

৬৪ নং কলেজষ্ট্রীট্,

কলিকাতা।

স্বর্ণপ্রেস

৩৭, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্

কলিকাতা

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।



১৩২২

## Letter from Satyendra Nath Tagore, Esq., I.C.S., (Retired), Late President of the Bangiya Sahitya Parishad (Bengal.)

Ranchi, September 26, 1915.

My dear Atulchandra,

I have just looked through the File copy of your interesting book on Gaya and have much pleasure in recommending it to students and the public at large. You have dealt with Gaya in its varied aspects—mythological, historical, sacerdotal and religious—and it will, no doubt, be a valuable addition to our literature on the subject. I think it well deserves the patronage of Government and the public. The sanctity of Gaya is well established in India. It is held sacred by Hindus and Buddhists alike—to the former it appeals as the place where important Sraddha and Pindadan ceremonies are performed in commemoration of departed ancestors ;—to the latter as the place associated with Buddha Gaya where the Lord Buddha attained his Buddhahood and as the scene of his early missionary activity. So that your book is sure to meet with welcome in Bengal and among the Bengali-speaking people of this Province. Its language necessarily precludes it from finding a wider public. But it will furnish materials even to those Hindus,—at least to some of them—whose language is not Bengali, to enrich their own language by following the line of research which you have adopted and to offer to their own people similar publication in their own language. Great credit is due to you for the masterly manner in which you have treated the subject and I should be glad to hear of your success.

Yours Sincerely,

(SD) Satyendra Nath Tagore.

DEDICATED

TO

THE HON'BLE MAHARAJA

BAHADUR

SIR RAMESWAR SINGH, G. C. I. E.,

OF

DARBHANGA

WITH

PROFOUND GRATITUDE.

## স্তোত্র ।

পিতৄন্নমস্যে নিবসন্তি সাক্ষ্যাৎ ।
যে দেবলোকেচ তথান্তরীক্ষে ॥
মহীতলে যে চ সুরাদিপূজ্যা-
স্তে মে প্রতীচ্ছন্তু ময়োপনীতম্ ॥
পিতৄন্নমস্যে পরমাত্মভূতা
যে বৈ বিমানে নিবসন্তি মূর্ত্তাঃ ॥
যজন্তি যানস্তমলৈ র্মনোভি-
র্যোগীশ্বরাঃ ক্লেশবিমুক্তিহেতূন্ ॥
পিতৄন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ ।
স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ ॥
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং ।
বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু ॥

---

# নিবেদন।

'গয়া-কাহিনী' প্রকাশিত হইল। প্রাচীন ঋষিদের গয়াতত্ত্বের অনুসরণে এই গ্রন্থ লিখিত। আমাদের গৌরবময় অতীত যুগে আর্য্য-ঋষিদের সাধনালব্ধ অমূল্য তত্ত্ব এই গ্রন্থে আমি যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহার অধিকাংশ পুরাতন কথা, সেই পুরাতন কথাকে নূতন আকারে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান যুগে গয়ার ইতিহাস ও রহস্য অবগত হইবার জন্য জন-সাধারণের আগ্রহ জন্মিতে পারে এই ধারণায় আমি সেই পুরাতন কথাকে 'গয়া-কাহিনী' নাম দিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

পাঠক-পাঠিকার সুবিধা হইবে ভাবিয়া এই পুস্তকের একটা শ্রেণিবিভাগ করা হইয়াছে। 'পৌরাণিকী কথায়' আমি মূলতঃ 'বায়ু-পুরাণের' অন্তর্গত গয়া-মাহাত্ম্যের অনুসরণ করিয়াছি। এই দেবতত্ত্ব হইতেই গয়াতীর্থের উৎপত্তি। 'ইতিহাসে গয়ায়' গয়ার হিন্দু, বৌদ্ধ ও আধুনিক ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার প্রয়োজন তাহা যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পুত্র গয়াধামে যাইয়া কি কাজ করিবেন সে বিষয় 'গয়াকৃত্য' অংশে শাস্ত্র হইতে সঙ্কলন করা হইয়াছে। এই অংশে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'গয়াকৃত্যতত্ত্ব' পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। 'গয়ালী' প্রবন্ধে আমি অবসরপ্রাপ্ত সবজজ বরদা বাবুর সুলিখিত 'Old Gaya and the Gywals' পুস্তিকা হইতে এবং গয়ায় যাইয়া গয়ালীদের নিকট হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি।

প্রারম্ভে সুলেখিকা শ্রীযুক্তা কুলকুমারী গুপ্তার 'গয়াধাম ও পিণ্ডদান' ও আমার পরম সুহৃৎ সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত 'গয়া' প্রবন্ধ দুইটী উভয়ের অনুমতি লইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এইজন্য আমি তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণে মুণ্ডা ও ওরোয়াং জাতির ইতিহাস রচয়িতা আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় এম, এ বি এল, 'বিশ্বকোষ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব, পরম সুহৃৎ বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-নাথ গুপ্ত, পাটনা কলেজের অধ্যাপক ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নাথ সমাদ্দার ও আমার সতীর্থ ঢাকা ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ আমাকে উপাদান সংগ্রহে সাহায্য না করিলে এই গ্রন্থ লোকলোচনের গোচরীভূত করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। ইহাঁদের স্নেহঋণ আমার পক্ষে অপরি-শোধনীয়। কলিকাতা স্বর্ণপ্রেসের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মথুরা-নাথ চক্রবর্ত্তী ও ভট্টাচার্য্য সন্‌এর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এই গ্রন্থের উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। অপর সুহৃদ্বর বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত কে, ভি, সেন গ্রন্থের চিত্র ও ব্লক যথাসাধ্য উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। উপরোক্ত উদারহৃদয় বন্ধুবর্গের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, দরভঙ্গার মাননীয় মহারাজা স্যর্

রামেশ্বর সিংহ জি, সি, আই, ই, মহোদয় বাহাদুর আমাকে এই পুস্তক মুদ্রণে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য ভিন্ন 'গয়া-কাহিনী' মুদ্রণে আমি কখনই সাহসী হইতাম না। এইজন্য আমি মহারাজার নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার সাহিত্যচর্চ্চার উৎসাহদাতা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সতেন্দ্রনাথ ঠাকুর I. C. S. ( Retired ), উদারধী জষ্টিস শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি এল, ও ভক্তিভাজন জষ্টিস স্যর্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে, টি, এম এ, ডি এল পি এইচ ডি, এই তিন মনীষীও আমাকে এই কার্য্যে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমি চির ঋণী। কবিকল্প মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয় স্নেহবশতঃ এই গ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ ও সুচিন্তিত ভুমিকা লিখিয়া আমার পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাকে যথোচিত ভক্তি মিশ্রিত কৃতজ্ঞতা জানাইব এমন ভাষা আমার নাই। তবে তিনি নিয়ত শ্রেয়ঃকে প্রাপ্ত হউন ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। অলমিতি।

বিদ্যাবিনোদ কুটীর,<br>
গ্রাম দেবভোগ,<br>
পোঃ মুন্সীগঞ্জ,<br>
জিলা ঢাকা,<br>
আশ্বিন, ১৩২২।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

# সূচীপত্র

# পরিশিষ্ট

# চিত্রসূচী

# ভূমিকা।

বেদ, তন্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ যে জাতির ধর্ম্মের উপদেষ্টা, সদাচারের নিয়ন্তা, সৎপথের প্রদর্শক, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক, নিষিদ্ধ কর্ম্মের নিবর্ত্তক, সেই ভারতের—সেই আদি নিবাসী, পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যজাতি নিজের ঐহিক আমুষ্মিক কল্যাণ সাধন অপেক্ষায় পিতামাতার কল্যাণ সাধনে অধিক অগ্রসর। সে জাতি সর্ব্বাগ্রে পিতামাতার পারলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন না করিয়া নিজের জন্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না, কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল হয় না, কাশী প্রভৃতি মুক্তিতীর্থে পরিভ্রমণ করে না। তন্ত্র স্মৃতি পুরাণের অনুশাসনে, ভগবদ্‌বাক্য ভগবদ্গীতার উপদেশে সেই সনাতন আর্য্য নরনারীর হৃদয়ে আত্মা অবিনশ্বর বলিয়া প্রতিভাত। যুক্তিতর্কের আশ্রয়ে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের অবতারণায় তাহাদিগকে আত্মার অস্তিত্ব বুঝাইতে হয় না, আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রতিপাদনে আত্মতত্ত্ববাদী করিতে হয় না; জননে আত্মার উদ্ভব মরণে আত্মার বিনাশ এ বিশ্বাস তাহাদিগের কল্পনার অতীত। অদৃষ্টবাদী ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া ধূলিপাদ হালিকও এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী। সুতরাং এ দেশের জন্য এ দেশবাসীর জন্য অচ্ছেদ্য তর্ককে ভিত্তি করিয়া আত্মতত্ত্ব প্রমাণে প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণের আবশ্যকতা মনে করি না। সেজন্য ভ্রমপ্রমাদবর্জ্জিত অনন্ত জ্ঞানের আকর অনন্ত বেদ রহিয়াছে,—বেদের শিরোভাগ বেদের অন্ত মায়াবরণের উন্মোচক অনাদি নিবিড় অন্ধকারের সংহারক ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশক

নিবাতনিষ্কম্প মহাপ্রদীপ উপনিষৎ রহিয়াছে; চিন্ময়ী আনন্দময়ী গৌরীকে অর্দ্ধাঙ্গে নিমগ্ন করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের পঞ্চবক্ত্র-নিঃসৃত ধারাধরের অমৃতধারার ন্যায় বিগলিত আগম রহিয়াছে; আর রহিয়াছে ভগবান্ মনু প্রভৃতি মহর্ষিবৃন্দ বেদার্থের স্মরণ করিয়া যে সকল স্মৃতি সংহিতার সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা, ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের পবিত্র লেখনী হইতে যে অষ্টাদশ পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা এবং গোতম কণাদ কপিল পতঞ্জলি জৈমিনি বেদব্যাস যে সূক্ষ্মতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া বেদার্থ নির্দ্ধারণের জন্য যে দর্শন শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন তাহা।

ভ্রম প্রমাদ সংশয় নিবারণের জন্যই যুক্তির প্রদর্শন দ্বারা বিষয় প্রতিপাদনের প্রয়োজন; যে বিষয়ে যাহার ভ্রম নাই, বিপ্রতিপত্তি নাই, সেই বিষয়ে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া অপরিচিত সংশয়ের আমন্ত্রণ করা সর্ব্বথা বিগর্হিত। যাঁহাদিগের সেই সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিবার অধিকার আছে, তর্কপ্রণালী বুঝিবার ও করিবার সামর্থ্য আছে তাঁহাদিগের জন্য পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থরাশি বিদ্যমান আছে। তাঁহাদিগকে সেই সকল গ্রন্থ দেখিবার জন্য কিঞ্চিৎ শ্রম ও আয়াস স্বীকার করিতে অনুরোধ করি। আত্মার অবিনশ্বরত্ব থাকিলে মরণান্তে লোকান্তর হয় অবশ্য স্বীকার্য্য। দেহী আত্মা মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেহত্যাগ করিতে একান্ত অসমর্থ। দেহ থাকিলেই ইন্দ্রিয় আছে, ইন্দ্রিয় থাকিলেই জ্ঞান আছে, ভোগ আছে, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞেয় আছে, ভোগ থাকিলেই ভোগ্য আছে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেরই মানবের মত ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু মানবের মত সামর্থ্য

নাই; মানুষ যেমন হস্তদ্বারা আহরণ করিতে পারে পদদ্বারা গমন করিতে পারে, মুখ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের প্রতিপাদক পৃথক্ পৃথক্ শব্দের উচ্চারণ করিতে পারে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ তাহা করিতে পারে না। আবার পক্ষী অনন্ত আকাশে সন্তরণ করিতে সমর্থ, মৎস্য অগাধ জলনিধির অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে সক্ষম, মানুষের সে শক্তি নাই। ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রধান পশু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহায়তায় যাহা অবধারণ করিতে সমর্থ, মানুষের সে বিষয়ে সামর্থ্য নাই। বলিতে কি, পিপীলিকার যে শক্তিবিশেষ আছে, মানুষের সে শক্তিবিশেষ নাই। আর্য্যঋষিরা ইহা বুঝিয়াছিলেন, তাই লিখিয়াছেন—"দেবতারা আমাদিগের পরমপূজনীয় হইলেও মহাশক্তিশালী হইলেও আমাদিগের প্রদত্ত হবিঃ ভিন্ন অন্য আহার আহরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। দেবশরীর পিতৃলোকেরও দেবতার ন্যায় স্বয়ং হব্যের ন্যায় কব্য আহরণে সামর্থ্য ও অধিকার নাই। এবিষয়েও সহস্র যুক্তি আছে, সহস্র প্রকারের উপপত্তি আছে। সেই সমস্ত যুক্তি সেই সমস্ত উপপত্তি আনিয়া বালকবালিকার পাঠ্য পুস্তকের ভূমিকায় সন্নিবেশিত করিতে চাই না।

পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মনুষ্যেরও খাদ্য এক নহে। নর, বানর, পক্ষীর খাদ্য বৃক্ষের ফল, কীটের খাদ্য বৃক্ষের পত্র, হস্তীর খাদ্য বৃক্ষের ত্বক্। ধান্যস্তম্ব হইতে পলাল উন্মুক্ত করিয়া তুষ অপসারিত করিয়া উন্মোচিত তণ্ডুল অন্নে পরিণত হইলে মনুষ্যের আহার, আবার সেই ত্যক্ত পলাল পশুর আহার, তুষ কীটের

আহার ; আবার এক অন্ন মানুষেরও আহার মক্ষিকারও আহার ; কিন্তু মানুষের স্থূল অন্ন আহার, মক্ষিকার তাহা নয়, মক্ষিকার রস বিশেষ আহার। তৈলপায়ী মনুষ্যের আহার্য্য হইতে স্নেহ আহরণ করিয়া আহার করে, মধুমক্ষিকা যাবতীয় পদার্থের মিষ্টরস আহরণ করিয়া তাহাকে মধুতে পরিণমিত করিয়া মধুচক্রে সঞ্চিত করে ও পান করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়,—ভিন্ন ভিন্ন জাতির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য এবং এক জাতির পক্ষে এক খাদ্য হইলেও এক জাতির পক্ষে এক অংশ বিশেষ, অপর জাতির পক্ষে ভিন্ন অংশ বিশেষ। মধুমক্ষিকা পুষ্পের মধু আহরণ করিয়া লইয়া যায়, ভ্রমর পুষ্পের মধু আহরণ করিয়া লইয়া যায়, কিন্তু মানব আমরা এই চর্ম্মচক্ষুর সহায়তায় বুঝিতে পারি না,—পুষ্পের কি ক্ষতি হইয়াছে। মধুগ্রহণের পূর্ব্বেও পুষ্প যেরূপ ছিল, মধুগ্রহণের পরেও পুষ্প সেরূপ আছে।

সনাতন আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী আমরা পরলোকগত পিতৃলোকের পরিতৃপ্তির জন্য পিণ্ডদান করিয়া থাকি। আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী জন্মমাত্র তিন ঋণে ঋণী হয় ; ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও দেবঋণ। ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা ঋষিঋণ হইতে মুক্তিলাভ, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্তিলাভ। পুত্রোৎপাদন করিতে হইলে দারপরিগ্রহের প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়াই দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইতে হয়, পুত্রোৎপাদনের উদ্দেশে দারপরিগ্রহ, পিতৃপিণ্ডের অবিচ্ছেদ রাখিবার জন্যই পুত্রোৎপাদন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যজাতি নিজের কল্যাণ অপেক্ষায় পিতৃকল্যাণের জন্ত অধিক লালায়িত। সেইজন্ত এই জাতি পিতামাতার মরণোত্তর একবস্ত্র হইয়া অসহ্য শীতাতপের ক্লেশ সহ্য করে, আহার সংযম দ্বারা শরীরকে পরিক্ষীণ করে, অশৌচের মধ্যে প্রত্যহ পিণ্ডদান, অশৌচান্তে দ্বিতীয় দিনে দৈবভাব গ্রহণ করিয়া মহাসমারোহে নানারূপ দান, বৃষোৎসর্গ, আবার আদ্যশ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করে ; প্রতি মাসে পিণ্ডদান করিতে করিতে এক বৎসর কাল অতিবাহিত করে এবং বর্ষান্তে সেইরূপ সপিণ্ডী-করণে পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডের সহিত পিতৃপিণ্ডের মিলন করিয়া দেয়। এই এক বৎসর কাল ছত্রোপানৎ বর্জ্জিত হইয়া খট্টায় শয়ন না করিয়া কৃচ্ছ্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক জাতির খাদ্যের বিভিন্নতা আছে এবং মক্ষিকা, মধুমক্ষিকা তৈলপায়িকাকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, তাহারা যে খাদ্য হইতে সার গ্রহণ করে, সেই সারের অপচয়ে খাদ্যের যে যৎকিঞ্চিৎ লাঘব হয়, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। পার্থিবভূত যাহার শরীরের উপাদান, সেই মক্ষিকা প্রভৃতি স্বীয় পার্থিব শরীর বর্দ্ধনের জন্ত যে পার্থিব অংশ গ্রহণ করে, তাহাই যখন আমরা বুঝিতে পারি না, তখন অপার্থিব শরীর লইয়া যাঁহারা শ্রাদ্ধমণ্ডপে অধিষ্ঠান করেন, তাঁহারা পিণ্ডের যে সূক্ষ্ম অংশ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, সেই সূক্ষ্ম অংশের অপচয়ে স্থূল পিণ্ডের ক্ষতি কি করিয়া উপলব্ধি করিব। শাস্ত্রে 'লিঙ্গশরীর' বলিয়া আত্মার একটী শরীরের উল্লেখ আছে, এই স্থূলভূতের সূক্ষ্মাংশে

সেই লিঙ্গশরীর গঠিত। যোগী ভিন্ন লিঙ্গশরীরের প্রত্যক্ষ করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। মৃত্যুর সময়ে আত্মা স্থূলশরীর পরিত্যাগ করে, লিঙ্গশরীর পরিত্যাগ করে না। সেই লিঙ্গশরীর লইয়াই প্রেতাত্মা সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ। নৈয়ায়িকেরাও কিয়-দ্দিনের জন্ম প্রেতাত্মার আতিবাহিক দেহ স্বীকার করিয়াছেন। সেই সূক্ষ্মশরীরের খাদ্য অবশ্যই সূক্ষ্ম, স্থূল নহে। স্থূল খাদ্য গ্রহণের জন্যও শাস্ত্রকারের উপদেশ আছে ; নিমন্ত্রিত শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণে মন্ত্রবলে প্রেতাত্মার অধিষ্ঠান হয় ; সেই ব্রাহ্মণের পার্থিব দেহের মুখ জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রেতাত্মা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। ভিন্ন দেশেও ব্যক্তিবিশেষে প্রেতাত্মার আবেশ বর্ত্তমান যুগে স্বীকৃত হইতেছে। দেশবিশেষ ও কালবিশেষ যে তৃপ্তিসাধনের বিশেষ উপযোগী, শরীরের ও মনের স্বাচ্ছন্দ্য উৎপাদনে সমর্থ একথা বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। যিনি ফেনিল সুনীল উত্তালতরঙ্গময় সমুদ্রের বেলাভূমিতে পাদচার করিয়াছেন ও মেঘচুম্বি হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে অধিরোহণ করিয়া কলনাদিনী নির্ঝরিণীর কঙ্করময় তীরভূমিতে হিমানীবৃত হইয়া সঞ্চরণ করিয়াছেন, তিনি এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন, আর তিনিই সাক্ষ্য প্রদান করিবেন—যিনি ভারতের বিপুল বক্ষে বাস করিয়া পর্য্যায়ক্রমে ষড় ঋতুর প্রবেশ নির্গম অনুভব করিয়াছেন, শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষের ভাববৈচিত্র্য অনুভব করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, জলরাশির অগ্রে ও পশ্চাতে যদি সমান জলরাশি থাকে, তবে কখনও তাহার স্রোত হয় না ; নীচের জল সরিয়া গেলে

তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য উপরের জল আসিয়া পড়ে, তাহারই নাম স্রোত। এই দেহের যতটুকু ক্ষতি হইবে, প্রকৃতি তাহার ততটুকু পূরণ করিতে বাধ্য, অতি সূক্ষ্ম মূল প্রকৃতি মহত্তত্ব প্রভৃতির এই ভাবে ক্ষতির অংশ নিয়ত পরিপূরণ করিয়া থাকে, আবার মহত্তত্ব প্রভৃতির আপনা আপনি ক্ষতি হয় না, সূক্ষ্ম অংশ ক্রমে সরিয়া গেলে ক্ষতি হয়, স্থূলভূত ক্রমে সূক্ষ্মভূত হইয়া প্রকৃতিতে লীন হয়, আবার প্রকৃতি ক্রমে স্থূলভূতের ক্ষতিপূরণ করে। এক্ষণে স্পষ্টতঃ পাঠক বুঝিবেন,—পিণ্ডের সূক্ষ্ম অংশ ক্রমে প্রকৃতিতে মিলিত হয়, আবার প্রকৃতি প্রেতাত্মার সপ্তদশাবয়ব-ক্ষীণ-লিঙ্গ শরীরের নিজের সূক্ষ্ম অংশ দিয়া পরিপোষণ করে, এই হইতেছে প্রাকৃতিক নিয়ম। সর্ব্বত্র সমান কার্য্য হয় না; দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এক 'শব্দকে' উপস্থিত করিতে পারি। একটী তাল আমি চৌকীতে বসিয়া চৌকীর গায়ে বাজাইতে পারি, তৈজসপাত্রে বাজাইতে পারি, মৃদঙ্গে বাজাইতে পারি, খোলে বাজাইতে পারি, পাখোয়াজে বাজাইতে পারি, ঢোলকে বাজাইতে পারি, তবলায় বাজাইতে পারি, শব্দ কি একরূপ হয়? তাদৃশ শব্দের উৎপত্তির নিমিত্ত সেই সেই দেশের কারণতা স্বীকার করিতে হয়। দেশ-ভেদে কার্য্যভেদ। গয়ায় শ্রাদ্ধ করিলে যাহা হয় গৃহে করিলে তাহা হয় না। এইজন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ। যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥" পিতৃভক্ত ভারতবাসী এইজন্য সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মের অগ্রে পিতামাতার উদ্ধারের জন্য গয়াকৃত্য করিয়া থাকেন।

যে সময়ে জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ করে, মস্তিষ্কের গঠন পরিসমাপ্ত হয়, সেই যৌবনের সময়ে মনঃ যুক্তিতর্কে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করে; কিন্তু যুক্তিতর্ক দ্বারা কোন এক বিষয় স্থির করিলেও যৌবন স্বাধীনতা তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক আনয়নের জন্ত যত্ন চেষ্টা করে, সুতরাং উদ্দাম যৌবনে কোন-মত হৃদয়ে সংশয়শূন্য হইয়া বিসংষ্ঠুলতা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। বাল্যকালে যখন যুক্তিতর্ক বুঝিবার অধিকার থাকে না, যুক্তিতর্কের পক্ষপাতিতা থাকে না, সেই শৈশবকালের অভ্যস্ত সংস্কার হৃদয়ে যে মতের প্রতিষ্ঠা করে, অদম্য যুক্তিতর্কের প্রভাবে উদ্দাম যৌবনস্রোতে সেই সংস্কার বিদূরিত হইলেও তাহার পদাঙ্ক মুছিয়া যায় না; এইজন্য বালকবালিকাকে যুক্তির পথে না লইয়া পৌরাণিক আখ্যায়িকা শুনাইয়া তাহাদিগের হৃদয়ে সংস্কার গঠন করাই সাধু শিক্ষার প্রথম সোপান বা প্রধান ভিত্তি। পরমকারুণিক মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদার্থ লইয়া আখ্যায়িকাচ্ছলে ইতিহাসের মধ্য দিয়া মহাভারতে ও অষ্টাদশ পুরাণে সেই সকল ধর্ম্মের গূঢ়রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। স্ত্রী ও শূদ্রের ন্যায় দ্বিজবন্ধুরও বেদে অধিকার নাই, এই শাস্ত্রীয় শাসন দ্বারা আমরা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারি,—শূদ্র বলিয়া নয়, জ্ঞানহীন ব্যক্তিমাত্রই বেদের জটিল মীমাংসা বুঝিতে অক্ষম। ভগবদ্গীতাতেও 'নবুদ্ধিভেদং জনয়েদ-জ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্' * ইহাদ্বারা সেই শাস্ত্রীয় অনুশাসনের প্রতিধ্বনি

---

* গীতা ৩।২৬।

শুনিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ মনু ব্রাহ্মণ বালককেও শূদ্রতুল্য বলিয়াছেন ; তাৎপর্য্য, এই অবস্থাতে তাহাদিগকে জটিল দার্শনিক-তত্ত্ব বুঝাইতে যত্ন করা সঙ্গত নয়, পৌরাণিক আখ্যায়িকা দ্বারা তাহাদিগের মনের গঠন করা আবশ্যক। এই কারণ পূর্ব্বকালে বালকবালিকাদিগকে 'নাম-শ্লোক' শিখাইবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সহজ সংস্কৃতে নিবদ্ধ উপদেশগুলি শিক্ষা দেওয়া হইত, মুখে মুখে পৌরাণিক আখ্যায়িকা বুঝাইয়া দেওয়া হইত। পল্লী, গ্রাম, নগরের মধ্যে পবিত্র মাসে সময়ে সময়ে রামায়ণ মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের পূর্ব্বাহ্নে পারায়ণ হইত ও অপরাহ্নে কথকের মুখে সেই পঠিত গ্রন্থের ব্যাখ্যা হইত। তাহা দ্বারা পুরস্ত্রীবর্গ, বালকবালিকা সকলেই অতি সহজে ধর্ম্মোপদেশ শিক্ষা লাভ করিত ও সেই শিক্ষার ফলে তাহাদিগের হৃদয়ে সেই সেই বিষয়ে সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ হইত ; পরিণত বয়সে যখন তাহারা বেদ বেদান্তের আলোচনা করিত, তখন তাহাদিগের সেই পূর্ব্বসংস্কার আরও সুদৃঢ়মূল হইয়া উজ্জ্বলতম হইয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইত। আজ পারায়ণ উঠিয়া গিয়াছে, কথকতা দেশ হইতে অপসারিত হইয়াছে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত অসভ্যের পাঠ্য বলিয়া সুরুচিসম্পন্ন শিক্ষিত পুরস্ত্রীবর্গ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না, সুতরাং আর্য্যশাস্ত্রের মহীয়সী শিক্ষা বালকবালিকাকে কি করিয়া নিজের দিকে টানিয়া লইবে ?

সুখের বিষয়, সৌভাগ্যের বিষয়, বিভীষিকাময় এইরূপ দুর্দ্দিনে একজন শিক্ষিত সুযোগ্য লেখক এই অভাব দূর করিবার উদ্দেশে

লেখনী ধারণ করিয়াছেন, 'ছেলেদের চণ্ডী,' 'শাক্যসিংহ,' '৺অৰ্দ্ধ-কালী,' 'ধ্রুব,' 'ভগীরথ,' 'সর্ব্বানন্দ' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ লিখিয়া ইতিমধ্যেই সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। তাঁহারই লিখিত এই—'গয়া-কাহিনী'।

এই 'গয়া-কাহিনীতে' পৌরাণিক বিবরণটী যথাযথ সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যেরূপ সহজ ভাষায় বিশুদ্ধ ভাষায় গ্রন্থে বিবরণটী সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে আশা করা যাইতে পারে, গয়ার দিকে মানবের মন আকৃষ্ট হইবে। ইতিহাসপ্রিয়, উপাখ্যান-আখ্যায়িকাপ্রিয় বালকবালিকা অতি সহজে গ্রন্থপাঠে মনোযোগী হইবে ও অতি সত্বরে তাহাদিগের কোমল হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজের অঙ্কুর উৎপাদিত হইবে। শিক্ষিত লিপিকুশল ধর্ম্মবিশ্বাসীর হস্তে ধর্ম্মপুস্তক যেরূপ সুন্দরভাবে সুসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যাত হয়, অন্যের হস্তে সেরূপ আশা করা যাইতে পারে না। লেখক একজন আস্থাবান্ শাস্ত্রবিশ্বাসী ধার্ম্মিক ; সুতরাং তাঁহার মুখ হইতে যাহা বাহির হইতেছে, তাহার প্রত্যেক অক্ষরে জ্বলন্ত ধর্ম্মের নিদর্শন ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বক্তব্য বুঝাইতে যাইয়া লেখক পুস্তকে যেন তুলাদণ্ড গ্রহণ করিয়া শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, বিন্দুমাত্রও শব্দের ন্যূনাধিক্য হয় নাই। গ্রন্থকারের ভাষায় আধিপত্য আছে, লেখক শক্তিশালী সন্দেহ নাই। যিনি পিতার সহিত সাহিত্যরঙ্গমঞ্চে অবতরণ করিয়া সেই সাহিত্যক্ষেত্রেই শুক্লশ্মশ্রু ও শুক্লকেশ হইয়াছেন, সেই প্রবীণ সাহিত্যিক বৃদ্ধ সাহিত্যিক সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় অল্প সময়ে নহে—সাহিত্য

সম্মিলনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া অভিভাষণে যাঁহার লিপি কৌশলের প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহার লিখিত 'গয়া-কাহিনী' যে একখানি উৎকৃষ্ট উপদেশ পুস্তক, তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

এই পুস্তকে গয়া ও শ্রাদ্ধতত্ত্ব, পৌরাণিক কথা, ইতিহাসে গয়া, গয়াকৃত্য ও পরিশিষ্ট আছে।

গয়া ও শ্রাদ্ধতত্ত্বে পুত্রের কর্ত্তব্যতা, পিণ্ডদানের উপযোগিতা ও পারলৌকিক আত্মার তৃপ্তির জন্য পিণ্ডদানের সযৌক্তিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিশ্বসংহর্ত্তা ভূতভর্ত্তা দেবাদিদেব মহাদেব যে ত্রিপুরাসুরের বধের জন্য মহা আড়ম্বরের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, যাহার বধের জন্য স্বয়ং বিধাতা ভগবান্ ব্রহ্মা মহাদেবের রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণু যাহার বধের জন্য পিনাকপাণির পিনাকে শররূপে সংযোজিত হইয়াছিলেন, সেই দেবদ্রোহী ত্রিপুরাসুরেরই পুত্র মহাবীর মহাত্মা গয়াসুর। গয়াসুর পিতৃদ্রোহী রুদ্রদেবকে স্বীয় রৌদ্রতেজে অভিভূত করিয়া বিজয়োল্লাসে দেববৃন্দের উপরে আধিপত্য করিয়াছিলেন। এই পৌরাণিক কথায় সেই বিবরণ আছে; কৌমোদকী গদাপাণি গদাধরের সহিত গয়াসুরের যুদ্ধ বিবরণ আছে, ভগবান্ বিষ্ণুকে বিজয়দৃপ্ত গয়াসুরের বরপ্রদানের বিবরণ আছে, পিণ্ডদানে পাপীতাপী সংসারক্লিষ্ট প্রেতাত্মার উদ্ধারের জন্য গয়াসুরের প্রার্থনা আছে, গয়াসুরের মস্তকে ধর্ম্মশিলা স্থাপনের বিবরণ আছে, ধর্ম্মশিলার ইতিবৃত্তে পতিব্রতার-

পাতিব্রত্যের মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে, গয়াস্থিতে 'হেতি' দানবের অসুরের মধ্যেও বিশ্ববিস্ময়কর আত্মদেহপাতে বদান্যতার প্রকটন আছে। এই প্রত্যেক বিষয়েই হিন্দু নরনারীর শিক্ষা গঠনের উপ-যোগিতা আছে।

'ইতিহাসে গয়ায়' প্রাকৃতিক বিবরণ, ভৌগোলিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। গয়াগামী ব্যক্তির পক্ষে দর্পণের ন্যায় এই পুস্তক অঙ্গুলি নির্দ্দেশে গয়ার পার্শ্ববর্ত্তিস্থান, গয়ার মধ্যবর্ত্তিস্থান, গয়ার পার্শ্বে ও মধ্যে নদনদী বনপর্ব্বত পশুপক্ষী সমস্তকেই চক্ষের উপরে প্রদর্শন করিতেছে। স্মরণাতীত প্রাচীন যুগ হইতে ভারতের নরনারীর নিকটে গয়াতীর্থ একটী ভক্তির বিশেষ সামগ্রী। প্রাচীন ঋষিগণ গয়াকে যেভাবে দেখিতেন পৌরাণিক কথায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায় আবার ইতিহাসের তক্ষণযন্ত্রে গয়াকে উঠাইয়া নিজের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য বাদ ছাদ দিয়া আগাগোড়া কাটিয়া ছাটিয়া যেভাবে জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন, 'ইতিহাসে গয়ায়' তাহাও আছে। বিদেশী মহামনাঃ পণ্ডিতগণ ইতিহাস রঙ্গমঞ্চে গয়াকে আনিয়া যাহা বলিয়াছেন, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের দেশের সুগ্রহীতনামা মহাত্মা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বর্ত্তমান ইতিহাস রঙ্গশালায় নাট্যাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহাও আছে। দুঃখের বিষয় আমাদিগের সঙ্গে স্কুল কলেজের সম্পর্ক নাই, আমরা নিরীহ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মিয়াছি, টোল চতুষ্পাঠীর যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি,

সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতের অনুবর্ত্তন ও সেই মতের অনুবর্ত্তী মহাত্মাদিগের মতের অনুবর্ত্তন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। 'বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবের চরণচিহ্নের পূজা করিতেন, সেই জন্য হিন্দুরাও তাহার অনুকরণে বিষ্ণুপদের কল্পনা করিয়া তাহাতে পিণ্ডদান করিতেছেন' এ কল্পনা আমাদিগের চিন্তার অতীত। 'বৌদ্ধ ও জৈনদিগের রথযাত্রার অনুকরণে জগন্নাথের রথযাত্রার কল্পনা, জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি বুদ্ধমূর্ত্তি, ধর্ম্ম, ক্ষেত্রপাল, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবতা' ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিয়া স্বীকার করিব? আমার 'উৎকল ভ্রমণ' প্রবন্ধে জগন্নাথ যে বুদ্ধমূর্ত্তি নহেন, তাহা প্রমাণ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের চরণপূজা অপেক্ষায় বুদ্ধের দন্ত, কেশ, নখ ও ভস্মরক্ষার ব্যবস্থাই বৌদ্ধদিগের বিশেষ অনুষ্ঠেয়। হিন্দুরা যদি বৌদ্ধদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিত, তাহা হইলে হিন্দু রীতিনীতির ভিতরে পিতৃপুরুষের বা গুরুদেবের দন্তরক্ষার ব্যবহার প্রচলিত থাকিত। তাহা না করিয়া বৌদ্ধদিগের ভিতরেও যাহা তাদৃশ প্রচলিত নাই, তাদৃশ চরণপূজার ব্যবস্থা কি করিয়া প্রচলিত হইল? হিন্দুদিগের ভিতরে দন্তরক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা নাই, একেবারে দেহকে ভস্মাবশেষ করিবার ব্যবস্থা; যৎকিঞ্চিৎ অস্থি রাখিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাও রাখিবার জন্য নয়, গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার জন্য। হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাচীন নয়, হিন্দুধর্ম্ম হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম উদ্ভূত। হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া হিন্দু পিতামাতার হস্তে লালিত পালিত হইয়া বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমস্ত আচার

ব্যবহার ভুলিতে পারেন নাই, তাই বৌদ্ধ আচার ব্যবহারে হিন্দুর আচার ব্যবহারের ছায়াপাত রহিয়াছে; তাই বুদ্ধদেব শ্রমণের পূজার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের পূজার কথাও বলিয়াছেন। বেদে গয়ার প্রাচীন নাম 'কীকট' শব্দ দেখিতে পাই; * রামায়ণ, ভারতে গয়ার উল্লেখ ও গয়ায় পিণ্ডদানের ব্যবস্থা দেখিতে পাই: অধিকাংশ স্মৃতিসংহিতায় গয়াশিরে পিণ্ডদানের কথা, বিষ্ণুপদে পিণ্ডদানের কথা দেখিতে পাই; ঐতিহাসিকগণ মহর্ষি পাণিনিকে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী অবধারণ করিয়াছেন, সেই পাণিনীয় ব্যাকরণে গয়ার উল্লেখ রহিয়াছে †। ভাবায় যে প্রয়োগের আধিক্য আছে, সেই

---

* ঋগ্বেদে আছে—

"কিংতে কৃণ্বংতি কীকটেষু গাবো নাশীরং দুহ্রেন তপংতি ঘর্মং।
আনোভর প্রমগংদস্য বেদো নৈচাশাখং মঘবন্ রংধয়া নঃ॥"

ঋক্ ৩ মণ্ডল—৫৩ সূক্ত—১৪ শ্লোক।

'কীকট সমূহ' অর্থাৎ অনার্য্য দেশ বা জনপদ সমূহ। উইলসনের মতে ঐ দেশ দক্ষিণবিহার। সায়ণ বলেন 'কীকটেষু অনার্য্য-নিবাসেষু জনপদেষু।'

† পাণিনির প্রমাণঃ—

বরণাদিভ্যশ্চ। বরণা, উজ্জয়িনী, গয়া, মথুরা, তক্ষশিলা। (পাণিনি, তদ্ধিত প্রকরণ, ৪।২।৮২)।

রামায়ণের প্রমাণ;—

শ্রূয়তে ধীমতা তাত শ্রুতির্গীতা যশস্বিনা।
গয়েন যজমানেন গয়েষ্বেব পিতৄন্ প্রতি॥

সেই প্রয়োগবাহুল্য দেখিয়াই ব্যাকরণকর্ত্তা সেই প্রয়োগসংসাধনের জন্য সূত্রের সৃষ্টি করেন। ব্যাকরণকর্ত্তার অনেক পূর্ব্ব হইতে সেই প্রয়োগটী সাহিত্যে স্থান প্রাপ্ত হয়। যখন ভগবান্ পাণিনি

---

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।

তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিদ্ গয়াং ব্রজেৎ ॥

রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৭ সর্গ, ১১শ ও ১৩শ শ্লোক।

মহাভারতের প্রমাণ :—

ততো গয়াং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। ইত্যাদি ৮২।

তত্রাক্ষয়ো বটো নাম ইত্যাদি ৮৩।

কৃষ্ণশুক্লাবুভৌ পক্ষৌ গয়ায়াং যো বসেন্নরঃ ইত্যাদি ৯৬।

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ। ইত্যাদি ৯৭।

মহাভারত, বনপর্ব্ব,—তীর্থযাত্রাপর্ব্ব, ৮৪ অধ্যায়।

রাজর্ষিণা পুণ্যকৃতা গয়েনানুপমদ্যুতে।

নগো গয়শিরো যত্র পুণ্যাচৈব মহানদী ॥

ঐ, ঐ, ৯৫ অধ্যায় ৯ শ্লোক।

এবং এই স্থানে গয়কৃত যজ্ঞের বিবরণও আছে।

সংহিতা সমূহের প্রমাণ :—

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।

যজেত চাশ্বমেধঞ্চ নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥ ৫৫।

কাঙ্ক্ষন্তি পিতরঃ সর্ব্বে নরকান্তরভীরবঃ।

গয়াং যাস্যতি যঃ পুত্রঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥ ৫৬।

'গয়া' শব্দ লইয়া সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তখন বলিতে হইবে,— পাণিনির জন্মিবার বহু পূর্ব্ব হইতে সংস্কৃত সাহিত্যে গয়া শব্দের প্রচলন আছে। আবার রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতিসংহিতা ও

---

ফল্গুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গদাধরং।

গয়াশীর্ষং পদাক্রম্য মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৫৭ ॥

অত্রিসংহিতা

অথ পুষ্করেষক্ষয়শ্রাদ্ধং * * * এবমেব গয়াশীর্ষে ৪ অক্ষয়বটে ৫ * * * বিষ্ণুপদে ৪০। ফল্গুতীর্থে ২২ * * * বিষ্ণুসংহিতা ৮৫ অধ্যায়।

অপি জায়তে সোঽস্মাকং কুলে কশ্চিন্নরোত্তমঃ।

গয়াশীর্ষে বটে শ্রাদ্ধং যো নঃ কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। ৬৬।

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।

যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ। ৬৭।

ঐ, ঐ।

যদ্দদাতি গয়াস্থশ্চ সর্ব্বমানন্ত্যমুচ্যতে।

তথা বর্ষাত্রয়োদশ্যাং মঘাসু চ ন সংশয়ঃ। ২৬১।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১ম অধ্যায়।

গয়ায়া মক্ষয়ং শ্রাদ্ধং প্রয়াগে মরণাদিষু।

গায়ন্তি গাথাং তে সর্ব্বে কীর্ত্তয়ন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৩০।

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রাঃ শীলবন্তো গুণান্বিতাঃ।

তেষান্তু সমবেতানাং যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ। ১৩১।

অধিক পুরাণে "এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা" ইত্যাদি শ্লোকটী তুল্যভাবে বা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতভাবে দেখা যায়, ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, এই শ্লোকটী সেই সেই গ্রন্থের রচয়িতার নহে, তাহার বহুপূর্ব্বে অবিদিত কালে অনবগত পুরুষের রচিত ও ভারতের নরনারীর মুখে

---

গয়াং প্রাপ্যানুষঙ্গেন যদি শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ।
তারিতাঃ পিতরস্তেন স যাতি পরমাং গতিং ॥ ১৩২।
বারাহপর্ব্বতেচৈব গয়াঞ্চৈব বিশেষতঃ।
এবমাদিষতীর্থেষু তুস্যন্তি পিতরস্তদা ॥ ১৩৩।

উশনঃসংহিতা, ৩ অধ্যায়।

প্রাধান্যং পিণ্ডদানস্য কেচিদাহুর্ম্মনীষিণঃ।
গয়াদৌ পিণ্ডমাত্রস্য দীয়মানস্বদর্শনাৎ ॥ ৯।

কাত্যায়ণসংহিতা ৩ অধ্যায়।

যদ্দদাতি গয়াক্ষেত্রে প্রভাসে পুষ্করেঽপিচ।
প্রয়াগে নৈমিষারণ্যে সর্ব্বমানন্ত্যমুচ্যতে ॥ ১।
গঙ্গাযমুনয়োস্তীরে তীর্থে বামরকণ্টকে।
নর্ম্মদায়াং গয়াতীরে সর্ব্বমানন্ত্যমুচ্যতে। ২।

শঙ্খসংহিতা, ১৪ অধ্যায়।

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ।
গয়াশিরে তু যৎকিঞ্চিন্নাম্না পিণ্ডং তু নির্ব্বপেৎ।
নরকস্থো দিবং যাতি স্বর্গস্থো মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ১২।

উদ্‌গীত ও সমাজে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। গ্রন্থকারগণ তাহাই নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমাদিগের এই কথায় প্রমাণস্বরূপ রামায়ণের বচনে 'শ্রুতি' কথার উল্লেখ করিতে পারি।

কেবল বিষ্ণুপদ বলিয়া নয়, গয়ার একটী পর্ব্বতে সুরভীর পদ-চিহ্ন আছে, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে * এবং অদ্যাপি গোক্ষুরাঙ্কে অঙ্কিত একটী পর্ব্বত গয়াক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের পদ-চিহ্নের অনুকরণে বিষ্ণুপদের পূজা করিতে করিতে হিন্দু নরনারী অবশেষে গোজাতির চরণচিহ্ন পূজার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন,—এ কল্পনা অত্যন্ত কৌতূহল ও বিস্ময়ের উৎপাদক। গ্রন্থকার ইতিহাস অংশে আমাদিগের দেশের ও ইউরোপের গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন মাত্র, নিজের মতের প্রকটন করেন

---

* আত্মনো বা পরস্যাপি গয়াক্ষেত্রে যতস্ততঃ।
যন্নাম্না পাতয়েৎ পিণ্ডং তং নয়েদ্‌ব্রহ্মশাশ্বতং ॥ ১৩।
লিখিতসংহিতা।

নন্দন্তি পিতরস্তস্য সুবৃষ্টৈরিব কর্ষকাঃ।
যদ্‌ গয়াস্থো দদাত্যন্নং পিতরস্তেন পুত্রিণঃ ॥
বশিষ্ঠসংহিতা ১১ অধ্যায়।

কপিলা সহবৎসা বৈ পর্ব্বতে বিচরত্যুত।
সবৎসায়াঃ পদাঙ্কান্যা দৃশ্যন্তেঽদ্যাপি ভারত ॥৮৯।
সাবিত্র্যাস্তু পদং তত্র দৃশ্যতে ভরতর্ষভ ॥৯০।
মহাভারত, বনপর্ব্ব-তীর্থযাত্রা পর্ব্ব, ৮৪ অধ্যায়।

নাই ; † সুতরাং ভূমিকায় তাহার আলোচনায় গ্রন্থকারের সহিত মতবিরোধের সম্ভাবনা নাই। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য অংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভূমিকায় প্রদত্ত হইল।

ভূমিকার উপসংহারে এইমাত্র বলিতে পারি, শিক্ষার্থী বালক-বালিকার শিক্ষার উদ্দেশে গ্রন্থখানি প্রস্তুত হইলেও ইহাতে প্রৌঢ় বয়স্ক ব্যক্তিদিগেরও শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

পাকাটোল,
রংপুর,
মাঘ, ১৩২০।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

---

† আমি সম্প্রতি গ্রন্থের শেষ ভাগে 'গয়াতীর্থের প্রাচীনত্ব' শীর্ষক-প্রবন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। গ্রন্থকার
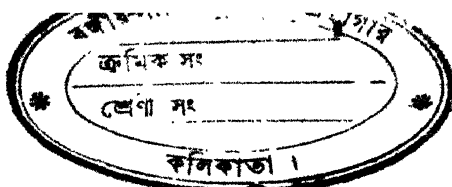
# গয়াধাম ও পিণ্ডদান

হিন্দুশাস্ত্র বলেন, বিবাহের মূল উদ্দেশ্য প্রজাপতিরূপী বিধাতার প্রজা বৃদ্ধি করা। প্রজাসৃষ্টি ব্যতীত, বিশ্বসংসারের স্থিতিস্থাপকতা থাকে না ; সে জন্য ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর বিবাহ জীবনের একটী প্রধান 'সংস্কার'। নরনারী, বিবাহ-সংস্কারে আবদ্ধ হইলে পর, যে ফল প্রাপ্ত হয়েন তাহাই অপত্য বলিয়া অভিহিত, অর্থাৎ যাহা হইতে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না, সেই অপত্য। সুধীগণের মতে, প্রাকৃতিক নীতিমাত্রেই ক্রমিক বিকাশশীল, অর্থাৎ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সমুদয় সৃষ্টির অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া এই পরিবর্ত্তন দ্বারা এক বস্তু অন্যভাব ধারণ করে ; অন্য বস্তু আবার ক্রমশঃ অপরভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। ফল কথা ক্রমশঃ স্বাভাবিক নীতিতে সকল বস্তুই বিকাশপথে চলিতেছে। ইহাদ্বারা জীব ক্রমশঃ শিবপদ লাভ করিতেছে, বা শেষভূমিতে স্থিত হইতেছে। ইহাকেই ক্রমিক বিকাশ বা নিত্য-জ্ঞান-যজ্ঞ বলা হয়।

এই বিকাশ-পথের পথিক হইবার ইঙ্গিত হিন্দুসন্তানের অপত্য নামে ব্যক্ত। একদিকে 'অপত্য' যেমন পিতৃপিতামহ হইতে জ্ঞান, চরিত্র, মহত্ত্ব ইত্যাদি লাভ করিয়া অপত্য নামের সার্থকতা প্রকাশ করে, অপর দিকে তেমনি আবার পিণ্ডাদিদানে তাঁহাদিগকে সংসার-চক্র হইতে মুক্তিদান করিয়া অপত্য নাম রক্ষা করে। এজন্য শাস্ত্র বলেন, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ" পিণ্ডদানের জন্যই পুত্রের প্রয়োজন এবং তাহার প্রয়োজনই বিবাহের মূল উদ্দেশ্য।
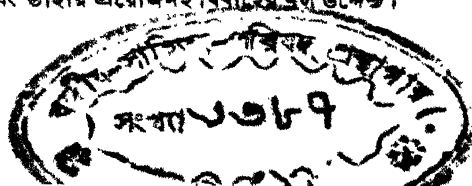
স্নেহশীল হিন্দু জনকজননী অপরিসীম স্নেহ সহকারে সন্তানপালন করিয়া থাকেন; এমন প্রাণভরা স্নেহ-যত্ন, হিন্দুসন্তান ছাড়া আর কোন দেশের কোন সন্তান, বোধ হয়, জনকজননীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় না। এবং হিন্দুপুত্রও তৎপরিবর্ত্তে পিতামাতাকে যেরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তাহাও অন্য দেশে দুর্লভ। সৃষ্টির অনুকূল বিধিপালন করিবার উদ্দেশ্যেই হিন্দুর পিতা ও পুত্রে এইরূপ স্নেহভক্তির আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে। সৃষ্টির নিয়ম আসা ও যাওয়া, ইহা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য স্নেহ ও ভক্তির প্রবাহ হিন্দু-সংসারে নিত্য প্রবাহিত। পিতৃস্নেহে সন্তানের ইহলোকে স্থিতি বা থাকা, আর পুত্রের ভক্তিতে পিতার উর্দ্ধদিকে গতি বা যাওয়া। হিন্দুপিতা সন্তানের নিকট আর বিশেষ কিছুই প্রার্থনা করেন না। তাঁহাদের প্রধান প্রার্থনীয় বস্তু, সন্তান কর্ত্তৃক উর্দ্ধ-লোকে স্থিতি হইবার সহায়তা বা গয়াধামে পিণ্ডপ্রাপ্তি।

হিন্দুশাস্ত্রে পিণ্ডের অন্য নাম 'স্বধা' দেওয়া হইয়াছে। 'স্ব' অর্থে আমি বা আপনি আর 'ধা' অর্থে স্থিত হওয়া; অর্থাৎ জীবভাব ত্যাগ করিয়া, শিবভাব যাহা হইতে লাভ করা যায় সেই মহাশক্তিই স্ব-ধা। ইহাকে অগ্নির স্ত্রীও বলা যায়; তেজশক্তিই উর্দ্ধগতির সহায়, সেজন্য পিণ্ডকে 'স্ব-ধা' নাম দিয়া তেজের অর্দ্ধাঙ্গিনী করা হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ কল্পনা করিলেও সেই নিষ্ক্রিয় মহা-সাম্যে জগৎরূপ-ক্রিয়া সম্পাদন অসম্ভব। সে জন্য তত্ত্বদর্শিগণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে বিগত সৃষ্টির অভুক্ত-কর্ম্মফলরূপ কারণ আরোপিত করিয়া তাহা হইতে প্রথমে তেজোরূপী পুংশক্তির

বিকাশ কল্পনা করতঃ তাহাতে বৈষম্য বা প্রকৃতি-শক্তি সম্মিলিত করিয়া জগৎ কার্য্যের উদ্ভাবনা করিয়াছেন। সাম্য ও বৈষম্য দুই ধারাতে জগতের স্থিতি; ইহারাই অগ্নি ও সোম নামে খ্যাত। অগ্নি তেজপ্রধান বলিয়া অগ্নিকে পুরুষ বলা হয়। পুরুষ-তত্ত্ব ধরিলে জীব উর্দ্ধগতি লাভ করিয়া শিবে গিয়া উপনীত হয়। তাই অগ্নিবাহি গতির নাম নিবৃত্তিমার্গ বা দেবযান; আর সোম স্নেহশীল বলিয়া সোমকে নারী নাম দেওয়া হয়। স্নেহের নিম্নগতি, একারণ এই ধারা প্রবৃত্তি নামে পরিচিত। সোমগতিই পিতৃযান। স্ব-ধা নামক মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন বস্তুটি এই নিবৃত্তিমার্গের মূলেই প্রদত্ত হয়, যাহা ধরিয়া পরলোকগামী আত্মা সাম্যরূপ পরম-পুরুষে গিয়া স্থিতিলাভ করেন।* সাম্যে পঁহুছিতে পারিলেই সংসারচক্র হইতে নিষ্কৃতি-লাভ হয়। সেজন্য তেজ পথ অবলম্বনে প্রাণত্যাগ করা হিন্দুর বড় গৌরবের কারণ। যোগিগণ প্রাণায়াম দ্বারা মৃত্যুকালে এপথ দিয়া প্রাণ-পরিহার করেন। সাংসারিকগণ দেহ-তত্ত্বে সম্যক্ অভিজ্ঞ না থাকায় এবং মৃত্যুর মহামোহে আত্মবিস্মৃত হইয়া সতত স্বভাবচালিত পথেই প্রাণ ছাড়িতে বাধ্য হয়েন। প্রবাদ আছে "জ্ঞানই মরণকে মরণ দিতে পারে"। অর্থাৎ মৃত্যুকালে জ্ঞান থাকিলে মরণও মোহ দিতে পারে না; যোগিগণ তাই মৃত্যুর আগমন-সংবাদ জানিয়া যোগাসনে বসিয়া ইচ্ছা করিয়া মরণকে বরণ করিতে সমর্থ হন। অজ্ঞানিগণ ইহা পারে না বলিয়া হিন্দু শাস্ত্র ইহাদের মুক্তির জন্য সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা ও অন্তর্জলির ব্যবস্থা দিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে সংসারী ব্যক্তি আসন্নমৃত্যুর আগমন জানিয়া

ভগবৎ চিন্তার দ্বারা ঊর্দ্ধগতির অধিকারী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন।

যাহা হউক মরণ-মোহ ও সংসার-কামনা ছাড়াইয়া মনুষ্যকে ঊর্দ্ধপথের পথিক করিবার জন্যই হিন্দুশাস্ত্র শ্রাদ্ধক্রিয়া ও পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধক্রিয়ায় মৃতব্যক্তির মরণ-মোহ দূর হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ হয়, পিণ্ডদ্বারা সে নিজ গন্তব্যপথের পথিক হইবার শক্তিলাভ করে। শ্রাদ্ধ অতি মহৎ কার্য্য ; এই কার্য্যটি আত্মপ্রতিম সন্তানের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয়। কেন না বেদে সন্তানের জাত-কর্ম্ম উপলক্ষে এই মন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা আছে। যথা—"অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদভিজায়সে, আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সজীবং শরদাং শতম্"— পুত্রের অঙ্গ পিতার অঙ্গ হইতে জাত, পিতার হৃদয় হইতে পুত্রের জন্ম ; এমন যে আত্মপ্রতিম পুত্র, সে শত বৎসর জীবিত থাকিয়া ক্রিয়াশীল প্রাণের বর্দ্ধন করুক। পিতৃ-আত্মা ও ক্রিয়াশীল প্রাণ নামক অবস্থায় প্রকাশ পুত্র হইতেই হয়, এজন্য পিতাই পুত্র, এবং সন্তানজননী পত্নীর জায়া নাম ধারণ হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদনীয়। পুত্র, পিতাকে ঊর্দ্ধকেন্দ্রে বা বিষ্ণুপদে স্থিত করিবার জন্য পিতৃ-কার্য্যে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করে। বিষ্ণুপদে স্থিতি বা চরণ করিলে যোগী ব্রহ্মচারী হয়, এ কারণ শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যে পিতাকে ব্রহ্মচরণ বা ব্রহ্মপরায়ণ করিবার জন্য সন্তানের ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইতে হয়। আবার পিতারও সন্তানকে পৃথিবীতে স্থিত করিবার জন্য পার্থিব ধনসম্পত্তি যথাবিধি রাখিয়া যাইতে হয়। এজন্য পিতা মাতার ঊর্দ্ধ-দৈহিক কার্য্যের জন্য শ্রাদ্ধাধিকারী পুত্রকে সংযতভাবে ব্রহ্মচর্য্যে

অবস্থিতি করিতে হয়, এবং দীনবেশে সকল শ্রেণীর দারস্থ হইয়া সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়।

ইহলোক স্থূল, পরলোক সূক্ষ্ম, এজন্য ইহলোকের কোন বস্তুই সেই পারলৌকিক ভূমিতে পঁহুছিতে পারে না। কেবল ইহলোকের শ্রদ্ধা-ও-ভক্তি-সমন্বিত আত্মতৃপ্তি পরলোকে গিয়া পারলৌকিক আত্মার আত্মা-শক্তির বৃদ্ধি করিতে পারে। সে জন্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়ায়, সর্ব্বভূতস্থ আত্মার সন্তোষ-বিধানার্থ, সকলকে সমাদরে আহ্বান করিয়া ভোজ্য ও দক্ষিণাদি দান করিতে হয়। * * * * * * আত্মায় আত্মায় যোগ বলিয়া ইহলৌকিক আত্মার তৃপ্তিতে পারলৌকিক আত্মা শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। * * * * পরলোকে দরিদ্র হইতে রাজরাজেশ্বর পর্য্যন্ত সকলে একই নিয়মের অধীন। মৃত্যুতে স্থূল-ইন্দ্রিয়-সমন্বিত স্থূলদেহের ধ্বংস হয় মাত্র; সূক্ষ্মদেহের অন্তর্গত সূক্ষ্মইন্দ্রিয়শক্তিবিশিষ্ট সেই জীবাত্মাকে লইয়া পারলৌকিক ভূমিতে উপনীত হয়। কর্ম্ম জগতের কর্ম্মাধারচ্যুত মানব ভোগ-ভূমি পরলোকে গিয়া প্রথমতঃ স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি প্রথমতঃ মোহাক্রান্ত হইয়া যায়। সেই দশতম ইন্দ্রিয়ের দশতম জ্ঞানবিকাশের জন্য হিন্দুর দশম দিবসে দশ পিণ্ডদানের ব্যবস্থা। শাস্ত্রে মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে যত কিছু মন্ত্রাদি ব্যবস্থিত আছে, তৎসমুদয় উহারি আত্মজ্ঞান উদ্বোধনের জন্যই রচিত হইয়াছে।

সাম্য ও বৈষম্যহীন শেষভূমিই হিন্দুশাস্ত্রের পরম পদ। যোগি-গণ বলেন যে স্থলে রাজশক্তি গিয়া সত্ত্বে নিঃশেষ হইয়াছে, তাহাকে

সাধারণতঃ 'কূট' বলা হয়। ইহার উপরে স্বং বাচক পরমপদ বা অহংরূপী শ্রীকৃষ্ণ আছেন। ঐ স্থান লাভ করিতে পারিলে, মানব সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। শেষের এই স্থির-ভূমিই হিন্দু জীবনের পরম বাঞ্ছনীয় স্থান। কূটে গিয়া প্রাণ-শক্তি নিষ্ক্রিয় সত্ত্বে নিঃশেষ বা নির্ম্মল আত্মজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। আমি বা 'স্ব' তখন স্ব-'ধা' নামক নিজ স্থানে গিয়া শান্তি লাভ করে।

দুই শক্তি,—প্রাণ ও অপানই 'গয়াসুর' নামে খ্যাত। প্রাণই সংসার আসক্তির মূল কেন্দ্র, এজন্য যোগিগণ সংসার বাসনাকে পরিহার করিবার মানসে সর্ব্বপ্রথমে প্রাণ সংযমনে প্রবৃত্ত হয়েন। দুই প্রবাহের উপর দুই পদ স্থাপন করিয়া, গদাধররূপী ভগবান্ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হস্তে বিরাজমান। হিন্দু এ মুর্ত্তি অন্তরে অন্তরে কল্পনা করিয়া উহাতেই স্থিত হইয়া, শেষের শেষ-গতি কামনা করেন। মূল গয়াধামরূপী অহং-তত্ত্বে বিষ্ণুরূপী উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় মুর্ত্তি দুই পদে দুই প্রবাহ চাপিয়া বর্ত্তমান আছেন। প্রাণ-শক্তিই অসুর আর স্বং ক্ষেত্রই গয়া। সংসারবিচ্যুত ভূত মানবকে ইহার আকর্ষণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য হিন্দু প্রাণ-শক্তির দমন কর্ত্তা বিষ্ণুর শরণাগত হইয়া থাকেন। বিষ্ণু অসুররূপী প্রাণ দমনে প্রবৃত্ত হইলে, অসুর বা সংসারশক্তি নিজের জগৎবিক্রান্ত বলবীর্য্যে তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া তাহার নিকট একটী প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন যে, "আপনি যেমন আমাকে স্ববশে আনিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, আমিও তেমনি আপনার গুণে বাধ্য হইয়া, আপনার বশীভূত হইতে প্রস্তুত হইয়া আপনার পদযুগল সাদরে মস্তকে ধারণ

করিয়া আজীবন থাকিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। তবে আমার একটী মাত্র নিবেদন এই যে, আপনি যে পদযুগল আমার মস্তকে স্থাপন করিবেন, সেই পদযুগল যে দিন পিণ্ড হইতে বঞ্চিত হইবে সে দিন হইতে আমি আর আপনার অনুগত থাকিতে বাধ্য হইব না।" বিষ্ণু 'তথাস্তু' বলিয়া সানন্দে এই প্রার্থনায় সম্মত হন।

তদবধি একাল পর্য্যন্ত গয়াধামে অসুরের সেই প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। এমন দিন নাই, যে দিন গয়ার বিষ্ণুপদে পিণ্ড প্রদত্ত না হয়। গয়াসুরও প্রার্থনা-পূরণ হেতু আনন্দচিত্তে বিষ্ণুপদ মস্তকে ধারণ করিয়া পাষাণবৎ নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিতেছে।

এই উপাখ্যানের মর্ম্ম যোগবিৎগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। যাঁহারা সংসার-ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন, জনপ্রবাদে শুনা যায়, তাঁহারা নিজের পিণ্ড নিজে দিয়া, পারলৌকিক কায হইতে আপনি নিষ্কৃতি লাভ করেন। সন্ন্যাসীকে অবিরত প্রাণন-ক্রিয়া করিয়া, প্রাণকে স্ববশে আনিতে হয় এবং নিরন্তর আত্মচিন্তার জন্য প্রাণকে ঊর্দ্ধ-কেন্দ্রে বা বিষ্ণুপাদরূপ পরম ধামে স্থাপন করিতে হয় ; তাহাতেই তাঁহাদের নিজের পিণ্ড নিজে দান করার কথা জনসমাজে প্রচারিত হইয়া আছে। যত দিন পর্য্যন্ত সাধু সন্ন্যাসী জীবিত থাকেন, সিদ্ধিপদলাভ করিলেও তাঁহারা কদাপি প্রাণ-সংযমন হইতে বিরত হয়েন না। সে জন্য তাঁহাদের আর বাহ্য পিণ্ডের প্রয়োজন হয় না। তাহাদের গয়াসুররূপী প্রাণও আয়ত্তাধীন থাকে। আমরণ যোগী ইহা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য। কারণ তাহা না হইলে তাঁহার প্রাণাসুরের তৎক্ষণাৎ ক্ষেপিয়া উঠিবার সম্ভাবনা।

বাহ্য-গয়াধামেও সেই জন্য শাস্ত্র নিত্য পিণ্ডদানের ব্যবস্থা দিয়া গয়াসুরকে শান্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

হিন্দুর সন্তান সাত পুরুষ ধরিয়া পিণ্ড দিয়া থাকেন। জীবিত ব্যক্তির সম্বন্ধ সপ্ত পর্য্যায়স্থ পিতৃগণের সহিত। এই সপ্ত পর্য্যায় প্রেতলোকের সপ্ত পর্য্যায়কেও বলা যায়, আবার ব্রহ্মাণ্ডের সপ্তলোকের সপ্ত পর্য্যায়কেও বলা যায়। সর্ব্বশুদ্ধ চৌদ্দটি লোক লইয়া ব্রহ্মাণ্ডের লোকপর্য্যায় নিরূপিত। তন্মধ্যে সাতটি ব্যক্ত ও সাতটি অব্যক্ত। ব্যক্ত সাতটি লইয়া সাংসারিকদিগের কারবার। স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ ভেদে ইহাতে তিনটি পর্য্যায় আছে। সেজন্য ইহার নাম ত্রিভুবন। জীব স্থূল মৃত্যুতে পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গত স্থূল দেহ পরিহার করিয়া সূক্ষ্ম-দেহে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-শক্তি লইয়া সূক্ষ্ম পরলোকে আইসে। ইহার ভোগকাল পূর্ণ হইলে, সূক্ষ্মদেহ ছাড়িয়া জীবাত্মা কারণ দেহে পার্থিব কারণ-জগতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই পার্থিব-সম্বন্ধযুক্ত কারণ-লোক স্বর্গ বা ত্রিদিব নামে পরিচিত।

ইহাতে পার্থিব ইন্দ্রিয় নিচয়ের শক্তিগণ কারণ-শরীর ধারণ করিয়া বসবাস করেন, এ কারণ ইন্দ্রিয়াধিপতি ইন্দ্রের রাজ্য বলিয়া ইহা হিন্দুশাস্ত্রে খ্যাত। পাঞ্চভৌতিক চক্রের পঞ্চ শক্তি অর্থাৎ বায়ু, বরুণ, অগ্নি, আকাশ ইত্যাদি এই ইন্দ্রের সভাসদ্ বলিয়া পরিচিত। পৃথিবীর অন্নচক্র এই স্বর্লোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এজন্য হিন্দুর সমস্ত কার্য্যকলাপে, ইহারা যথারীতি পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভূর্ভুব স্ব যেমন ব্রহ্মাণ্ডের ব্যক্ত সপ্ত পর্য্যায়ের একটী পর্য্যায় মাত্র তেমনি আবার ব্রহ্মাণ্ড পক্ষে, জন, মহ ইত্যাদি লোক সমূহও সূক্ষ্মজগৎ বলিয়া পরি-

চিত। পৃথিবীর অন্ন-চক্র হইতে নিস্তার পাইলে তবে জীবাত্মা, সেই লোকে প্রবেশ করিতে পারে। ইহাতে আসিলে পর পৃথিবীর সহিত অনেকটা সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। পৃথিবীর পোষণশক্তি, যেমন স্থূল অন্ন, এই লোকসমূহের পোষণ উপচার তেমনি জ্ঞান শক্তি। এজন্য জ্ঞানপ্রধান ঋষি তপস্বীর অথবা জ্ঞানপ্রধান জীবাত্মার ইহা অধিষ্ঠান কেন্দ্র। ইহার উপরে তপলোক আছে। তপলোক সপ্ত ব্যক্ত পর্য্যায়ের কারণ ভূমি, তপসম্পন্ন যোগীপ্রধান জীবাত্মার ইহাই অবস্থিতির স্থান; ইহাতে আসিলে পর আর পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা থাকে না। * * * *

বাহ্যজগৎ যেমন শব্দসূত্রে গ্রথিত অন্তর্জ্জগৎ তেমনি কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত। ঐ কর্ম্মসূত্রের কর্ম্ম অনুসারে জীব কৃতকর্ম্মের ফল ধরিয়া জন্মের পর জন্ম লইতে বাধ্য হয়। এই জন্মগ্রহণের মূলেও ক্রমিক বিকাশ বর্ত্তমান। জীবকে শিব করা বা যেখান হইতে জীবাত্মা আসিয়াছে সেই শেষভূমিতে তাহাকে পঁহুছিয়া দেওয়াই ক্রমবিকাশের কার্য্য। হিন্দুশাস্ত্র ইহাকে জ্ঞান-যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করেন। যতদিন জীব বৃহৎ জ্ঞানে উপনীত হইয়া শিবরূপ ব্রহ্মে সম্মিলিত না হয়, ততদিন ঐ জ্ঞানার্জ্জনের জন্য তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই জ্ঞানার্জ্জন-বিধিই অধুনা ক্রমবিকাশ বলিয়া পরিচিত।

ব্যক্ত সপ্তলোক লইয়া স্থূলজগতের কারবার। এ জন্য হিন্দু সন্তান এই সপ্তলোকস্থ সপ্ত অধিবাসীর জন্য নিয়ত 'স্ব-ধা' দানে বাধ্য। তাহার পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ এই লোক সমূহের কোন লোকে বিচরণ করিতেছেন এই চিন্তা করিয়া শাস্ত্র তাহাকে

সপ্তলোকের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিতে উপদেশ দিয়াছেন। সপ্তলোক উত্তীর্ণ হইয়া যাইলে আর পার্থিব বংশের কর্ম্মশক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, অথবা তখন তিনি গয়ারূপ গোলকে, অহং জ্ঞানরূপ বিষ্ণুপদে মতি স্থির করিয়া সম্পূর্ণ আত্মস্থ জ্ঞানে পূর্ণ হয়েন এবং তখন আর তাঁহার কাহারও সাহায্যের আবশ্যকতাও থাকে না। এজন্য চৌদ্দ পুরুষের সহিত পৃথিবীস্থ বংশধরও পিণ্ডশূন্য হয়। তথাপি আদি ও অন্ত লইয়াই হিন্দুর ক্রিয়াকলাপ তাই চৌদ্দ পুরুষের নাম সতত হিন্দুগৃহে প্রতিধ্বনিত হয়।

প্রাণ-ধারাই ক্রিয়াশক্তি। ইহাকেই জগৎ-প্রসবিনী জগদ্ধাত্রী বা দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা দুর্গা নামে কল্পনা করা হয়। ইনিই সংসারচক্রের কর্ত্রী ; ইনি শক্তিদান করিলে জীব মুক্তিপথের পথিক হইতে পারে। শক্তি ব্যতীত মুক্তি অসম্ভব, তাই হিন্দুর প্রাণধারা বা বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার এত প্রয়াস। বংশনাশ সৃষ্টির প্রতিকূল, অর্থাৎ স্রষ্টার যেমন আদি অন্ত নাই, সৃষ্টিরও তেমনি আদি ও অন্তহীন অবস্থা। সেজন্য হিন্দু যে লোকেই থাকুন, তাঁহার প্রাণধারারূপ বংশ যেন আদি ও অন্তহীন অবস্থায় লোকে লোকে বর্ত্তমান থাকে ইহাই তাঁহার প্রাণের কামনা। এই কামনার বশে হিন্দু পুত্রের নিকট মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু আশা করেন না।

---

# গয়া

পুরাণে—ভারতে—শতেক গ্রন্থে—শতেক ছন্দে পূজিত নিত্য,
শৈল-সরণি হিন্দোলে বাঁধা পিতৃলোকের তৃপ্তি তীর্থ,
বিষ্ণুচরণ কিণ-পরিচিত কলিনাশন যাহার দর্প,
প্রতি রেণু যার পুণ্যপূত ঋত্বিকসম পূতস্পর্শ।
এই সেই গয়া, যথা নারায়ণ-চরণ-কাঙালী অসুর ভক্তে—
দিয়া অমূল্য পদ-উপায়ন এ মহাতীর্থ রচিলা মর্ত্তে!
জয় জয় গয়া, জয় গয়াজীর, বিশ্বমানব গাও হে হর্ষে,
চিরজাগ্রত যথা নারায়ণ সে যে এই গয়া ভারতবর্ষে!

২

ধূ ধূ বালুতট—শুভ্রাংশুক-গুণ্ঠিত—মুখে নাহিক শব্দ—
অন্তঃসলিলা বহিছে ফল্গু—শঙ্কা-সরম-জড়িত স্তব্ধ!
কখন্ বাজিবে বাঁশীটি হাতের তাই চেয়ে চেয়ে এ উৎকর্ণ—
ভুলেছে ফল্গু—এ নহে সে কানু, আজো দেখে তাই প্রেমের স্বপ্ন!
এযে গয়া, ওগো হেথা হয় শুধু মৃতের কারণে অমৃত ভিক্ষা—
হেথা নারায়ণ দৈত্যের চির-বন্দী করিতে সত্যরক্ষা!
জয় জয় গয়া, জয় গয়াজীর, বিশ্বমানব গাও হে হর্ষে,
চিরজাগ্রত যথা নারায়ণ সে যে এই গয়া ভারতবর্ষে!

৩

বালির পিণ্ডে তর্পি পিতায় নিজে নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্র
বাড়াইলা যার স্তবগৌরব, মানবের সেত পরম বন্দ্য!
যথা বোধিতলে শাক্যসিংহরূপী নারায়ণ বুদ্ধ সিদ্ধ—
দয়ার মন্ত্রে কতত্তরায় করিলা বিশ্বে অশেষ ঋদ্ধ!

এই সেই গয়া—মুক্তির ভূমি, মোক্ষের মাটি, যুগযুগান্ত—
এ মহাতীর্থ মরণ-আহত মানববর্গে করিতে শান্ত।
জয় জয় গয়া, জয় গয়াজীর, বিশ্বমানব গাও হে হর্ষে,
চিরজাগ্রত যথা নারায়ণ সে যে এই গয়া ভারতবর্ষে!

৪

প্রেম-অবতার নিমাই যেথায় স্বামী ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে,
পিণ্ড দিলেন পূর্ব্বপুরুষে বসিয়া যাহার ধূলার অঙ্গে,
রূপ সনাতন আদি সাধুগণ রেখে গেছে যথা চরণ অঙ্ক,
নরনারায়ণে মিলি যার ধূলি করিলা পুণ্য নিষ্কলঙ্ক;
এই সেই গয়া—প্রেমদেবতারা যুগে যুগে সেবি করেছে উচ্চ
ধন্য তাহার ঘাট বাট মাঠ তরুলতা ধূলা—নহে তা তুচ্ছ!
জয় জয় গয়া, জয় গয়াজীর, বিশ্বমানব গাও হে হর্ষে,
চিরজাগ্রত যথা নারায়ণ সে যে এই গয়া ভারতবর্ষে!

৫

'জয় জয় গয়া, জয় গয়াজীর' যাহার আকাশ ধ্বনিত নিত্য—
ভক্তি নিষ্ঠা গন্ধিত বায়ু, হোত্র বিভূতি পুণ্ড্র দীপ্ত!
পূর্ব্বপুরুষ মুক্তি-প্রার্থী কোটি নরনারী ব্যাকুলচিত্ত,
যার পথে পথে ফিরে সারাদিন—সে যে ধরণীর শ্রেষ্ঠ তীর্থ!
এই সেই গয়া—এস নরনারী, হও ধূলিলীন আনত-মস্ত।
দৈত্য-দাতার হরিপদ-দান যত পার লও ভরিয়া হস্ত।
জয় জয় গয়া, জয় গয়াজীর, বিশ্বমানব গাও হে হর্ষে,
চিরজাগ্রত যেথা নারায়ণ, সে যে এই গয়া ভারতবর্ষে!

# পৌরাণিকী কথা।

গয়াসুর
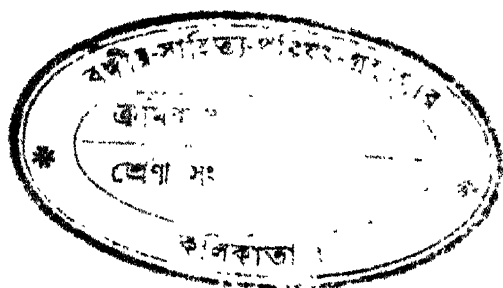
# গয়া-কাহিনী

## উপক্রমণিকা

সে আজ কত কালের কথা। আমাদের দেশে সেই সুদূর অতীত কালে বায়ু নামে এক মুনি ছিলেন। ইনি অযোধ্যার নিকট নৈমিষারণ্যে জপ-তপ করিতেন। এখানে দধীচি মুনির আশ্রম ছিল। তাঁহার সময় হইতেই নৈমিষারণ্য পুণ্যতীর্থ বলিয়া সকলের নিকট সমাদর লাভ করে।

জপ-তপ করিলে মনের ময়লা ধুইয়া যায়, পাপ ময়লা চলিয়া গেলে ভক্ত প্রাণের ভিতর ভগবানের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করেন, এ জন্যই সেই প্রাচীন যুগে ঋষিগণ নদীর ধারে কুঁড়ে ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিবা-রাত্রি দেবতার আরাধনা করিতেন। এইরূপ স্থানকে লোকে সচরাচর আশ্রম বলিত।

আশ্রম বড় সুন্দর, বড় মধুর ছিল। সেখানকার গাছের শাখায় বসিয়া কোকিল-পাপিয়া, দয়েল, ময়না কত রকমের পাখী সুমধুর আবাহন গানে দিক পূর্ণ করিত; সেই কোমল সঙ্গীতে কেমন একটা মাধুর্য্য ছিল, তাহা বিচিত্র রশ্মি ছটার মতই উজ্জ্বল, উল্লাসিত। সেখানে দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, সংসারের জ্বালা নাই, চারিদিকে কেবলই শান্তি, কেবলই আনন্দ, শান্তি ও আনন্দ যেন ভাই-বোনের মত এক সঙ্গে সেই স্থানটাকে জুড়িয়া ছিল। কেবল কি তাই? তাহা নয়। বিশ্ব-সংসারের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা স্বার্থ ও জীবন উৎসর্গ করিতেন, কি করিলে জীব

মাত্রই সুখী হয় এই চিন্তা তাঁহাদের প্রাণে নিয়ত জাগিয়া থাকিত। এইখানেই তাঁহাদের উচ্চ হৃদয়ের অনন্যসাধারণ শক্তি দেখিয়া আজিও আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হই।

তখন বসন্তকাল। সমস্ত নৈমিষারণ্য জুড়িয়া দিকে দিকে আনন্দের রোল উঠিয়াছে—সামগান ঘণ্টাধ্বনি, ও হোমানলের ধূম যেন আশ্রমের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কেমন একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। সেই আনন্দের দিনে বড় একটা গাছের নীচে মুনি-ঋষিদের একটা ধর্ম্মসভা বসিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বিদ্যায় খুব বড় ছিলেন তাঁহারা এক এক খানি পুরাণ রচনা করিয়া উপস্থিত মুনি ঠাকুরদিগকে বলিতেন। এই সময় বায়ু ঋষি গয়াসুর এবং আরও অনেক দেব-দানবের কাহিনী ও তত্ত্ব-কথা বলিয়াছিলেন। সেই হইতে ঋষি-কথিত ঐ পুরাণকে 'বায়ু পুরাণ' বলা হয়।

পাটনার দক্ষিণে গয়াতীর্থে গয়াসুর তপস্যা

করিতেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ তপস্যা করিলে দেবতাদের বড় ভয় হইত। এই মহাসুরের শক্তি নষ্ট করিবার জন্য ব্রহ্মা ছলে কৌশলে তাঁহার মস্তকে বিশাল একখানি পাথর স্থাপন করিয়াছিলেন। অত বড় অসুর কি সামান্য এক-খানি পাথরের চাপেই নিশ্চল হইবেন? গয়াসুর ঐ শিলা লইয়া চলিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা ভাবিয়া অস্থির, তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণকে শিলার উপর বসিতে বলিলেন। হায়! তবুও অসুর নিশ্চল হইল না। অবশেষে বিষ্ণু বিরাট্‌ভাবে সেইস্থানে প্রকাশিত হইলেন, তাঁহার আবির্ভাবে গয়াসুরের পাশব শক্তি দেখিতে দেখিতে মহাশক্তির সঙ্গে মিলা-ইয়া গেল। এই ব্যাপার হইতেই গয়াতীর্থের কথা আমরা জানিতে পারি। গয়াসুরের কাহিনী একটা আষাঢ়ে গল্প মনে করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিও না। তোমরা দেখিতে পাইবে ইহার ভিতর মানব মনের দৃঢ়তা, দেবাসুরের সংগ্রাম, ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের নাশ প্রভৃতি বিষয়গুলি এক এক খানি

চিত্রপটের ন্যায় পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য বিচ্ছুরিত করিতেছে।

গয়ায় আমাদের কি কাজ করিতে হয় সম্ভবতঃ তোমরা তাহা জান না। শ্রাদ্ধ ও গদাধরের পাদ-পদ্মে পিণ্ডদান সন্তান মাত্রেরই কর্ত্তব্য। পরলোকগত প্রিয় আত্মার কল্যাণের জন্য পরমেশ্বরের নিকট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত জীবিতের যে প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা তাহাই শ্রাদ্ধ। সাধারণতঃ মানুষ মৃত্যুর পর অতি পবিত্র শ্রাদ্ধ দিনে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাতে পূর্ণ হইয়া প্রিয়-জনকে বিশ্বস্রষ্টার সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া বড় করিয়া দেখে—মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রত্যক্ষ ছিলেন তাই তাঁহাকে অত বড় করিয়া দেখিবার অব-সর ছিল না। কিন্তু শ্রাদ্ধ দিনে মৃত্যুর সহিত যাহা কিছু তুচ্ছ, ক্ষণিক ও চঞ্চল সেই সমুদয় দূরে সরাইয়া দিয়া মুক্তাত্মাকে পরিপূর্ণ সত্যের ভিতর উপলব্ধি করিয়া সন্তান ও আত্মীয় স্বজনের হৃদয় অমৃতালোকে ভরিয়া যায়। তখন পুত্র কন্যা পিতা মাতার জন্য অমৃতময় আনন্দময়ের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলেন,—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধৰ্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতি-মাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

পিতা স্বর্গ, পিতা ধৰ্ম্ম—
শ্রেষ্ঠ তপ হন,
তোষিলে পিতারে তুষ্ট
হেরি দেবগণ।

এইভাবে আমরা মৃত পিতৃগণের উদ্দেশে ভক্তি ও প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে অপূর্ণতাকে পূর্ণতার সহিত মিলাইয়া দিয়া—নিত্যের সহিত অনিত্যের সংযোগ করিয়া—স্মরণীয় দিনে শ্রাদ্ধ করি। শ্রাদ্ধ কি শুধু আমরাই করি? তাহা নয়। হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য জাতিরাও কোনও না কোন প্রকারে পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধ করেন। প্রভেদটা শুধু লৌকিক আচার ব্যবহারে।

---

# গয়াসুর—আবির্ভাব।

ত্রিপুরাসুর নামে অসুরদের এক রাজা ছিল ; মস্ত রাজা,—লোক জন, হাতীঘোড়া, ধনদৌলত কিছুরই অভাব ছিল না। তাহার অজেয় সেনা দেশ জয় করিত, সংসারে এমন জায়গা ছিল না যেখানে তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই। ত্রিপুরাসুরের প্রচণ্ড তেজ, অদ্ভুত বীরত্ব ও রাজশক্তির গৌরব দেখিয়া দেবতারা প্রথমে বড় খুসি হইয়াছিলেন। দেবতারা খুসি হইলেই বর ও আশীর্ব্বাদের ছড়াছড়ি। তাই তাঁহাদের বরে অসুরের স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কার এতটা বাড়িয়া গিয়াছিল যে, সে ত্রিভুবনে কাহাকেও মানিত না। অবশেষে স্বর্গরাজ্যে তাহার উৎপাত আরম্ভ হইল। ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া দেবতারা ত্রিপুরকে বর দিয়াছিলেন, এখন

তাহার ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া ভয়ে মানুষের মত পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তখন তেত্রিশকোটি দেবতা সকলে মিলিয়া মঙ্গলময় মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা যোড়হাতে বলিতে লাগিলেন,—'ঠাকুর, প্রচণ্ড ত্রিপুর আমাদের সমস্ত অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে। আমরা তাহার ভয়ে পৃথিবীতে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমরা আপনার শরণ লইলাম। এখন যেমন করিয়া তাহার বিনাশ হয়, সেই উপায় বিধান করুন।'

তাহা শুনিয়া শঙ্করের বিষম ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি কহিলেন,—'আচ্ছা, আমি ত্রিপুরকে এখনই শাস্তি দিতেছি। তোমাদের কোন ভয় নাই। আমি সত্বরই সে অসুরকে বধ করিয়া তোমাদিগকে নিশ্চিন্ত করিব।' এ আশ্বাসবাণী শুনিয়া দেবগণ নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া গেলেন।

ত্রিশূল হস্তে মহাদেব যুদ্ধ করিতে চলিলেন, সঙ্গে দেবতা গন্ধর্ব্ব সকলে 'জয় জয়' শব্দে ছুটিয়া চলিল। তখন তাঁহার মুখে 'বম্ বম্' ধ্বনি

শুনিয়া সমস্ত সংসার স্তম্ভিত হইল। ত্রিপুরও সহজ অসুর নয়। তাহার কিল-চাপড়ে শিবের কত সৈন্য মারা গেল। ক্রোধে পশুপতির চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। তিনি তখন সংহার-মূর্ত্তিতে ত্রিপুরের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। একি? দেখিতে দেখিতে মহাদেবের কপালের আগুন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সহসা দাবানলের ন্যায় অগ্নির তেজে ত্রিপুরাসুর পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়া মহাদেবের অন্য নাম হইল 'ত্রিপুরারি'।

এখন আমরা গয়াসুরের কথা বলিব। ত্রিপুরাসুরের মৃত্যুর অল্প কিছু পূর্ব্বে স্বর্গ হইতে নারদ মুনি মর্ত্তে আসিয়াছিলেন। ইনি পরম ভক্ত, নিয়ত হরিনাম গানে বিভোর থাকিতেন। ইনি ঋষি কি না, তাই স্বর্গে বসিয়াই মর্ত্তের ভবিষ্যৎ সংবাদ সবই জানিতে পারিতেন। দেশ, সমাজ বা পরিবার বিশেষের কোন বিপদের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলেই ঠাকুর সংসারে ছুটিয়া আসিতেন। উপযুক্ত সময়ে অমঙ্গলের

সংবাদ জানিতে না পারিলে কত দেশ, কত পরিবার যে ধ্বংস হইত তাহা কে বলিবে? ঝগড়া বাঁধাই-বার জন্য লোকে নারদের নাম করে তোমরা সকলেই জান। ঝগড়া বাঁধানই কি তাঁর কাজ ছিল? এই রকম আজগবী ভাবের সহিত অত বড় আদর্শ পুরুষের চিত্র মিলাইলে তোমরা প্রতারিত হইবে। নারদ ভগবানের বাণী। সূক্ষ্মতম সঙ্গীতের ভিতর দিয়া ভক্ত ঐ বাণীর সাড়া পান। মানব মনের উপর সঙ্গীতের প্রভাব অতি অদ্ভুত। দেব বলি, দানব বলি, সাধারণ মনুষ্য বলি, সকলেই গানে মুগ্ধ হন—সঙ্গীত ধ্বনি মনকে ভিজাইয়া দেয়। দুষ্ট ত্রিপুরের সঙ্কট সময়ে নারদ ঋষির আবির্ভাব হইয়াছিল।

শুক দৈত্যের কন্যা প্রভাবতী ত্রিপুরের স্ত্রী। তিনি খুব শোভনা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন; তিনি সকলকে দয়া করিতেন, তাঁহার মনে গর্ব্ব অহঙ্কার দ্বেষ ঈর্ষ্যা কিছুই ছিল না, পতির অন্যায় আচরণ ইনি কখনও সমর্থন করিতেন না। ইনি সংসারের

সুখ দুঃখকে বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তিভরে সারাদিন বসিয়া নারায়ণের পূজা করিতেন।

ভক্ত প্রভাবতীর উপস্থিত বিপদ বুঝিতে পারিয়া নারদ ঋষি তাঁহার স্বামী ত্রিপুরকে বলিলেন,—

'এই তব ভার্য্যা-গর্ভে আছে তব সুত।
তার কর্ম্ম ভবিষ্যতে হইবে অদ্ভুত॥
একচ্ছত্র ত্রিভুবনে হইবে রাজন।
মহাপুণ্য ক্ষেত্রবর করিবে সৃজন॥
শীঘ্রগতি রাখ লয়ে জনকের ঘরে।
তবে শিব সহ তুমি প্রবেশ সমরে॥'

বলিয়াই সেই মূর্ত্তি আকাশে মিলাইয়া গেল।

অনন্তর যথাসময়ে রাণী প্রভাবতীর গর্ভে গয়াসুরের জন্ম হইল। গয়াসুরকে সামান্য অসুর বা দৈত্য মনে করিও না। গয়াসুরের শরীর কত বড় ছিল তাহা শুনিলে অবাক্ হইবে। তাহার বিরাট দেহটা ছিল একশ পঁচিশ যোজন উচু, ও ষাট যোজন চওড়া—-যেন একটা প্রকাণ্ড পাহাড় !

গয়াসুর মাতুল গৃহে আদরে বাড়িতে লাগিল,

দিব্য গোলগাল, হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ চেহারা হইল ও গায়ে সতেজ মাংসপিণ্ড জমিতে লাগিল। তাহার কর্ণে স্ফটিকের কুণ্ডল, বাহুতে সুবর্ণ বলয়, কণ্ঠে একগাছা মণিমুক্তা খচিত হার এবং পরিধানে এক-খানি রেশমের পীতবসন—এই সাজ-সজ্জায় শিশু গয়াসুরকে বড়ই সুন্দর দেখাইত।

গয়াসুর বড় হইয়া হাঁটিতে শিখিল। পাঁচ বৎসর বয়সে তাহার হাতে খড়ি হইল। তখন তাহার মা তাহাকে গুরুর বাড়ীতে পাঠশালায় লেখা পড়া শিখিতে পাঠাইলেন। সেই আদিযুগে ধনী দরিদ্র সকলেই গুরুগৃহে যাইয়া লেখাপড়া শিখিত। গুরু ও গুরু-পত্নীর সঙ্গে থাকিয়া প্রতিভাবান্ ছাত্রেরা নিজ হাতে সংসারের নানা কাজ-কর্ম্ম শিক্ষা করিবার সুবিধা ও অবসর পাইত। তোমরা মহা-ভারত প্রভৃতি পুরাণে উদ্দালক, উতঙ্ক প্রভৃতি আর্য্য বালকদের সংযম ও নিষ্ঠার অপূর্ব্ব ইতিহাস পড়িয়াছ। গুরুগৃহে কার্য্যকরী শিক্ষা লাভের সুযোগ না হইলে তাঁহাদের প্রতিভা ও গুরু-ভক্তির কথা আজ তোমরা

শুনিতে পাইতে কি না সন্দেহ। যাহা হউক তখনকার কালে দেশের নিয়ম ছিল বলিয়া—গয়াসুর রাজার ছেলে হইলেও—তাহাকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের গৃহে যাইয়া লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছিল। শুক্রাচার্য্য ছিলেন দানবগণের গুরু, আর বৃহস্পতি ছিলেন দেবতাদের গুরু। শুক্রাচার্য্যের গৃহ তখনকার দিনের বড় রকমের একটা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। কতকগুলি বিদ্যালয়ের সমষ্টিকে বিশ্ববিদ্যালয় বলে। এই সব বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি প্রভৃতি নানা শাস্ত্র পড়ান হইত। এখানে প্রকৃত শিক্ষাদান গুরুদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। সংযম ও শিষ্টাচার সেই শিক্ষার মূলে বিদ্যমান থাকায় উহা এক রকম তপস্যায় পরিণত হইয়াছিল। মন, দেহ ও চরিত্র গঠন অর্থাৎ একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ গঠন করিয়া তোলাই প্রকৃত শিক্ষা। শুধু রাশি রাশি গ্রন্থ পড়িলেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। •

শুক্রাচার্য্যের গৃহে কেবল বেদ-বেদাঙ্গ প্রভৃতি

ধর্ম্মশাস্ত্রই যে শিক্ষা দেওয়া হইত এমন নহে, তাহা ছাড়া যুদ্ধ-বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত। শুক্রাচার্য্য 'সঞ্জীবনী' মন্ত্র জানিতেন। এই মন্ত্রের অপূর্ব্ব শক্তি প্রভাবে যুদ্ধে নিহত দৈত্য সৈন্য পুনরায় প্রাণ ফিরিয়া পাইত।

সঞ্জীবনী মন্ত্র ভৃগু-পুত্রের অভ্যাস।
যত মরে তত জীয়ে নাহিক বিনাশ॥

এই মন্ত্রের আশ্চর্য্য প্রভাব দেখিয়া দেবতারা বিস্মিত হইলেন। তখন তাঁহারা সভা করিয়া বৃহস্পতি পুত্র কচকে মন্ত্র শিক্ষার জন্য গোপনে বৃষপর্ব্বপুরে পাঠাইয়াছিলেন। এই স্থানে গয়াসুরও

'সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হয় মহাবীর।'

---

# গয়াসুর—মুক্তি।

বালক গয়াসুরের গুণের সীমা ছিল না। অসুর বলিতে তোমরা সয়তানের অবতার মনে করিও না। অসুরদের মধ্যে কত মহাধার্ম্মিক ছিলেন। গয়াসুর সত্যবাদী ও ক্ষমাশীল ছিল। সে ভাল ভিন্ন মন্দ কাজ করিত না। সে সকলকে ভালবাসিত, পরসেবা ও দুঃখীর দুঃখ মোচন করা সে গৌরব বলিয়া মনে করিত।

একদিন গয়াসুর পাঠশালা হইতে মনের দুঃখে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। হৃদয়ে শত ব্যথা, বিদ্যালয়ে সমপাঠীরা তাহাকে কটু কথা বলিয়াছে, তাই সেদিন ক্ষুদ্র বালকের প্রাণ ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। সে মায়ের নিকট গিয়া বলিল,—

শুনগো জননী মোর এক নিবেদন।  
বিবরিয়া কহ মোরে ইহার কথন॥  
যখন পড়িতে আমি যাই গুরুস্থানে।  
পিতৃহীন বলি মোরে বলে সর্ব্বজনে॥

কহত জননী শুনি পূর্ব্বের কথন।
কোন্ বংশে জন্ম মম কাহার নন্দন॥

ইহা শুনিয়া প্রভাবতীর মনে ভারি দুঃখ হইল, তাঁহার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল ; কিন্তু পাছে পুত্র আরও অধিক ক্লেশ পায় এজন্য তিনি নিজের দুঃখ গোপন করিয়া কহিলেন,—'বাবা, বিখ্যাত ধন্দ অসুরের বংশে তোমার পিতা ত্রিপুর জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার বীরত্বে একদিন সমগ্র পৃথিবী থর্ থর্ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। যখন তিনি পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, ত্রিভুবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে অন্যায় যুদ্ধে মারিবার জন্য দেবগণ গোপনে পরামর্শ করেন। সেই সময়ে তুমি আমার গর্ভে ছিলে। ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া নারদ ঋষির পরামর্শ মত তিনি আমাকে এখানে রাখিয়া যান এবং এখানেই তোমার জন্ম হয়। অনন্তর মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি মৃত্যুর অধীন হন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে—

ভ্রাতৃ বন্ধু আদি যত ছিল দৈত্যগণ।
সকলেরে দেবগণ করিল নিধন ॥

হায়, আজ সেই বংশে তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই।' সংক্ষেপে এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দর্ দর্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

এই কথা শুনিয়া গয়াসুর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইল; ক্রোধে তাহার চক্ষু জবা ফুলের মত রক্তবর্ণ হইল, এবং তাহার ঠোঁট ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। তখন কে যেন তাহার মনের ভিতর বলিতে লাগিল—'বৎস, তুমি বন্ধুহীন, আশ্রয়হীন হইলেও নিরুৎসাহ হইও না। কমলাপতি বিষ্ণুর আশীর্ব্বাদে তুমি পরিপূর্ণ মঙ্গলের সহিত জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।' প্রাণের ভিতর সাড়া পাইয়া বালক করজোড়ে নারায়ণকে প্রণাম করিয়া মাকে বলিল,—'মা, আমি এখনই ইহার প্রতিবিধান করিব। দেখি আমার গুরু এ সম্বন্ধে কি বলেন।' বলিয়া গয়াসুর গুরুর বাড়ীতে ছুটিয়া গেল।

* * * * * *
* * * * * *

ইহার পর অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। শুক্রাচার্য্য শিষ্য গয়াসুরকে অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা দিলেন। বিদ্যালাভ করিয়া শিষ্য দেশে ফিরিয়া আসিল। যথাবিধি মায়ের চরণে প্রণাম করিয়া সে বলিল,—

'মা, তোমার আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া এইবার আমি দেবতাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি। তুমি অনুমতি কর।'

রাণী প্রভাবতী পুত্রের মঙ্গলের জন্য দেব মন্দিরে পূজা করিয়া যুদ্ধ গমনোন্মুখ বীর পুত্রের মস্তকে ধান্য দুর্ব্বা ও বিল্বপত্র স্থাপন করিয়া বলিলেন,—

'বৎস, তুমি যুদ্ধে জয়লাভ কর এবং বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া জগতে পরিচিত হও। মা রণচণ্ডী তোমার সহায় হউন।'

তখন হাজার হাজার দৈত্যসৈন্য গয়াসুরের সহিত আসিয়া মিলিত হইল।

সুমেরু শিখরে গয়াসুরের সহিত প্রথমে ইন্দ্রাদি দেবগণের বড় রকমের একটা যুদ্ধ উপস্থিত হয়।

সেই যুদ্ধে মুহূর্ত্ত মধ্যে দেবতাদের সৈন্যসামন্ত ছিন্নভিন্ন, ছারখার হইয়া গেল; যখন জয়ের আর কোন আশা নাই, তখন দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব দেবতাদিগকে অভয় দিয়া গয়াসুরের দিকে বেগে ধাবমান হইলেন। প্রচণ্ড প্রমথ সৈন্য নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভূতনাথের সঙ্গে ধেই ধেই নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়া চলিল। পিতৃশত্রু মহাদেবের সংহার-মূর্ত্তি দেখিয়া গয়াসুর একটু ভীত বা চঞ্চল হইল না। তাহার বিষম ক্রোধ উপস্থিত হইল। ক্রোধ হইতেই গয়াসুর অতি বেগে প্রমথ সৈন্যের উপরে যাইয়া পড়িল; এবং তাহাদিগকে দুই হাতে ধরিয়া—ঊর্দ্ধে আকাশের গায়ে ছুড়িয়া মারিল। হাজার হাজার প্রমথ সৈন্যের বুকের রক্তে পাহাড়ের সমতল জায়গাটা লাল হইয়া গেল।

তাঁহার সমস্ত সৈন্য নিহত দেখিয়া মহাদেব ত্রিশূল হস্তে গয়াসুরের দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু হায়, কেন জানি সেই দিন ত্রিশূলের অমিত

তেজ সহসা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। ত্রিপুরারি যুদ্ধে পরাজিত হইলেন, তাঁহার দর্প চূর্ণ হইল।

তখন গয়াসুর ত্রিভুবনের রাজা। দেবতারা রাজ্যহারা হইয়া উদাসীনের মত এদিক ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একদিন দেবতারা কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট গেলেন এবং গয়াসুর-কাহিনী ও তাঁহাদের দুর্গতির কথা তাঁহাকে শুনাইলেন। তখন বিষ্ণু ক্ষীর-সমুদ্রে সাপের বিছানায় শুইয়াছিলেন। দেবতারা অনেক স্তব-স্তুতি করিয়া প্রার্থনা করিলেন—

'জয় জয় জনার্দন জয় জগৎপতি।
ত্রিভুবন চরাচর তোমার বিভূতি॥
তুমি সৃজ তুমি পাল করহ সংহার।
এ মহা বিপদে দেব করহ নিস্তার॥
তোমার স্থাপিত দেব যত দেবগণ।
আপনি স্থাপিয়া কর আপনি নিধন॥'

ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—

'হে দেবগণ, তোমাদের ভয় নাই, তোমরা স্থির

হইয়া গৃহে যাও। আজ আমি গয়াসুরকে বধ করিয়া সংসারে অদ্ভুত কীর্ত্তি রাখিব।'

বিষ্ণুর বাক্যে দেবতাদের প্রাণে শান্তি ফিরিয়া আসিল; তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে গেলেন।

তৎপরে ভগবান বিষ্ণু গয়াসুরের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—

'গয়াসুর, তুমি যুদ্ধে দেবগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছ। সেই রাজ্য ফিরাইয়া লইতে আমি আসিয়াছি। রাজ্য ফিরাইয়া দাও, নতুবা আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিব।'

ইহা শুনিয়া গয়াসুর রাগে পাগলের মত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন সে ভীষণ চীৎকার করিয়া বিষ্ণুকে বলিল,—

'ঠাকুর, তুমি জান কপট যুদ্ধে মহাদেব আমার পিতা ত্রিপুরকে বধ করিয়াছিলেন। দেবতাদের এ কেমন ধর্ম্ম। পিতৃ-বৈরী দেবতাদিগকে আমি কখনই রাজ্য ফিরাইয়া দিব না। যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে যুদ্ধ কর, আমি ভীত নহি।'

ভগবান্ হরি গয়াসুরের বীরত্ব ও পিতৃভক্তি দেখিয়া বড়ই খুসি হইলেন। তিনি কহিলেন,—

'আচ্ছা তাহাই হউক।'

দেবাসুরের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রণভেরীর নাদে নক্ষত্রের সহিত আকাশ কাঁপিয়া উঠিল। উভয় পক্ষের শেল, শূল, শক্তি, মুষল, মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রে পরস্পরের অসংখ্য সৈন্য প্রাণ হারাইল। এইরূপে একশত বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। বিষ্ণু ও গয়াসুর কেহই কম নহেন,

'কেহ পরাজয় নহে সম দুইজনে।'

দেখিতে দেখিতে দিঙ্‌মণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া বিদ্যুতের মত এক দেবীর আবির্ভাব হইল। তাঁহার গায়ের আভায় সমস্ত যুদ্ধস্থল শ্রীসম্পন্ন ও সুন্দর হইয়া উঠিল। এই সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী দেবী গয়াসুরের চিত্তে বিপর্য্যয় ঘটাইল, সে তাহা বুঝিতে পারিল না। তখন সে বিষ্ণুকে কহিল,—

'ঠাকুর, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বড় সুখী

হইয়াছি। এখন আমার নিকট হইতে ইচ্ছা মত বর গ্রহণ কর।'

বিষ্ণু একটু হাসিয়া ভাবিলেন 'এ ভালই হইল। মহাদৈত্য নিজ হইতেই মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিল।' বিষ্ণু কহিলেন,—

'গয়াসুর, সে উত্তম কথা। আমাকে তুমি এই বর দাও যে তুমি কখনও দেবতা অথবা মনুষ্যকে হিংসা করিবে না। আর তুমি স্বয়ং পাষাণ হইয়া এখানে শুইয়া থাকিবে।'

বরের কথা শুনিয়া গয়াসুর 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি প্রদান করিল।

বিষ্ণু পরম সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার ইঙ্গিত মত ধর্ম্মরাজ অসুরের মস্তকে ধর্ম্মশিলা স্থাপন করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—

'তোমার কল্যাণ হউক। এখন তুমি বর প্রার্থনা কর।'

বিষ্ণুকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া গয়াসুর কর-জোড়ে কহিল,—

'ভগবান্, আমার প্রথম কামনা এই ক্ষেত্রমধ্যে আমার মৃত্যু হউক। আর তোমার বরে এখানেই যেন শিলা হইয়া থাকি। দেব, তোমার পাদ-পদ্ম আমার মস্তকে স্থাপন কর। এই ক্ষেত্র আমার নামেই 'গয়াক্ষেত্র' নামে জগতে ঘোষিত হউক। আমার এই শিলাময় শরীরে যে কেহ তর্পণ ও পিণ্ডদান করিবে তাহার পিতৃগণ সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিবে। কিন্তু ঠাকুর শেষ কথা এই

'পিণ্ডদানে মুক্ত নাহি হবে যেই দিন।
সংসার নাশিব আমি উঠি সেই দিন॥'

বরের কথা শেষ হইতেই শ্রীহরি আপন পাদপদ্ম গয়াসুরের মস্তকস্থিত শিলার উপর স্থাপন করিলেন। গয়াসুরের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত ও নয়ন যুগল বিস্ফারিত হইল। দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার দেহ শিলায় পরিণত হইল।

---

# ধর্ম্মশিলা।

গয়াসুরের প্রচণ্ড তেজ নষ্ট করিবার জন্য একখানি পাথর তাহার মস্তকে চাপাইয়া দেওয়া হয়। ইহার উপর আজিও বিষ্ণু-পদ-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবরূপিণী শিলার কাহিনী বড় অদ্ভুত। অনেক দিন আগে ধর্ম্ম নামে এক মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল বিশ্বরূপা। ইঁহারা উভয়ে অত্যন্ত ধর্ম্ম-পরায়ণ ও পবিত্র স্বভাব ছিলেন। দেবতার আশীর্ব্বাদে ইঁহাদের ফুলের মত সুন্দরী একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। মেয়েটি দেখিয়া বাপ-মায়ের প্রাণে আনন্দ যেন আর ধরে না। কন্যার মঙ্গল কামনায় তাঁহারা আতুর দীন-দুঃখীকে অজস্র অর্থ দান করিলেন। এই কন্যার নাম ধর্ম্মব্রতা। ধর্ম্মব্রতা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে

ধর্ম্মব্রতার গায়ের রং ক্রমে শুভ্র জ্যোৎস্নার মত নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। মাথার কাল চুল পদ্মের মত সুন্দর মুখের সৌন্দর্য্য শতগুণে বাড়াইয়া তুলিল। এমন গুণবতী ও সুন্দরী কন্যার বর কি সহজে মিলে? ধর্ম্ম স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল এই তিন লোকে খুঁজিয়াও ধর্ম্মব্রতার বর পাইলেন না। ধর্ম্মের হৃদয়ে উৎকণ্ঠা দেখা দিল, তখন তিনি হতাশ প্রাণে কন্যাকে বলিলেন,—

'মা, তোমার বিবাহ সময় উপস্থিত হইয়াছে, এইবার তুমি বরের জন্য তপস্যা কর। আমি ত্রিভুবনে তোমার উপযুক্ত স্বামী খুঁজিয়া পাইলাম না।'

বিবাহের কথা শুনিয়া ধর্ম্মব্রতার মুখশ্রী আরক্তিম হইয়া উঠিল। লজ্জায় তিনি অধোমুখী হইলেন। কিছুক্ষণ পর ধর্ম্মব্রতা 'তাহাই হউক' বলিয়া একদিন বনে চলিয়া গেলেন।

* * * *

ধর্ম্মব্রতা পথ চলিতে লাগিলেন ; পাথরে পা কাটিয়া গেল, ক্ষত হইতে রুধির ছুটিল, বনের অন্ধকারে কতবার পথ ভুল হইতে লাগিল,—তবু ধর্ম্মব্রতা পথ চলিলেন। কতদূর, পথ যে আর ফুরায় না ! পাহাড়ের পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কতদূর কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে, তার যেন শেষ নাই। ক্রমে তিনি একটা নদীর ধারে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই জায়গাটার চারিদিকে ঢেউয়ের মত পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গাছ। নিবিড় অরণ্য। কোথায়ও সাড়া শব্দ নাই, কেবল মাঝে মাঝে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ঝিনি ঝিনি, ও পাতার ঝুরু ঝুরু শব্দ। এই শান্তিপূর্ণ মনোরম স্থানে ধর্ম্মব্রতা আসন করিয়া তপস্যায় বসিলেন। কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একমনে ভগবানকে যে ডাকা যায় তাহাকেই তপস্যা বা সাধনা বলে।

কঠোর তপস্যায় ধর্ম্মব্রতার দেহ শুষ্ক হইল, কিন্তু তাঁহার চোখে মুখে ও সমস্ত শরীরে এক পবিত্র জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। একদিন নয়, দুই দিন নয়,

কতকাল তিনি একমনে তপস্যা করিলেন। ইহা শ্বেতকল্পের † কথা।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। একদিন এক মুনিঠাকুর সেই তপস্যা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধানে জবা ফুলের রং‌এর মত পট্টবস্ত্র, হাতে কমণ্ডলু, মাথায় লম্বা জটা, সমস্ত শরীরে কেমন একটা উজ্জ্বল পবিত্র শ্রী। ইনি ব্রহ্মার মানস পুত্র মরীচি। প্রজাপতি ব্রহ্মার মন হইতে মনু প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয়। মরীচি তাঁহাদের মধ্যে একজন। পিতার অনুমতি লইয়া ইচ্ছামত পত্নী খুঁজিতে ইনি পৃথিবীতে আগমন করেন। ধ্যানমগ্ন ধর্ম্মব্রতার ললিত মূর্ত্তি দেখিয়া মরীচি মোহিত হইলেন।

লক্ষ্মীর সমান এই আশ্চর্য্য সুন্দরীকে যোগ-

† আর্য্য ঋষিরা সময়কে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগকে কল্প বলে। প্রত্যেক কল্প আবার চৌদ্দটি মন্বন্তরে বিভক্ত। প্রত্যেক মন্বন্তরের ভিন্ন ভিন্ন মনু। যথা—স্বারোচিষ, বৈবস্বত, সাবর্ণিক ইত্যাদি।

নিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য মরীচি কহিলেন—'আমি অতিথি।' ধর্ম্মব্রতা তখনও ধ্যানে ডুবিয়া আছেন। 'অতিথি' একথাটী তাঁহার কাণে যাইতেই তাঁহার দুটি চক্ষু প্রভাত পদ্মের পাপড়ির মত খুলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে সূর্য্যের তেজের মত দীপ্তি গায়ে মাখিয়া একজন খুব তেজস্বী পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন। সেই নির্জ্জন বনভূমিতে অতিথি উপস্থিত দেখিয়া, ধর্ম্মব্রতা তাঁহার পা ধুইবার জল আনিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে যথারীতি আদর যত্ন করিয়া বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দিলেন।

ধর্ম্মব্রতার অভ্যার্থনায় মরীচি খুব খুসি হইলেন। তিনি হাসি হাসি মুখে ধর্ম্মব্রতাকে বলিলেন,—'সুন্দরি শোন, আমি মহর্ষি মরীচি। তোমার একাগ্রতা ও তপোনিষ্ঠা দর্শনে আমি অবাক্ হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনোরথ সিদ্ধ হউক। ভদ্রে, আমি তোমাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তুমি তার উত্তর দিবে কি?' এই কথা

শুনিয়া ধর্ম্মব্রতা বলিয়া উঠিলেন,—'আচ্ছা, আপনার যাহা বলিবার আছে বলুন। আমি উত্তর প্রদান করিব।'

তখন মহর্ষি কহিলেন,—'ভদ্রে, আমি স্বর্গে থাকি। পিতার ইচ্ছা আমি গৃহস্থ হই ও পুত্র পৌত্রাদি লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করি। সেই জন্য আমি স্বর্গ হইতে নামিয়া এখানে আসিয়াছি। তুমি অতি ধর্ম্মশীলা, তোমাকে পত্নীরূপে পাইলে আমার মনোরথ সিদ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে তোমার অভিমত জানিতে চাই।'

ঋষির মুখে বিবাহের কথা শুনিয়া ধর্ম্মব্রতা লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। তিনি তাহাই চান, কিন্তু পিতার অনুমতি ভিন্ন তিনি সহসা কেমনে অপরিচিত পুরুষকে আত্মদান করিবেন! নানা দিক ভাবিয়া তিনি বলিলেন,—'এবিষয়ে আমার পিতা ধর্ম্মের অনুমতি গ্রহণ করুন।'

*  *  *  *  *

*  *  *  *  *

*  *  *  *  *
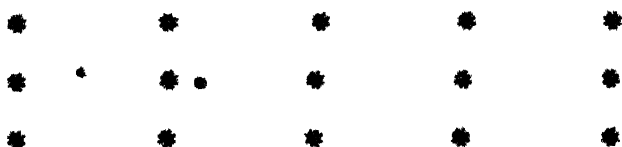
মরীচি ধর্ম্মের নিকটে গেলেন। ধর্ম্ম সম্মুখে অতি তেজস্বী ঋষি ঠাকুরকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সাগ্রহে মরীচিকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসিবার জন্য মৃগচর্ম্ম পাতিয়া দিলেন। পরস্পরে কুশল প্রশ্নাদির পর ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ঠাকুর, আমার প্রতি কি আদেশ করিতে আপনার শুভাগমন হইয়াছে? আপনার চরণধূলি স্পর্শ করিয়া আমার এ ক্ষুদ্র কুটীর পবিত্র হ'ল।'

ঋষি বলিলেন,—'শোনো, আমি মহর্ষি মরীচি। তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি দীর্ঘজীবী হও। তোমাকে একটি কথা বলিব। পিতা আমাকে বিবাহ করিতে আদেশ করিয়াছেন। তাই কন্যা প্রার্থনা করিবার জন্য তোমার নিকটে আসিয়াছি। তোমাকে অতি ধার্ম্মিক বলিয়া জানি। তোমার কন্যা ধর্ম্মব্রতার তপঃ প্রভাব আমি নিজ চক্ষে দেখিয়াছি। আমি উহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি। আমাকে কন্যা দান করিলে তোমার গৃহ মঙ্গল ও শান্তিতে ভরিয়া উঠিবে।'

সেই সময়ে প্রভাত সূর্য্যের সোণালী কিরণ প্রফুল্ল চাঁপা ফুলের বাগানের ভিতর দিয়া মাটিতে পড়িয়া হীরার মত ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। হঠাৎ এক জায়গায় ঘন মল্লিকা ফুলের ঝোপের আড়ালে মরীচি দেখিলেন, উষার আলো গায়ে মাখিয়া ধর্ম্মব্রতা নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহর্ষি ভাবিলেন,—আজ কি আনন্দ, আজ কি আনন্দ !

* * * *

* * * *

ধর্ম্ম ঋষির কথা শুনিয়া পরম পুলকিত হইলেন। তাঁহার নিকট ঋষির এই অপূর্ব্ব সরলতা বড় মনোরম ও পবিত্র বলিয়া বোধ হইল। তিনি মহর্ষিকে ধর্ম্মব্রতার মহাদেবের ন্যায় উপযুক্ত বর মনে করিয়া বিবাহে সম্মতি দিলেন।

তারপর একদিন শুভদিনে মরীচির সহিত ধর্ম্ম-ব্রতার বিবাহ হইল। ধর্ম্মব্রতা ও মরীচি উভয়েই এই নূতন বন্ধনে পরম সুখী হইলেন, যেন দুইটি

মল্লিকা ফুল একত্র গ্রথিত হইয়া সুবাসে তপোবনকে মঙ্গলমণ্ডিত করিয়া তুলিল। এই রকম সুখে স্বচ্ছন্দে অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। কালক্রমে ধর্ম্মব্রতার গর্ভে ঋষির একশত ছেলে হইল।

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

---

# অভিশাপ।

ধর্ম্মব্রতা এখন মরীচির গৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি প্রভাতে স্বামীর সন্ধ্যাবন্দনাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রন্ধনগৃহে প্রবেশ করেন। তাঁহার রন্ধনের সুখ্যাতি আশ্রমের চতুর্দ্দিকে প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় ছিল। মরীচি তাঁহার অমৃততুল্য রান্না খাইয়া তাঁহাকে হৃষ্টমনে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকেন। এই-ভাবে ক[illegible] বৎসর কাটিয়া গেল।

একদিন মুনিঠাকুর ফলপুষ্পের জন্য বনে গিয়াছেন। বনে কত গাছ, অপূর্ব্ব বনফুল ও ফল গাছের মাথায় স্তবকে স্তবকে শোভা পাইতেছে। নির্ম্মলসলিলা নির্ঝরিণী পাহাড়ের গা দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কল্ কল্ ধ্বনি করিতে করিতে নীচের দিকে

ছুটিয়া চলিয়াছে। এই স্থান হইতে প্রচুর ফল-পুষ্প লইয়া দ্বিপ্রহরে শ্রান্তদেহে তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

পতিব্রতা ধর্ম্মব্রতা অপরাহ্ণে নিদ্রিত স্বামীর চরণে ঘৃত মাখিয়া হাত বুলাইতেছেন। সহসা এমন সময় চারিদিক আলো করিয়া সেখানে প্রজাপতি ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মার অপূর্ব্ব তেজে সেই স্থানটা রক্তোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ধর্ম্মব্রতা মুখ তুলিলেন, দেখিলেন সেই দিগন্তবিস্তৃত আলোর মধ্যে হংসারোহণে তাঁহার শ্বশুর স্বয়ং ব্রহ্মা। তাঁহার সেই রক্তোজ্জ্বল সৌন্দর্য্যের প্রখর তেজে ধর্ম্মব্রতার মস্তক নত হইল,—তাঁহার মন তখন নানা চিন্তায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, আজ আমাদের গৃহে স্বয়ং ব্রহ্মার আগমন হইয়াছে, এখন পতিচরণ সেবা করা উচিত, কি ব্রহ্মাকে যথাযথ পাদ্যঅর্ঘ্য দানে পূজা করা কর্ত্তব্য।

অবশেষে তিনি ব্রহ্মাকে পতি হইতেও পূজনীয় বিবেচনা করিয়া শয্যাপ্রান্ত হইতে উঠিলেন ও পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা শ্বশুরের পূজা করিলেন। ব্রহ্মা পুত্র-বধূর সেবায় অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। কিন্তু শ্বশুরের প্রীতিলাভের ফল বড়ই ভয়ঙ্কর হইল। ধর্ম্মব্রতা জানিতেন না শ্বশুরকে সেবা করিতে গেলে তাঁহাকে পতির কোপানলে পুড়িয়া মরিতে হইবে।

* * * *
* * * *
* * * *

কিছুক্ষণ পরে মরীচি নিদ্রা হইতে উঠিলেন, চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন ধর্ম্মব্রতা সেখানে নাই, পতির মনে সন্দেহ হইল। তিনি মিথ্যা সন্দেহে অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিলেন। পত্নী স্বামীর অনুমতি না লইয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন, মুনি ইহার কারণ জানিতেন না। তথাপি ঠাকুরের কি ক্রোধ! ক্রোধে তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত ও রক্তবর্ণ হইল। তিনি কোপস্ফুরিত অধরে ধর্ম্মব্রতাকে অভিশাপ দিয়া

বলিলেন,—'ধর্ম্মব্রতা, তোমার অত্যন্ত অহঙ্কার হইয়াছে, আমার অনুমতি ভিন্ন তুমি স্থানান্তরে গমন করিয়া মহাপাপ করিয়াছ। আমি তোমাকে শাপ দিতেছি তুমি সেই শাপে শিলা হও।'

তোমরা রামায়ণে পাষাণী অহল্যার বিবরণ পড়িয়াছ; এই ঘটনাটিও অনেকটা সেইরূপ। মুনির অভিশাপ-বহ্নিতে আশ্রমের রম্য প্রকৃতি যেন দগ্ধ হইতে লাগিল, অভিশাপের কি ভীষণ তেজ! আশ্রমের হরিণ, হংস প্রভৃতি জীবজন্তু এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। অভিশাপের উগ্রতেজ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সকলের চক্ষু ধাঁধিয়া দিতেছিল। পার্শ্বস্থিত স্রোতস্বতীর কলকল ধ্বনির সহিত ভৈরবী প্রকৃতির উষ্ণ শ্বাসের সংমিশ্রণ হওয়ায় তখন সেখানে যেন কেমন একটা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল।

ধর্ম্মব্রতা বড় মুস্কিলে পড়িলেন। স্বামীর এই ক্রোধ দেখিয়া তাঁহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। পতির এই আকস্মিক আচরণে সতী অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি পতির এই সন্দেহ

অমূলক প্রতিপন্ন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তিনিও স্বামীকে প্রত্যভিশাপ দিয়া সরোষে বলিলেন,—

'হে মুনিবর, তুমি যখন নিদ্রিত ছিলে, তখন তোমার গৃহে তোমার পিতা ব্রহ্মার আগমন হয়। তাঁহাকে অর্চ্চনা করা তোমারই কর্ত্তব্য ছিল। গুরুজনকে যথাবিধি পূজা না করা মহাপাপ। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী বলিয়াই ব্রহ্মার উপাসনার জন্য স্থানান্তরে গিয়াছিলাম। ইহাতে আমার কোন অপরাধ হয় নাই। কিন্তু আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই তুমি আমাকে অকারণে অভিশাপ দিলে, আমিও সেজন্য তোমাকে শাপ দিতেছি যে, তুমিও মহেশ্বর হইতে শাপ[illegible] হইবে।'

ঘটনাবৈচিত্র্যে অসম্ভব সম্ভব হইল, স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে অভিশাপ দিলেন। উভয়ের মাঝখানে তখন কেমন একটা ব্যবধান আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ চিন্তার পর মরীচি বুঝিতে পারিলেন কাজটা ভাল হয় নাই। মুনিঠাকুরদের

ক্রোধ হয়ও যেমন শীঘ্র, যায়ও তেমনি শীঘ্র। তখন তাঁহার উদার হৃদয় দুঃখে ও অনুতাপে তুষানলের ন্যায় পুড়িতে লাগিল। সতী স্বামীকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া ব্রহ্মার চরণে পতিত হইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা তখন নিদ্রিত ছিলেন, তিনি জাগিলেন না। ধর্ম্মব্রতা ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর কথা মনে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিনা দোষে মুহূর্ত্তমধ্যে এমন সুন্দর সংসারে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, এই মনে হইয়া তাঁহার চক্ষে অবিরল জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে দুঃখ-বেগ একটু থামিলে ধর্ম্ম-ব্রতার মনে হইল শুধু কাঁদিয়া কি ফল? অভি-শাপের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সাধনা চাই। কঠোর সাধনা ভিন্ন, তপস্যা ভিন্ন, সংসারের কোন অমঙ্গলই দূর হইবার নয়। এইরূপ নানা কথা ভাবিয়া ধর্ম্মব্রতা চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড করিয়া মধ্যস্থলে বসিয়া শাপ মোচনের জন্য দুষ্কর

তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। পত্নীশাপগ্রস্ত মরীচিও কঠোর ধ্যানে ডুবিয়া রহিলেন।

কত বৎসর চলিয়া গেল। পতি-পত্নীর ধ্যান আর ভাঙ্গে না। তাঁহাদের তপস্যা দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের বড় ভয় হইল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া বিষ্ণুর নিকট গিয়া মরীচি ও ধর্ম্মব্রতার কঠোর তপস্যার কথা বলিলেন। তখন বিষ্ণু ক্ষীর সমুদ্রে সাপের বিছানায় বেশ আরামে শুইয়াছিলেন। ক্ষীর সাগরের জল ক্ষীরের মত মধুর, নির্ম্মল ও শুভ্র। দেবতারা অনেক স্তব স্তুতি করিয়া প্রার্থনা করিলেন, 'হে পরমেশ্বর, আমরা সকলে তোমার শরণ লইলাম, পতিব্রতার তপোবল হইতে ত্রিভুবন রক্ষা করুন।'

ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, 'হে দেবগণ, তোমাদের ভয় নাই, চল আমি তোমাদের অনুগমন করি।' এই বলিয়া বিষ্ণু দেবতাদিগের সহিত আশ্রমে ধর্ম্মব্রতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,— 'মা, আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর।' ধর্ম্মব্রতা দেখিলেন সমস্ত দিক শুভ্র

জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল করিয়া স্বয়ং বিষ্ণু দেবগণের সহিত তাঁহার নয়ন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বিষ্ণুর প্রসন্নমূর্ত্তি ধর্ম্মব্রতার প্রাণে শান্তি বর্ষণ করিল। বিষ্ণুর কথা শুনিয়া ধর্ম্মব্রতা কহিলেন,—'দেব আমি স্বীয় তেজে পতির অভিশাপ ব্যর্থ করিতে অসমর্থ, আপনারা আমার এই অভিশাপ দূর করুন।'

ধর্ম্মব্রতার কথা শুনিয়া বিষ্ণু কহিলেন, 'পুণ্য-শীলে, পরম ঋষি এই শাপ দিয়াছেন, ইহা একেবারে ব্যর্থ হইবার নহে; অতএব হে শুভব্রতে, তুমি ইচ্ছা-মত অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।'

শাপগ্রস্তা পতিব্রতা আর কি বর চাহিবেন, তিনি তখন বিষ্ণুকে কহিলেন, 'যদি নিতান্তই পতির অভি-শাপ হইতে আমাকে রক্ষা করিতে আপনারা অসমর্থ, তবে আমাকে এই বর দিন, আমি যে শিলা হইব, তাহা যেন সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও শুভ হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পদচিহ্ন যেন ঐ শিলাতে অঙ্কিত থাকে। যে কেহ এই পবিত্র শিলায় পিণ্ডদান করিবে সে-ই যেন পিতৃগণ সহিত ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হয়।'

ধর্ম্মব্রতা এইভাবে বিষ্ণুর নিকট অনেক বর প্রার্থনা করিলেন। দেবগণের সহিত বিষ্ণু কহিলেন,—'তোমার সকল প্রার্থনাই পূর্ণ হইবে। গয়াসুরকে নিশ্চল করিবার জন্য শিলারূপিণী তুমি যখন তাহার মস্তকে স্থাপিত হইবে, তখন পদচিহ্নাদিরূপে আমি তোমার উপর স্থিরভাবে অধিষ্ঠান করিব।'

বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে ফুলের মত সুন্দর ধর্ম্মব্রতার কোমল শরীর শিলায় পরিণত হইল!

---

# শিলামাহাত্ম্য।

এখন তোমাদিগকে শিলা সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলিব। এই শিলা যেমন তেমন পাথর নয়, ইহাই গয়ার শ্রী ও সৌন্দর্য্য এবং ভক্তের চক্ষে সাধনার বস্তু।

দেবময়ী এই শিলা স্পর্শ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক বৈকুণ্ঠে যাইতে লাগিল। যমপুরী প্রায় শূন্য। তখন যম আর কি করিবেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—'ঠাকুর, এই শিলার অদ্ভুত প্রভাবে আমার পুরী জনশূন্য—পাপী-তাপী সকলেই মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গে যাইতেছে, এখন আমার উপায় কি বলুন? আপনি এই যমদণ্ড ফিরাইয়া লউন। আমার আর ইহাতে কি প্রয়োজন।' বলিয়া তিনি ব্রহ্মাকে দণ্ডখানি ফিরাইয়া দিতে গেলেন। ব্রহ্মা ভাবিয়া দেখিলেন কথাটা

ঠিক। যমের ত কোনই দোষ নাই। তিনি যমকে কহিলেন,—'বাপু, তুমি এক কাজ কর। তুমি শিলাখানি নিজগৃহে লইয়া যাও।' ধর্ম্মরাজ তাহাই করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মার বুদ্ধির কৌশলে যমালয় আবার পাপীর কল-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। মুক্তি-শিলার চারিদিকে যমদূতেরা ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং বজ্রগম্ভীর স্বরে পাপীকে ঐদিকে আসিতে নিষেধ করিতে লাগিল।

প্রজাপতি ব্রহ্মা গয়াসুরের মস্তক ও পবিত্র শিলা দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন; সেই যজ্ঞে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ উপস্থিত হইলে শিলা বলিল,—'ঠাকুর, আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন আত্মার মুক্তির জন্য আমার এই দেহরূপ শিলায় আপনি অন্যান্য দেবতাদের সহিত অবস্থান করিবেন। দেব, আপনার সেই বাক্য এখন পালন করুন।'

'তাহাই হউক' বলিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ তথায় রহিলেন।

এই শিলার কোথায় কোন্ পুণ্যস্থান আছে

তাহাই বলিতেছি, শুন। শিলার পাদদেশ প্রভাস গিরি দ্বারা ঢাকা ; এই গিরি ভেদ করিয়া যেখানে শিলার অঙ্গুষ্ঠ দেখা যায়, সেই ক্ষেত্রের দেবতা প্রভাসেশ্বর নামে কথিত হন। শিলাঙ্গুষ্ঠের এক দেশের নাম প্রেতশিলা। এই স্থানে পিণ্ডদান ও তর্পণ করিলে পরলোকগত আত্মার প্রেতত্ব দূর হয়। এই প্রেতত্ব ব্যাপারটা তোমরা সহজে বুঝিবে না। লোকের মৃত্যুর পর কিছুকাল জীবাত্মা এই সংসারের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। সেই আশ্রয়শূন্য আত্মার মুক্তির জন্য গয়ায় প্রেত-শিলায় পিণ্ডদান করিতে হয়। হিন্দুর বিশ্বাস এই পিণ্ডদান হইতেই আত্মার মুক্তি, অর্থাৎ সেই আত্মা আর ভবঘুরের মত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় না।

প্রভাস গিরি হইতে একটি নদী বাহির হইয়াছে। এই নদীর সংযোগস্থলে সেই প্রাচীনকালে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর সহিত স্নান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে রামতীর্থ বলা হয়। এই তীর্থে স্নান ও তর্পণ করিলে প্রেতাত্মার মুক্তি হয়। রামচন্দ্র বন গমন

করিলে পর ভরত এই স্থানে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও বিভিন্ন ঋষিগণের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্থানকে ভরতাশ্রম বলে। এখানে শ্রাদ্ধ, জপ, হোম ও তপস্যা করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়।

নগ পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই শিলার কটিদেশ বিস্তৃত। গয়াসুরকে নিশ্চল রাখিবার জন্য ধর্ম্মরাজ এই স্থানে আছেন। শিলার দক্ষিণ হস্ত ও পদে কুণ্ড পর্ব্বত ও বামপদে অভ্যুত্থস্তক পর্ব্বত আছে; এই সব স্থানে শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃগণের ব্রহ্মলোক লাভ হয়।

উদ্যন্তক পর্ব্বত ধর্ম্মশিলার বাম হস্তে আছে। অগস্ত্য ঋষি এই পর্ব্বত উদয় গিরি হইতে আনিয়া এখানে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার এমনি তপোবল যে[illegible] এক গণ্ডূষে সাগরের জল পান করিয়াছিলেন। একি সহজ কথা! এই পর্ব্বতে ব্রহ্মা ও শিব বহুকাল কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মরাজ এই ধর্ম্মশিলার দক্ষিণ হস্ত ভস্মকূট পর্ব্বতে স্থাপন করেন। এই পুণ্যস্থানে অগস্ত্যমুনি পত্নী লোপামুদ্রার সহিত বাস করিতেন।

সীতাদ্রির দক্ষিণ দিকের পর্ব্বতে দন্তী রাজা কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহার সম্মুখে রুক্মিণী কুণ্ড ও পশ্চিমে কপিলা নদী। অমাবস্যা-যুক্ত সোমবারে এই নদী তীরে কপিলেশ মহাদেবকে পূজা করিয়া শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ও পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণের মুক্তি লাভ হয়।

ধর্ম্মরাজ পাপীর জন্য ধর্ম্মশিলার বাম পদে প্রেতগিরি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অত পাপের বোঝা সহিতে না পারিয়া ধর্ম্মশিলা উহা দূরে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, ধর্ম্মশিলার সংস্পার্শ জন্য প্রেতশিলাও পবিত্র হইয়াছে। এইখানে পিণ্ডাদি দান করিলে পিতৃগণের প্রেতত্ব দূর হয়।

এই ভাবে স্থান ভেদে শিলা-মাহাত্ম্য কথা আজিও পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন। সেই প্রাচীন যুগে সময় সময় বড় বড় সাধু সন্ন্যাসীরা এই ধর্ম্মশিলার যে যে স্থানে বাস করিতেন সেই স্থানগুলি পুণ্যতীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

ভস্মকূট পর্ব্বতে জনার্দ্দন আছেন। তাঁহার হস্তে দধি মিশ্রিত পিণ্ডদান করিতে হয়। এই মন্ত্রে পিণ্ডদান করা বিধি :—

'হে প্রভো, আমি যাহার জন্য এই পিণ্ডদান করিতেছি, তাহার মৃত্যুর পর তুমিই এই পিণ্ডদান করিও। ঠাকুর, আমার নিজের মুক্তির জন্য তোমার হস্তে এই পিণ্ড দিতেছি, দয়া করিয়া আমার মৃত্যুর পর তুমি গয়াসুরের মস্তকে এই পিণ্ডদান করিও।'

পিণ্ডদানের পর জনার্দ্দন ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া বলিবে,—

জনার্দ্দন তোমা দেব করি নমস্কার,
পিতৃ-মুক্তি-দাতা তুমি মুক্তির আধার ;
গয়াক্ষেত্রে পিতৃরূপে স্থিতি হে তোমার
জনার্দ্দন তোমা দেব করি নমস্কার।

আত্মার মুক্তির তরে
থাক গয়া শিরোপরে,
পিণ্ড দেয় তব পায়
মুক্তি শান্তি কামনায়,
দেব-দৈত্য-নর পূজা করি নমস্কার॥

# আদি গদাধর।

অতি পূর্ব্বকালে গদ নামে এক প্রচণ্ড অসুর ছিল। তাহার শরীর বজ্র হইতেও দৃঢ় ছিল। শরীরের ভিতর হাড়গুলি কি শক্ত! দধীচি মুনির হাড় হইতেও যেন শক্ত। ব্রহ্মার এই হাড়ের প্রয়োজন ছিল। দেবতা ভিন্ন অপরের শ্রীবৃদ্ধি ও মঙ্গল দেখিলেই পৌরাণিক দেবতাদের প্রাণে কেমন একটা আশঙ্কা. কেমন একটা ভয়ের ভাব জাগিয়া উঠিত। গদাসুরের হাড়খানি না হইলেই যেন ব্রহ্মার চলে না। তাই একদিন তিনি গদাসুরের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—'বাপু, তোমার কি বিরাট্ শরীর, তোমার ঐ শরীরের একখানি হাড় খসাইয়া আমাকে দিতে হইবে। উহাতে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তুমি কিছু মনে করো না, ইহাতে তোমার ভাল বই মন্দ হবে না।'

অসুর ব্রহ্মার মনের আসল কথাটা বুঝিতে না পারিয়া সরল প্রাণে বলিল,—

'আচ্ছা, ঠাকুর, তাহাই করিতেছি। আমার এই সামান্য হাড় যদি আপনার কোনও কাজে লাগে তাহা হইলে আমার মঙ্গলই বলিতে হইবে।' বলিয়া সে শরীর হইতে সকলের বড় হাড় খানা ব্রহ্মাকে খুলিয়া দিল।

হাড়খানি লইয়া ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মার নিকটে গেলেন। বিশ্বকর্ম্মা দেবশিল্পী; শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ পটু। পুরীতে জগন্নাথের মন্দির ও জগন্নাথের মূর্ত্তি ইনি গড়িয়াছিলেন। যেখানে কোন শক্ত কাজ হইত সেখানে বিশ্বকর্ম্মার ডাক পড়িত। সৃষ্টির সময় হইতে নিখুঁত সূক্ষ্ম শিল্পের সহিত ইঁহার নাম জড়িত। বিশ্বকর্ম্মা ছাড়া দেবতা-দের বিচিত্র সুন্দর সূক্ষ্ম কোন কাজই সম্পন্ন হইত না। আজকাল আমাদের দেশের সূত্রধার বা ছুতারেরা বৎসরে একবার বিশ্বকর্ম্মার পূজা করিয়া থাকে। সমাজের লোকের এই নীরব ঔদাসীন্য বিশ্বকর্ম্মা

অথবা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নয়, ইহা ভারতবর্ষীয় শিল্প কলার প্রতি জন সাধারণের অনাদরের ভাবই প্রকাশ করে।

বিশ্বকর্ম্মাকে উপদেশ দিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, 'এই হাড় হইতে আমার জন্য একটি নূতন শস্ত্র তৈরি কর। উহা আমার কাজে লাগিবে।'

হাড়খানি হাতে লইয়া বিশ্বকর্ম্মা এদিক ওদিক নাড়িয়া চাড়িয়া একটু হাসিলেন। ব্রহ্মার হুকুম তাই তিনি তাড়াতাড়ি উহা কুন্দ যন্ত্রে ফেলিয়া ঘসিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে উহা গদা বা মুদ্গরের আকার ধারণ করিল। মুক্তার মত শাদা ধব্‌ধবে, দেখিতে বড়ই সুন্দর। এই নূতন শস্ত্রই গদা, পূর্ব্বে গদা আর কেহ কখনও দেখে নাই। ব্রহ্মা উহা দেখিয়া বড় খুসি হইলেন। তিনি শস্ত্রটি স্বর্গের মাঝ খানে রাখিয়া দিলেন। তখন তাঁহার মনে কি ছিল কে জানিত! এক দিন এই সামান্য শস্ত্রটি কাজে লাগিয়াছিল। সেই কথাই এখানে তোমা-দিগকে বলিতেছি।

গদানির্ম্মাণের পর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। স্বায়ম্ভব মন্বন্তরে * হেতি নামে এক বিকটাকার রাক্ষস ছিল। একদিন বনের ভিতর গিয়া সে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। সে কি তপস্যা! শীতকালে কন্‌কনে ঠাণ্ডা বায়ু তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিত, তাহাতে হেতির ভ্রূক্ষেপ নাই। গ্রীষ্ম-কালে সূর্য্যের সুতীব্র দাহনে, আর বর্ষাকালে মুষলধারে বৃষ্টিপাতে তাহার সেই বিরাট্ দেহ একটুও চঞ্চল হইত না। হেতি এইভাবে উপেক্ষার সহিত জড়জগতের সমস্ত ক্রিয়াকে ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিল। একলক্ষ বৎসর সে কেবল মাত্র বায়ু ভোজন করিয়াছিল। ইহাতেও সে ব্রহ্মাদি দেবগণের দেখা না পাইয়া একপায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগের উপর ভর দিয়া ঊর্দ্ধমুখে দুই বাহু আকাশের দিকে তুলিয়া ব্রহ্মাকে ডাকিতে থাকে। তখন সে কিছুই খাইত না। একি কম সহিষ্ণুতার কথা! দুষ্প্রাপ্য কিছু লাভ করিতে হইলে মানুষকে

---

* সময়ের বিভাগ।

কষ্ট করিতে হয়। কঠোর সাধনা ভিন্ন হরি অথবা ইন্দ্রত্বলাভ অসম্ভব। মানুষ হরিকে চায়, অসুর স্বর্গের রাজা হইতে চায়, এই চেষ্টা বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। উদ্দেশ্য বিভিন্ন হইলেও একমনে সাধনা ও আত্মত্যাগ ভিন্ন কাহারও অভীষ্ট লাভ হইতে পারে না। অসম্ভবকে সম্ভব করিতে হইলেই তপস্যা চাই।

হেতি যখন যোগমুক্তদৃষ্টিতে একবার চারিদিকে লক্ষ্য করিল, তখন সে দেখিতে পাইল, ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই বনভূমি আলোকিত করিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

হেতি সেই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া আনন্দিত হইল, দেবতাদের সৌন্দর্য্যের প্রখর তেজে তাহার মস্তক নত হইল,—সে ব্রহ্মাকে বলিল, 'ঠাকুর, অনেক কাল আপনাকে ডাকিতেছি। এতদিনে বুঝি আমার ভাগ্য প্রসন্ন হইল।'

উত্তরে ব্রহ্মাদি দেবগণ হেতিকে অভয় দিয়া কহিলেন,—

'বৎস, তোমার সাধনায় আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।'

ব্রহ্মার আশ্বাসে খুসি হইয়া হেতি বলিল,—'ঠাকুর, আমাকে এই বর দিন্ আমি যেন শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, ইন্দ্রের বজ্র এবং মানুষ, দেবতা ও অসুরদের বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা অবধ্য ও মহাশক্তিশালী হই।'

'তাহাই হউক' বলিয়া দেবতারা স্বপ্নের মত অস্পষ্ট হইয়া আকাশে মিশিয়া গেলেন।

* * * *

* * * *

'আমি দেবাসুরের অস্ত্রে মরিব না' এই অহঙ্কারে হেতি ফুলিয়া উঠিল। দানবে রজোগুণের প্রাধান্য, এই জন্য তাহারা ক্রোধী ও অহঙ্কারী এবং লোভও তাহাদের চরিত্রগত।

অহঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পাপ কল্পনাও হেতির মনে আসিল। তখন সে মনে ভাবিল 'এখন সহজেই

দেবতাদিগকে স্বর্গ হইতে দূর করিয়া দিয়া আমি স্বর্গের রাজা হইতে পারিব।' হেতি এই কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইল। তাহার সহিত দেবতাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুকাল যুদ্ধের পর দেবতারা হারিয়া গেলেন। দেবতাদের পরাজয় ও হেতির ইন্দ্রত্বলাভ এক সঙ্গেই ঘটিল।

যুদ্ধে হারিয়া দেবতাদের দুর্গতির পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মা সকল ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন, 'তাই ত, এযে বড় শক্ত কথা। আমি ত হেতিকে বধ করিতে অসমর্থ। চল সকলে মিলিয়া বিষ্ণুর কাছে যাই। তিনিই ইহার উপায় বিধান করিবেন।'

তাঁহারা বিষ্ণুর কাছে গেলেন এবং হেতির কথা শেষ করিয়া বলিলেন,—'ভগবান্, হেতি আমাদের পরম শত্রু। তাহাকে বধ না করিলে আমরা স্বর্গে ফিরিয়া যাইতে পারি না।'

বিষ্ণু কহিলেন,—'দেবগণ, হেতিকে বধ করা

সহজ নয়। আচ্ছা, আমাকে এমন একখানি অস্ত্র দাও যাহা পূর্ব্বে কেহ কখনও ব্যবহার করে নাই।'

প্রসিদ্ধ অস্ত্রে হেতির মৃত্যু অসম্ভব ছিল। তখন ব্রহ্মার ইঙ্গিতে দেবগণ গদা অস্ত্রখানি বিষ্ণুর হাতে দিলেন। এখন তোমরা বুঝিলে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মা কেন গদাসুরের হাড় হইতে গদা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ঠাকুর গদা গ্রহণ করিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল গদাধর।

বিষ্ণু গদা দ্বারা হেতি রাক্ষসকে মারিয়া দেবতা-দিগকে স্বর্গ রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন।

যে স্থানে বিষ্ণু গদা ধুইয়াছিলেন সেই স্থানকে 'গদালোল' বলা হয়। এই পুণ্যতীর্থ বিষ্ণুপাদ-মন্দির হইতে দক্ষিণ দিকে এক মাইল দূরে অবস্থিত।

বিষ্ণু গয়াসুরকে নিশ্চল করিবার জন্য আদি গদা হাতে লইয়া ধর্ম্মশিলাতে দৈত্যের মস্তকে দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার আর এক নাম

**আদি গদাধর।**

# ইতিহাসে—গয়া

গয়ার মানচিত্র

# ইতিহাস।

**ভূমিকা।**
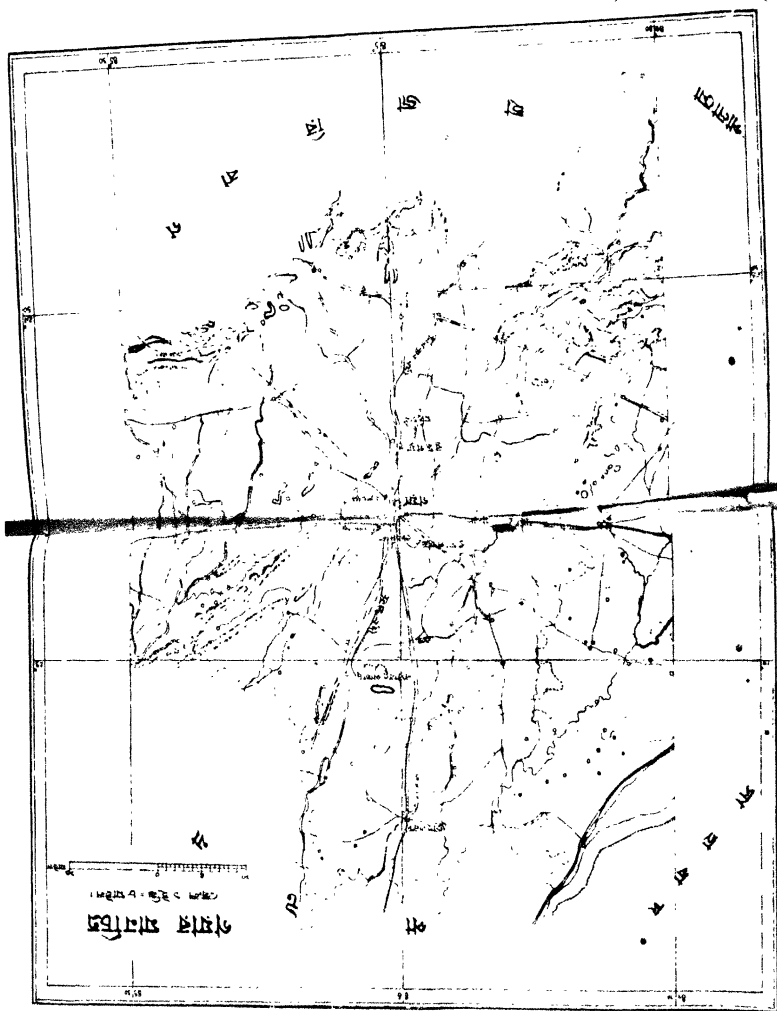
প্রেতপুরী গয়া তীর্থস্থান; ইহা বিষ্ণুপদ-চিহ্ন নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া পিণ্ড ও সূক্ষ্ম দেহের সাহায্যে এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ সঙ্কল্প শক্তির আশ্চর্য্য মহিমায় জীবাত্মাকে নিয়ত মুক্তিধামে লইয়া যাইবার সুবিধা করিয়া দেয়। ইহার প্রতি ধূলিকণাতে আমাদের সনাতন ধর্ম্ম ও আর্য্য সভ্যতার কত পুণ্যগৌরবের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে! এই পুণ্যক্ষেত্রে শাক্যসিংহ অবিচলিত সাধনার পর বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছিলেন এবং জরা-মরণ-সঙ্কুল সংসারে নির্ব্বাণ গাথা গৃহে গৃহে প্রচার করিয়া আর্ত্ত জীবের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। এইখানে বৌদ্ধ ও হিন্দুর কত ভাঙ্গা গড়া, কত জয় পরাজয়, কত ঘাত প্রতিঘাতের সম্মিলন হইয়াছে। এই কারণেই গয়া হিন্দু ও বৌদ্ধের মিলন ক্ষেত্র।

প্রাচীন গয়া ভারতবাসী হিন্দুর নিকট বড় পবিত্র, বড় আদরের। এখানে আত্মার সদ্গতির জন্য হিন্দু শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করেন। ইহার ধর্ম্ম-কাহিনী, ইহার অলৌকিক তত্ত্ব আমাদের পরম গৌরবের বিষয়। জগতের সম্মুখে গয়া, কাশী ও উড়িষ্যা আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। গয়ার প্রাকৃতিক মাধুর্য্য অতুলনীয়, গয়া প্রাচীন শিল্পকলার পীঠস্থান। ভিতরের দিক দিয়া দেখিলে গয়া মৃত ও জীবিতের সাধনক্ষেত্র বলিয়া মনে হইবে। পিতৃপুরুষপূজাই গয়ার মাহাত্ম্য বা বিশেষত্ব। বিষ্ণুপাদ মন্দিরের স্বর্ণ-কিরীট-মণ্ডিত প্রশান্ত সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য সমন্বিত উচ্চস্তম্ভ, সামগান মুখরিত জ্বলন্ত ধর্ম্মভাব, রামশিলা, প্রেতশিলা ও ব্রহ্মযোনির রহস্যময় অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকাহিনী কত যুগ যুগান্তর হইতে হিন্দুর প্রাণকে এক অত্যুজ্জ্বল গৌরবময় পরিচ্ছদে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

* * * *

* * * *

গয়া পাটনা বিভাগের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার উত্তরে পাটনা, পূর্ব্বে মুঙ্গের ও হাজারিবাগ, দক্ষিণে

সীমা।

হাজারিবাগ ও পালামৌ এবং পশ্চিমে সাহাবাদ।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বেহার প্রদেশ ইংরেজের হস্তগত হইলে মহারাজ সীতাব রায় এই জেলার বন্দোবস্তের কার্য্য করেন। পূর্ব্বে এই

নামোৎপত্তি।

জিলার নাম বিহার ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বিহারকে মহকুমায় পরিণত করিয়া পাটনার সহিত সংযুক্ত করা হয়, সেই অবধি এই জেলার নাম গয়া হইয়াছে। গয়ার দক্ষিণাংশ রামগড় বলিয়া কথিত হয়। গয়ায় সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪টী পুণ্যস্থান।

গয়ার নামোৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে লিখিত আছে,—ত্রেতাযুগে গয় নামে এক রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন, তাঁহার নামানুসারেই এই স্থানের নাম গয়া হইয়াছে। বায়ু পুরাণে দেখা যায় গয়াসুরের প্রার্থনানুসারে বিষ্ণু দশ মাইল বিস্তৃত এই ক্ষেত্রের নাম গয়া রাখেন।

এই জেলা দুই ভাগে বিভক্ত। দক্ষিণাংশ পার্ব্বত্য, জঙ্গলাকীর্ণ ও অনুর্ব্বর। এই সকল স্থানে জলসেচনের কোন সুবিধা নাই।

প্রাকৃতিক বিভাগ।

উত্তরাংশ অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর, স্থানে স্থানে ফসল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই প্রদেশে জল সেচনের বিশেষ সুবিধা আছে। অতি প্রাচীন কালে আর্য্যগণ উত্তরাংশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এবং বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া এই স্থান বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। দক্ষিণাংশ আদি কাল হইতেই অসভ্য কোলদের আবাসভূমি। বৌদ্ধধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ কখনও এখানে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান সময়েও এই স্থানের লোক সংখ্যা অতি বিরল।

গয়া পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ব্রহ্মযোনি পাহাড় হইতে গয়ার চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বড়ই মনোরম দেখায়। এই পাহাড়ের উচ্চতা চারিশত ফিট্‌। বর্ষাকালে মেঘশূন্য পরিষ্কার দিনে সবুজ বৃক্ষ সমাকীর্ণ প্রান্তর, মন্দিরবহুল রামশিলা,

দৃশ্য।

প্রেতশিলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ও বালুকাকীর্ণ স্বল্পতোয়া ফল্গুনদী অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করে। আর দূরে অতিদূরে নীলিমাময় যে বরাবর পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায় তাহারই নিকটে নির্জ্জন কোয়াদলের অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য হৃদয় মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

গয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈল গাত্র হইতে জলপ্রপাত নিম্নে স্তূপে স্তূপে বাধা পাইয়া পতিত হইতেছে।

জলপ্রপাত।

তন্মধ্যে মোহানা ও ককোলতের জলপ্রপাতই উল্লেখযোগ্য। এই জিলার ঠিক প্রান্ত সীমার উপরই মোহানা জলপ্রপাত। কালদাগ হইতে সহজে এখানে পৌঁছা যায়। ইহার বিস্তৃত উপরিভাগ তমাসীন নামক স্থানে গভীর উপত্যকার উপর অবস্থিত। ইহা খাড়াভাবে একটা কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়ের উপর হইতে নীচে ঘনছায়াসমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র জলাশয়ে আসিয়া পড়িতেছে এবং অবশেষে অতি দ্রুতবেগে অন্ধকারপূর্ণ ও আশ্চর্য্যরূপে আকুঞ্চিত গিরিপথ ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। হরিয়াখালের

নিকটবর্ত্তী ইহার নিম্নাংশ অধিকতর সুদৃশ্য ও মনোহর। এখানে জলস্রোত চিত্রের ন্যায় সুন্দর একটি অপ্রশস্ত উপত্যকা হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে একটা রক্তবর্ণ পাহাড়ের গা দিয়া নিম্নে চারিদিকে জঙ্গলাকীর্ণ একটি জলাশয়ে পতিত হইতেছে।

নদনদী।

গয়া জিলার নদীর মধ্যে শোন্, ফল্গু ও পুন্‌পুন্‌ই বিখ্যাত। শোন্ নদীর উৎপত্তিস্থান মধ্য ভারতবর্ষ। গয়া জিলার পশ্চিম প্রান্ত দিয়া ইহা প্রবাহিত হইতেছে। এই নদী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ ইহাই মেগাস্‌থিনিস্ বর্ণিত 'হিরেনোবোয়াস্' ( সংস্কৃত হিরণ্যবাহু )। দক্ষিণ হইতে উৎপন্ন হইয়া 'পুন্ পুন্' নদী গয়ার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। গয়াযাত্রী এই নদীর তীরে ক্ষৌরকর্ম্ম এবং ইহার পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া থাকেন।

ফল্গুনদী * হাজারিবাগের পাহাড় হইতে উৎপন্ন

---

* Phalgu is formed a few miles above Gaya by the union of the two immense torrents named the

হইয়া গয়া সহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মোকামার নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী অহল্যাবাই তীর্থযাত্রীর স্নান-তর্পণের সুবিধার জন্য অনেক প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট ইহার তীরে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। বিখ্যাত বিষ্ণুপাদ মন্দির এবং গয়ালীদের বাড়ীঘর ইহারই তীরে অবস্থিত। বালিভরা ফল্গুনদীতে জলের সঙ্গে সম্পর্ক কম। এই নদী সারা বৎসরই শুষ্ক থাকে, পাহাড়ে বৃষ্টি হইলে এক দিনেই জলে ভরিয়া যায়, তখন কূলে কূলে জল। আবার জল চলিয়া গেলে নদীর বালিভরা বুক আত্মপ্রকাশ করে।

ফল্গু গঙ্গাধারার ন্যায় পবিত্র। জনশ্রুতি এই যে, পূর্ব্বে এই নদীর ভিতর দিয়া জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধস্রোত প্রবাহিত হইত। কিন্তু সেই দুগ্ধের

---

Mahane and Nilanjun. From Gaya the Phalgu runs north-easterly with little change for about 17 miles, when opposite to the Barabar Hills, it divides into two branches and the name of Phalgu is entirely lost. Martin.

নদীতে কাল প্রভাবে এখন সময় বিশেষে এক ফোঁটা জল মিলাও সুকঠিন! কথিত আছে ইহার তীরে সীতাদেবী বালির পিণ্ড গড়িয়া শ্বশুরের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি স্বর্গে পৌঁছিবার আশায় রাজা দশরথ পুত্রবধূকে পিণ্ডদানে আদেশ করিয়াছিলেন। ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য ফল্গু, একটি ব্রাহ্মণ, তুলসী ও বট বৃক্ষকে সাক্ষী মানা হয়। এত গুলি সাক্ষীর মধ্যে একমাত্র বট বৃক্ষই সত্য কথা বলিয়াছিল। সীতাদেবী বট বৃক্ষের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে "অক্ষয় হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন; সেই অবধি এই বট বৃক্ষের নাম 'অক্ষয়বট' হইয়াছে। অপর পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় ফল্গু অভিশপ্ত হয় এবং শাস্তিস্বরূপ সেই হইতে বেচারা বালুর নীচে মনের দুঃখে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছে!

ফল্গুর উৎপত্তির গল্পটা এই রকমের,—সেই সত্যযুগে ব্রহ্মার প্রার্থনায় স্বয়ং হরি ফল্গুরূপে মর্ত্তে

নামিয়া আসেন। 'ফলতি গৌঃ' হইতে ফল্গু শব্দের উৎপত্তি। ফল্গু তীর্থ কামধেনু বা পৃথিবীর ন্যায় কত দ্রব্য জলরূপে প্রসব করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর চরণোদক হইতে গঙ্গা এবং আদিগদাধর স্বয়ং দ্রব হইয়া ফল্গু রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ফল্গুতে স্নান করিলে মহাপুণ্য হয়। নাগকূট হইতে গৃধ্রকূট, আর ব্রহ্মযোনি হইতে উত্তর মানস পর্য্যন্ত স্থানের নাম গয়াশির; ইহাকেই ফল্গু তীর্থ কহে।

গয়ায় কষ্টিপাথরের সুন্দর সুন্দর জিনিষ পাওয়া যায়। এই প্রস্তরশিল্পীদিগকে 'সংতুরাস' বলে। জয়নগর প্রভৃতি স্থানের শিল্পীগণ উৎকৃষ্ট পাথরের জিনিষ প্রস্তুত করে। ইহারা পাথরের উপরিভাগ এরূপ মসৃণ করে যে স্পর্শ করিলে উচ্চনীচ বোধ হয় না। যাত্রিগণ অতি আদরের সহিত এই পাথরের জিনিষ ক্রয় করেন।

প্রস্তর শিল্প।

সাময়িক জলপ্লাবনে মধ্যে মধ্যে গয়ার অনিষ্ট

সাধন করিয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হইলেই নদীর জল অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে তট-ভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলে। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে স্যর্ উইলিয়ম হণ্টার লিখিয়াছিলেন 'প্রায় ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে একদিন স্থায়ী জলপ্লাবন হইয়া-ছিল। ৯।১০ ঘণ্টার মধ্যেই জল নামিয়া গিয়াছিল।' ১৮৯৬ খৃঃ অব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর গয়ার পূর্ব্বাংশে নওদা মহকুমা বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। দুই দিন ক্রমাগত মূষলধারে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির জলে খাল, ক্ষুদ্র জলাশয়, নদী সবই ডুবিয়া যায়। দিবা দ্বিপ্রহরে শকরি নদীতে বাণ আসিয়া বহু লোকের বাড়ীঘর শস্যাদি, গো-মেষ, বড় বড় গাছ ভাসিয়া গিয়াছিল। এই প্লাবনে লোক নাশ খুবই কম হয়, মাত্র ৪২ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একই সময়ে শোন্ ও গঙ্গার জল উচ্ছ্বসিত হইয়া ১৯০১ খৃঃ অব্দে জলপ্লাবনের সূচনা করিয়াছিল। এই প্লাবনে গয়া জিলার বিশেষ কোনই

প্রাকৃতিক বিপ্লব—জলপ্লাবন।

ক্ষতি হয় নাই। ১৪ই ১৫ই ও ১৬ই সেপ্টেম্বর মূষলধারে বৃষ্টি পাতের ফলে ১৯০৫ খৃঃ অব্দের বন্যাস্রোতে আরঙ্গাবাদ ও জাহানাবাদ পরগণা ভাসিয়া গিয়াছিল।

জলবায়ু।

গয়ার জলবায়ু শুষ্ক ও সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল। গ্রীষ্মকালে এই স্থানের বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা গরম। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন তাপ ১১৬·২ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। শীত ঋতুতে গয়ার জলবায়ু উৎকৃষ্ট। বৎসরে গড়ে ৪২·৯৪ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়।

প্লেগ।

১৯০০ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে গয়া সহরে প্রথম প্লেগ দেখা দেয়। ১৯০১ খৃঃ অব্দের মে মাস পর্য্যন্ত প্লেগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯০০ খৃঃ অব্দের মৃত্যু সংখ্যা ১১৯৩ জন এবং ১৯০১ খৃঃ অব্দে ১০৭৯০ জন। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে প্লেগের প্রকোপ অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গয়াবাসীরা প্লেগের বীজ গ্রহণ করিতে বিশেষ কোন আপত্তি

করে না। প্রায় ২৩ হাজার লোক স্বেচ্ছায় প্লেগের টীকা গ্রহণ করিয়াছিল।

ব্যাঘ্র, চিতা, তরক্ষু, ভল্লুক, বন্য কুকুর, হরিণ, বন্য শূকর, গেজেল (দ্রুতগামী হরিণ) প্রভৃতি নানাবিধ পশু এই জেলায় পাওয়া যায়। বন্য কুক্কুট, তিতির, ভারুই, বিল মোরগ, নানাপ্রকারের হংস, চতুর্ব্বিধ কাদাখোঁচা, সারস প্রভৃতি এই জেলায় দৃষ্ট হয়। শোন্ নদীতে বোয়াল, টেংরা, বাচা, রুই এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য পাওয়া যায়।

পশু, পক্ষী ও মৎস্য।

এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীদিগকে 'জমীদার' না বলিয়া 'মালেক' বলা হয়। ইঁহারা প্রায় সকলেই ক্ষত্রিয়। যুদ্ধে যোগদান করিতেন বলিয়া ইঁহারা হিন্দু রাজাদের সময়ে ভূমির স্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহারা সেই জমীর উপর স্থায়ী স্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন কিনা ঠিক বলা যায় না। সেই সময়ে কর্ষিত ভূমিতে 'রায়তের স্বত্ব ছিল বলিয়া অনুমিত

ভূস্বামী।

হয়। মুগলদের আমলে মালেকগণ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী অথবা ভূমির স্বত্বাধিকারী ছিলেন না। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী প্রজাদিগকে কবুলতি দিতেন, খাজনা সংগ্রহ করিতেন এবং আয়ের এক দশমাংশ মালেককে দিতেন। মালেকেরা হিসাব করা বা সেরেস্তার প্রাপ্য অংশের হিসাব দেখিতেন। মালেক নিজ নিজ প্রভুত্বের শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার জন্য বৎসরে প্রতি গ্রামের রায়তের নিকট হইতে যৎসামান্য উপহার পাইতেন। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে মালেকগণ জমীদার বলিয়া পরিগণিত হন।

গয়া জিলার খাজনা আদায় প্রথাকে 'ভাওলি' বলে, অর্থাৎ নগদ টাকা না দিয়া ধান্যাদি শস্যে খাজনা দেওয়া হয়। জমীদারেরা উৎপন্ন শস্যের যে অংশ খাজনা স্বরূপ পান, তাহা 'বাটাই' অথবা 'দানাবন্দি' দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। *

* The share of the produce which the landlord receives is determined either by *Batai i.e.* the actual

অনেক স্থলে নগদ টাকাতে খাজনা দেওয়া যায়; এই প্রথাকে 'নগদী' প্রথা বলে। কোন স্থান বিশেষে যে এই প্রথা প্রচলিত তাহা নয়, যে কোন প্রজা 'ভাওলি' ও 'নগদী' উভয় প্রথার সর্ত্তানুসরণে জমী গ্রহণ করিতে পারে।

'ভাউলি' ও 'নগদী' প্রথার মাঝামাঝি অন্য এক প্রথায় খাজনা আদায় হয় তাহাকে 'পরান' কহে।*

টিকারীরাজ। গয়া সহর হইতে ষোল মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে মোরহর নদীর তীরে টিকারী সহর প্রতিষ্ঠিত।

---

division of the crops on the threshing floor or by danabandi *i. e.* appraisement of the crop before it is reaped. L. S S. O'MALLEY.

* The *paran or poran pheri* tenure is one under which paddy land, held on the *bhaoli* system, and suited to the growth of Sugarcane or poppy, is settled at a specially high rate of rent for growing either of these crops. When the sugarcane or poppy is harvested, the land reverts to the *bhaoli* system and is sown with paddy.

Gaya Gazetteer.

টিকারী রাজগণ মুগল শাসনের শেষ সময়ে বিহারের ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেন। টিকারী হইতে চারি মাইল দক্ষিণে উত্রেণ নামক স্থানের ক্ষুদ্র জমীদার ধীরসিংহ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পুত্র সুন্দরসিংহ খুব সাহসী ছিলেন। তিনি দেশের অরাজকতার সময় নিজ বাহুবলে উত্রি, সেনওয়াত, ইজিল, বেলওয়ার, ডাবানার, অংত্রি, পহোরা এবং মাহেরের কিয়দংশ অধিকার করেন। মহারাষ্ট্রীয়দের বিরুদ্ধে বাংলার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দেন। সৈয়র উল-মুৎক্ষরিণ গ্রন্থে ইঁহাকে মগধের প্রধান ব্যাক্তি বলিয়া উল্লিখিত আছে। বিহার আক্রমণের জন্য রাজপুত্র শাহ আলমকে ইনিই আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইনি নিজ সৈন্য দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিতেও প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু সেই সময়ে সহসা ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে তিনি নিজ মুসলমান রক্ষী গোলাম গোসের হস্তে নিহত হন। বুনিয়াদ,

ফুচ এবং নেহাল সিংহ নামে তাঁহার তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র বুনিয়াদ সিংহ রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। নেহালসিংহ পিতৃঘাতককে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। বুনিয়াদ সিংহ খুব শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি শাহ আলমকে সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হন; সুন্দর-সিংহের শত্রু কামগর খাঁ শাহ আলমের মন্ত্রী ছিলেন। কামগরখাঁর কৌশলে বুনিয়াদ সিংহ ধৃত হইয়া শাহ আলমের শিবিরে আবদ্ধ হন। মুক্তিলাভের পর বুনিয়াদ সিংহ ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিয়া ইংরেজকে একখানা চিঠি লেখেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে ঐ চিঠি কাসেম আলির হস্তগত হয়। কাসেম রাজাকে পাটনায় আহ্বান করিয়া নৃশংসভাবে তাঁহার ভাইদের সহিত তাঁহাকে ১৭৬২ খৃঃ অব্দে হত্যা করেন। এই ঘটনার অল্প কিছু পূর্ব্বে বুনিয়াদ সিংহের স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। ইনিই রাজা মিত্রাজিৎ সিংহ। কাসেম এই শিশুকে হত্যা করিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। রাণী এই সংবাদ জানিতে

পারিয়া একটি ঘুঁটের ঝুড়িতে শিশুটিকে ঢাকিয়া জনৈক দরিদ্রা রমণীকে দিয়া প্রধান রাজ-পুরুষ দলীল সিংহের নিকট পাঠাইয়া দেন। সিতাব রায়ের কৌশলে মিত্রাজিৎ সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হইতে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ-রাজের সহায়তায় তিনি নিজ রাজ্যাধিকার ফিরাইয়া পান। মহারাজ টিকারীরাজ হিতনারায়ণ ও মোদনারায়ণ এই দুই পুত্র রাখিয়া ১৮৪০ খৃঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন। এই সময়ে জমিদারী নয় আনা ও সাত আনা এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে হিতনারায়ণ মহারাজা হন। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন; সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নিজ স্ত্রী মহারাণী ইন্দ্রাজিৎ কুণরের হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি সন্ন্যাসী হন। রাণী স্বামীর অনুমতিক্রমে মহারাজ রামনারায়ণকৃষ্ণ সিংহকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন তাঁহার বিধবা পত্নী মহারাণী রাজরূপ কুণর নিজকন্যা রাধেশ্বরী

কুণরকে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া যান। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যুর পর শিশু পুত্র গোপাল শরণ নারারণ সিংহ টিকারীর রাজপদে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে কুমার নাবালক ছিলেন বলিয়া ১৯০৪ খৃঃ অব্দে টিকারীর নয় আনা অংশ কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে সমর্পিত হয়। বর্ত্তমান সময় এই সম্পত্তির আয় প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। সাত আনা জমিদারীর মালিক মোদনারায়ণ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই রাণী সম্পত্তির মালিক হন। তাঁহারা উভয়ে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মোদনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু রণবাহাদুর সিংহকে নিজ নিজ সম্পত্তি দান করেন। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে ইনি 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু 'খিলাত' লাভ করিবার পূর্ব্বেই ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে রাজকুমারী ভুবনেশ্বর কুণর জমিদারী শাসন করিতেছেন। এই সম্পত্তির বার্ষিক আয় ৬ লক্ষ টাকা।

গয়া জিলা উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত। পাটনা জিলার সহিত উত্তরার্দ্ধকে

রাজগৃহ

[ ৭৯ পৃষ্ঠা
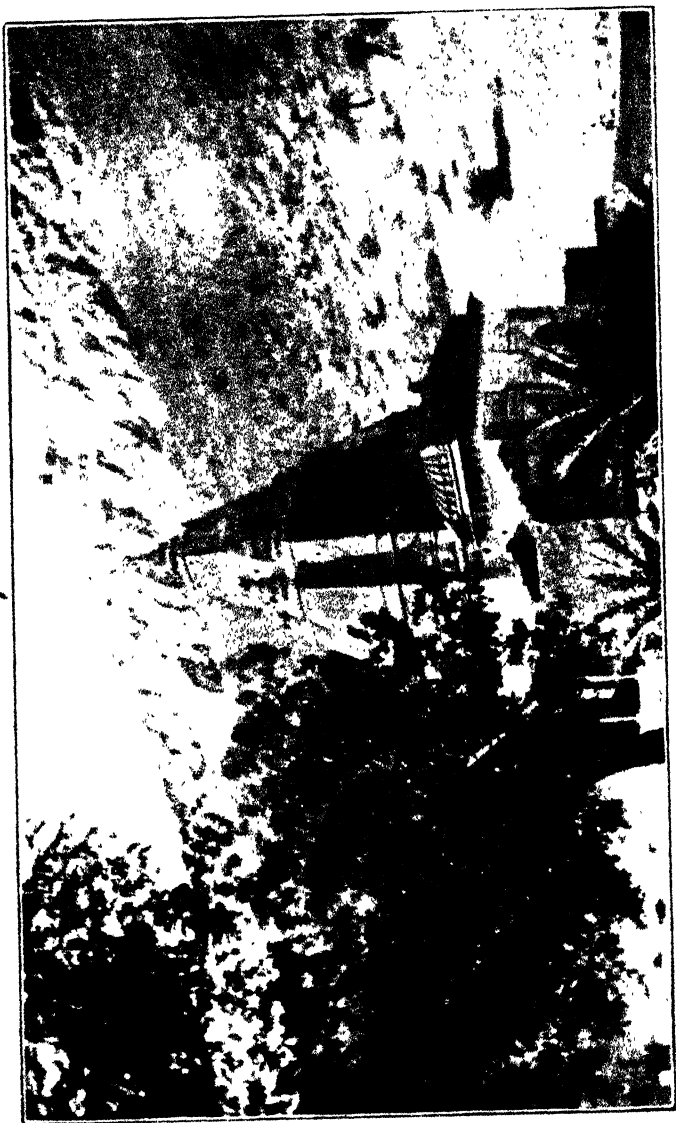
মগধ বলা হয়। এই অংশ খুব উর্ব্বর এবং তথায় জলসেচনের সুবিধাও যথেষ্ট। দক্ষিণার্দ্ধ রামগড় নামে খ্যাত। এই অংশ জঙ্গলাকীর্ণ। মগধ বৌদ্ধ দেশ। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই স্থান বৌদ্ধধর্ম্মের লীলা-ভূমি। মগধের রাজধানী রাজগৃহ। * মহাভারতে

প্রাচীন কথা।

* রাজগৃহ বৌদ্ধগণের নিকট পবিত্র তীর্থ স্থান। বুদ্ধদেব বহুকাল এইস্থানে ছিলেন। এখানকার নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালে অতি প্রসিদ্ধ ছিল। এইস্থানে সরিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের সহিত উপসেনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রাজগৃহে নিগ্রন্থ বিষপ্রয়োগে বুদ্ধদেবের প্রাণ সংহার করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিল। নিকটবর্ত্তী গৃধ্রকূট শৈলে গৌতম সুরঙ্গম সূত্র প্রচার করিয়াছিলেন। এইস্থান বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি এবং চৈত্যক এই পঞ্চ শৈলদ্বারা পরিবেষ্টিত। বায়ু-পুরাণে এই পঞ্চ পর্ব্বতের নামের একটু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, বৈভার, বিপুল, রত্নকূট, গিরিব্রজ ও রত্নাচল। কথিত আছে যে, এইস্থানে জরাসন্ধের দুর্গ ছিল। বৌদ্ধযুগে এইস্থান বুদ্ধদেবের লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল এবং বিহারে মুসলমান রাজত্বের সময়ে এখানে মকদুম সরফউদ্দীন নামক পীর বাস করিতেন। এই পঞ্চ পর্ব্বত বেষ্টিত চক্রাকার উপত্যকার নিম্নদেশ দিয়া সরস্বতী নাম্নী দুইটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। গিরিসঙ্কটের একটু দক্ষিণে ইহারা

পুনরায় মিলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সমতলভূমির সহিত এই পর্ব্বতগুলি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কানিংহাম সাহেব এই পর্ব্বতগুলির পরস্পর দূরত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

| | |
|---|---|
| বৈভার হইতে বিপুল | ১২,০০০ ফিট্ |
| বিপুল হইতে রত্নগিরি | ৪,৫০০ ফিট্ |
| রত্নগিরি হইতে উদয়গিরি | ৮,৫০০ ফিট্ |
| উদয়গিরি হইতে সোনাগিরি | ৭০০০ ফিট্ |
| সোনাগিরি হইতে বৈভার | ৯০০০ ফিট্। |

এখানে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ ছিল একথা হিওয়েনসিয়াঙ্ লিখিয়া গিয়াছেন। এখনও বিপুলগিরি ও বৈভার গিরির পাদদেশে ও তপোবনে উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। হিওয়েন সিয়াঙ্এর সময়ে পীড়িত ব্যক্তি এই উষ্ণ জলে স্নান করিয়া আরোগ্য লাভ করিত। ১৮১২ খৃঃ অব্দে ডাক্তার বুকানন্ এই প্রস্রবণ গুলি নিজ চক্ষে দেখিয়া উহাদের উষ্ণতার নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন—

| | |
|---|---|
| সূর্য্যাকুণ্ড | ১১৬ ডিগ্রী |
| সীতাকুণ্ড | ১০০ ,, |
| ব্রহ্মকুণ্ড | ১০২ ,, |
| চর্ম্মকুণ্ড | ১১২ ,, |

বর্ত্তমান সময়ে পাটনা কলেজের অধ্যাপক মিঃ জ্যাকসন্ এই কুণ্ডগুলির উষ্ণতা নিম্নের তালিকাস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

| | |
|---|---|
| সূর্য্যাকুণ্ড | ১১২ ডিগ্রী |
| সীতাকুণ্ড | ৯১ ,, |
| ব্রহ্মকুণ্ড | ১০১ ,, |
| চর্ম্মকুণ্ড | ১১০·৫ ,, |

উপরোক্ত বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে যে, এই কুণ্ডগুলির উত্তাপ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

বর্ণিত গিরিব্রজপুর জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। * ইহার অন্য নাম কুশাগারপুর। বিমানবস্তু নামক

---

* গিরিব্রজপুর বা জরাসন্ধের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে 'Eastern India' নামক গ্রন্থে মণ্টগোমারী মারটিন্ সাহেব ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন,—The ruins on Giribraja or Giriyak hill :—The original ascent to this is from the north-east, and from the bottom to the summit may be traced the remains of a road about 12 feet wide, which has been paved with large masses of stone cut from the hill, and winds in various directions to procure an ascent of moderate declivity. When entire a palanquin might have perhaps been taken up and down ; but the road would have been dangerous for horses and impracticable for carriages. In many places it has now been entirely swept away. I followed its windings along the north side of the hill, until I reached the ridge opposite to a small tank excavated on two sides from the rock, and built on the other two with the fragments that have been cut. The ridge here is very narrow, extends east and west, and rises gently from the tank towards both ends, but most towards the west ; and a paved causeway 500 feet long and 40 wide, extends its whole length. At the West end of this causeway is a very steep slope of brick 20 feet high, and 107 feet wide. I ascended this by what

পালি গ্রন্থের টীকা হইতে জানা যায় যে, প্রসিদ্ধ শিল্পী মহাগোবিন্দ এই সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

appeared to have been a stair, as I thought that I could perceive a resemblance to the remains of two or three of the steps. Above this ascent is a large platform surrounded by a ledge, and this has probably been an open area, 186 feet from east to west, by 114 feet from north to south and surrounded by a parapet wall.

At its west end, I think, I can trace a temple in the usual form of a mandir or shrine and natmandir or porch. The latter has been 26 feet deep by 48 wide. The foundation of the north east corner is still entire, and consists of bricks about 18 inches long, 9 wide and 2 thick, and cut smooth by the chisel, so that the masonry has been neat. The bricks are laid in clay mortar. Eight of the pillars that supported the roof of this porch, project from among the ruins. They are of granite, which must have been brought from a distance. They are nearly of the same rude order with those in the temple of Buddha Sen at Kaiyadol, and nearly of the same size, having been about 10 feet long, but their shafts are in fact hexagons, the two angles only, on one side of the quadrangle, having been truncated. The more ornamented side has probably been placed towards the centre of the building, while the plain side has faced the wall. The mandir

**মগধ অতি প্রাচীন দেশ। অনেকের মতে ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলে উল্লিখিত 'কীকট' মগধের প্রাচীন নাম।**

---

has probably been solid like those of the Buddhs, no sort of cavity being perceptible, and it seems to have been a cone placed on a quadrangular base 45 feet square, and as high as the natmandir. The cone is very much reduced, and even the base has decayed into a mere heap of bricks. On its south side in the area by which it is surrounded, has been a small quadrangular building the roof of which has been supported by pillars of granite, three of which remain. Beyond the mandir to the west is a semi-circular terrace which appears to have been artificially sloped away, very steep toward the sides, and to have been about 51 feet in diameter. The cutting down the sides of this terrace seems to have left a small plain at its bottom, and an excavation has been made in this, in order probably to procure materials.

Returning now to the small tank and proceeding east along the causeway, it brings us to a semi-circular platform about 30 feet in radius, on which is another conical quite ruined. East from thence, and adjacent, is an area 45 feet square, the centre of which is occupied by a low square pedestal 25 feet square, divided on the sides by compartments like the pannelling on wainscot, and terminating in a neat cornice. On this

মৌর্য্য নরপতিগণের সময়ে গঙ্গা ও শোণের সংযোগ-স্থলে পাটলিপুত্র মগধের রাজধানী ছিল। গ্রীক্‌গণ

---

pedestal rises a solid column of brick 68 feet in circumference. About 30 feet up this column has been surrounded by various mouldings, not ungraceful, which have occupied about 15 feet, beyond which what remains of the column, perhaps 10 feet, is quite plain. A deep cavity has been made into the column, probably in search of treasure, and this shows, that the building is solid. It has been built of bricks cemented by clay, and the outside has been smoothed with a chisel, and not plastered. Part of the original smooth surface remains entire, especially on the east side. The weather on the west side has produced much injury. To the east of the area, in which this pillar stands, is a kind of small level called the flower garden of Jarasandha. It must be observed, that on the west extremity of the hill, towards the plain where Jarasandha is said to have been killed, and from whence there is an opening to what is most peculiarly called Rajgriha, there is a road ascending the hill exactly similar to that at the east end, and I have no doubt, that it reaches this temple, and could have served no other purpose, but as opening a communication with it, although by the natives it is considered as the remains of a fortification. In this I have no doubt,

পাটলিপুত্র নগরকে 'পালিবোথ্রা' নামে অভিহিত করিতেন। সপ্তম শতাব্দে মগধের উত্তরে গঙ্গা,

---

that they are entirely mistaken. The only image that I saw near the temple, was a small one exceedingly decayed, which was found in the bottom of the tank. It represents a four-armed female with a child on her knee. The natives acknowledge, that it cannot represent Ganes Janani, or Ganes, and his mother, because the female has four arms and holds weapons in her hands. It probably represents the warlike Semiramis with her son Niniyas. It has the strongest affinity with an image placed near Patandevi at Patna and with one found at Koch but the weapons held in the hands are different, and the supporting animal is totally effaced. It has the ears of the Buddhas.

In the vicinity the column of brick is called the seat (Baithaki and Chabutara) of Jarasandha, and the temple is said to have been his house; both opinions are totally untenable. At Nowada the whole ruin was said to be the seat (Chautara) and flower garden of the same personage; but the ascent must always have been too laborious to render it a place of luxurious retirement, and it can only be supposed to have been attended from religious motives, most nations considering that the deity is to be pleased by whatever is painful or disagreeable in the performance. If

দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে চম্পাবতী এবং পশ্চিমে হিরণ্যবতী ছিল। বৌদ্ধযুগে মগধ অতি সমৃদ্ধি-

---

Giriyak was the country seat of Jarasandha, and the fort of Rajagriha his capital, as is possible, this may have been his principal place of worship, with a road leading up each end of the hill from each residence of the prince. What the intention of the great pillar has been, is not so obvious. It may have been merely intended as an ornament for the temple ; or it may have been erected in commemoration of Jarasandha's victories, as is said to have been customary with Indian princes ; or finally, it may be his funeral monument, as his family, for many generations continued to govern the adjacent countries, and were most powerful princes. The idea of Jarasandha's house having been seated on the hill Giribraja, so generally believed in the country, seems to derive its origin from a verse in the Bhagwat, which mentions, that Krishna, Bhim and Arjun disguised as mendicants went to Giribraja, where was the son of Brihadratha (Jarasandha), and at the time when mendicants were usually admitted, they went into the palace, and saw the king. This is usually supposed to imply, that the place was on the hill Giribraja ; but that seems straining the sense too far, as *giri* in the composition of the word cannot signify a hill, the other part *braja* signi-

শালী প্রদেশ ছিল। এই মগধের অন্তর্গত নৈরঞ্জনা তীরে বোধিবৃক্ষ মূলে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বোধিগয়া হইতে কুড়ি মাইল দূরে কুক্কুটপাদ † পাহাড়ের উপরিভাগে বসিয়া বুদ্ধদেব অনেক সময়

fying many ; but Giribraja is not a cluster of hills, on the contrary it is one hill of a cluster. Giribraja seems therefore a proper name, like the vulgar word Giriyak, for which no meaning can be assigned, and like Giriyak was probably applicable to both the hill and adjacent village. The situation of these ruins, which has in a great measure saved them from the depredations of those in search of materials ; and their dry and parched vicinity, which almost entirely checks the growth of the destructive fig trees, may account for their preservation through so many ages.

† কুক্কুটপাদ গিরি বা গুরুপাদ গিরি বৌদ্ধগণের নিকট পরম পবিত্র তীর্থ স্থান বলিয়া পরিগণিত। মহাকাশ্যপ এই স্থানে মৈত্রেয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এবং মৈত্রেয়ের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান তাঁহার ভ্রমণ বিবরণীর ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে মহাকাশ্যপের কুক্কুটপাদে প্রবেশের বিবরণ দিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম্ বর্ত্তমান কুরকিহার গ্রাম যে কুক্কুটপাদ তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই স্থান সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক খনিত হইতেছে।

তাঁহার অমৃতময় উপদেশ প্রচার করিতেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মগধের অন্তর্গত রাজগৃহে বুদ্ধদেব রাজা বিম্বিসারকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। গয়ার চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত বুদ্ধগয়া, কুক্কুটপাদ, রাজগৃহ, কুশাগারপুর, নালন্দ প্রভৃতি পুণ্যস্থানগুলি বৌদ্ধতীর্থরূপে পরিণত হইয়া আজিও চীন, জাপান, তিব্বত, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি বিভিন্ন বৌদ্ধপ্রধান দেশের পূজা ও ভক্তি গ্রহণ করিতেছে।

কুশের পুত্র বসু গিরিব্রজপুরের স্থাপন-কর্ত্তা। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩২১—২৯৭ অব্দে সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত ভারতে মগধের প্রাধান্য বিঘোষিত করেন। মগধ সাম্রাজ্য তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, তোষালী এবং সুবর্ণগিরি এই চারিটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। মহীশূর রাজ্যের সিদ্দপুরার তাম্রফলক হইতে জানা যায় যে, দক্ষিণ ভারতবর্ষের চোল, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র এবং কেরল এই চারিটী ক্ষুদ্র প্রদেশ মগধ সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। †

† অশোক।

রামগড়ে কখনও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। মগধ-সভ্যতার মধ্যাহ্ন সময়ে রামগড় ভীষণ অরণ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। তখন স্থানে স্থানে দুই এক ঘর অসভ্য লোক দৃষ্ট হইত। উত্তরকালে রাজপুতগণ এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া রামগড়, চন্দ্রগড় প্রভৃতি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে মগধ বৌদ্ধের এবং বহু শতাব্দী পর রামগড় হিন্দুর আশ্রয় স্থল হইয়া উঠে। মগধ ও রামগড়ের অধিবাসীর মধ্যে সংকল্প, চিন্তা, আচরণ ও অনুষ্ঠানে তিলমাত্রও সামঞ্জস্য ছিল না।

বোধিগয়া।

গয়া ষ্টেশন হইতে সাত মাইল দক্ষিণে বোধি-গয়া। এই স্থানে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব বা জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, এইজন্য বৌদ্ধদের নিকট ইহা মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত। খৃষ্ট তৃতীয় শতাব্দে সম্রাট্ অশোক এখানে একটি বিহার স্থাপন ও এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে মন্দির নির্ম্মাণ করেন। প্রিয়দর্শী অশোক স্বয়ং যে উদার ভাব ও অটল বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, জগ-

তের নরনারীর হৃদয়ে সেই ভাব ও বিশ্বাস সঞ্চারিত করিতে এবং বুদ্ধপ্রচারিত নির্ব্বাণ-ধর্ম্মের অত্যুজ্জ্বল মহিমা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য অপূর্ব্ব কারু-কার্য্য-খচিত এই বিরাট্ দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশীয় শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই মন্দির নষ্টশ্রী হইলে দ্বিতীয় শতাব্দে ( কাঁহারও মতে ৫ম শতাব্দে ) উহার পুনঃ সংস্কার করা হয়। রাজা সমুদ্রগুপ্তের সময়ে সিংহলের বৌদ্ধ রাজা মেঘবর্ণ ৩৩০ খৃষ্টাব্দে এখানে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। সিংহল হইতে দুইজন ভিক্ষু এখানে তীর্থ ভ্রমণে আসিয়া অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করেন ; এই সংবাদ অবগত হইয়া রাজা মেঘবর্ণ সমুদ্রগুপ্তের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া বিহার প্রতিষ্ঠার অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই যত্ন ও অর্থব্যয়ে বোধিবৃক্ষের উত্তরাংশে ত্রিতল বিশিষ্ট এক বিরাট্ বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মধ্য বাংলার শৈব ধর্ম্মাবলম্বী রাজা শশাঙ্ক ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে বোধিদ্রুম খুঁড়িয়া অগ্নি-

সংযোগে উহা নষ্ট করেন। মগধের রাজা পূর্ণ-ব্রহ্মাণ এই পুণ্যবৃক্ষ সুরক্ষিত করিবার জন্য ইহার চারিদিকে প্রাচীর ঘিরিয়া দিয়াছিলেন।

অশোক-মন্দিরের চারিদিকের রেলিংএর ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই রেলিংএর গাত্রে অশোক অক্ষরে * নিম্নলিখিত শিলালিপি ক্ষোদিত আছে—

'আর্য্য কুরঙ্গ দাবম্।' †

গয়ার ধর্ম্মশিলা ও বোধিদ্রুম সম্বন্ধে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন-সিয়াং বলেন,—'গয়া নগরীর কিঞ্চিৎ

---

† 'অশোক-অক্ষর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথাঃ—নাগরী, পালি এবং দ্রাবিড়ীয়। তির্ব্বতীয়, গুজরাটী, কাশ্মীরী, মহারাষ্ট্রী এবং বাংলা অক্ষর নাগরী হইতে উৎপন্ন। পালি অক্ষর হইতে ব্রহ্ম, শ্যাম, যাভা, সিংহল ও কোরিয়া দেশের অক্ষর উৎপন্ন। মালয়, তেলেগু, কানারী এবং তামিল অক্ষর দ্রাবিড়ীয় অক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।'

'অশোক'।

* বুদ্ধ গয়ার বিস্তৃত বিবরণ 'পরিশিষ্টে' দ্রষ্টব্য।

দূরে একটি উচ্চ শৈল দেখিতে পাই। উহার পাদ-

হিউয়েন-সিয়াংএর বিবরণ।

দেশ দিয়া নদী প্রবাহিতা। ভারতবর্ষে এই ক্ষুদ্র পাহাড়কে ধর্ম্মশিলা বলে। অতি প্রাচীন সময় হইতে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, মগধের নূতন রাজা প্রজারঞ্জন ও পূর্ব্ব পুরুষগণের অপেক্ষা সমধিক যশঃ লাভের জন্য এই শৈল-শিরে আরোহণ করিয়া রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন।'

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

'গয়ার দক্ষিণে বিধিদ্রুম বিদ্যমান আছে। প্রিয়দর্শী অশোক অপধর্ম্মের প্রতি অনুরাগবশতঃ এই গাছটিকে নষ্ট করিবার জন্য উহাতে অগ্নি সংযোগ করেন। * ধূম বিলীন হইলেই উপস্থিত

---

* এই প্রবাদের মূলে কতটা ঐতিহাসিক সত্য আছে, তাহা বলা কঠিন। হিউয়েন-সিয়াং ৭ম শতাব্দের মধ্যভাগে বুদ্ধগয়ায় আগমন্ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে দৃষ্ট হয় রাজা শশাঙ্ক ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে এই বৃক্ষে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ চীন পরিব্রাজক

দর্শকবৃন্দ দেখিয়াছিল যে, সেখানে একটি বৃক্ষের স্থানে দুইটি বৃক্ষের আবির্ভাব হইয়াছে। এই লোকাতীত ঘটনায় রাজা অশোকের নৃশংস হৃদয় বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়ে; তিনি এই অন্যায় আচরণের জন্য অনুতাপ করেন, এবং বিধিক্রমের সমস্ত অংশে সুগন্ধ দুগ্ধ সেচন করাইয়া দেন। দেখিতে দেখিতে এক রাত্রি মধ্যেই সেই বৃক্ষ বহু শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া উঠে।'

প্রাগৈতিহাসিক কথা। *

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মতে অতি প্রাচীন কালে গয়া অসভ্য কোল ভীলদের আবাসভূমি ছিল। বর্ত্তমান সময়ে গয়ার দক্ষিণে পার্ব্বত্য প্রদেশে তাহাদের বংশধর দেখিতে পাওয়া যায়। যখন

এই ঘটনার কথাই বলিয়া থাকিবেন। অশোকের শিলালিপিতে কোথায়ও তাঁহার এইরূপ অন্যায় আচরণ বা তজ্জনিত কোন প্রকার অনুশোচনার উল্লেখ নাই।

* গয়ার প্রাচীনত্বের প্রমাণাদি সহ সারগর্ভ আলোচনা গ্রন্থের প্রারম্ভে 'ভূমিকায়' দ্রষ্টব্য।

ত্রিহুত ( তিরভুক্তি—সীতাদেবীর জন্মস্থান ) ও অযোধ্যায় আর্য্যদের রাজ্য ছিল তখনও গয়া ও পাটনায় অসভ্য জাতিরা বাস করিত। অসভ্য জাতির বাসস্থান ছিল বলিয়া কোথায়ও এই স্থানের নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ্যায়ণ এই স্থান বর্ণসঙ্কর অসভ্য জাতির বাসভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রাজগৃহ এই প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল। জরাসন্ধ সেই দেশের রাজা ছিলেন। জরাসন্ধ সম্বন্ধে কতকগুলি জনশ্রুতিই এখন ঐতিহাসিকের সম্বল, তদ্‌ভিন্ন প্রামাণিক কোন কথাই জানিবার উপায় নাই। আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত জরাসন্ধের রাজধানী রাজগৃহ এখন ভীষণ অরণ্যে পরিণত! কাল প্রভাবে ইহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শুধু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্ন প্রস্তর ও স্তূপ অদ্যাপি কালের অমিত প্রভাবকে উপহাস করিয়া প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ ভারতীয় শিল্পিগণের কলাবিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

শিশুনাগ বংশ।* শিশুনাগ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। গয়ার রাজবংশের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস এই সময় হইতেই পাওয়া যায়। ইনি ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে পাটনা এবং গয়ায় রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ইহাঁর রাজ্যশাসনের বিস্তৃত বিবরণী জানিবার কোনই উপায় নাই। এই বংশের পঞ্চম রাজা বিম্বিসরের রাজত্বকালে মগধ রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। ইনি অঙ্গ রাজ্য জয় করিয়া মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহাঁর রাজত্বকালে রাজগৃহ ( প্রাচীন গিরিব্রজপুর ) কুশাগড়পুর নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ সাহেব গয়া হইতে ছত্রিশ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত বর্ত্তমান গিরিয়ককে† প্রাচীন রাজগৃহ বলিয়া

* বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণ মতে শিশুনাগ ও নন্দবংশের রাজত্ব কাল যথাক্রমে ৩৩২ ও ১০০ শত বৎসর। কিন্তু বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মতে শিশুনাগ বংশ ২০৯ ( খৃঃ পূঃ ৬ শত ) ও নন্দবংশ ( খৃঃ পূঃ ৩৬১ ) ৪০ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

† গিরি এক অর্থাৎ একমাত্র গিরি। হিউয়েন-সিয়াংএর সময়ে এই পর্ব্বতগাত্রে বুদ্ধদেবের অঙ্কিত চিহ্নাদি দৃষ্ট হইত।

নির্দ্দেশ করেন। এক্ষণে তথায় একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগর চারিদিকে উচ্চ শৈলমালায় পরিবেষ্টিত।

বিম্বিসরের রাজত্বের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা ভগবান্ বুদ্ধদেব ও জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর ধর্ম্ম প্রচার। ললিতবিস্তার মতে গৌতম বুদ্ধ গয়াবাসী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের আমন্ত্রণে রাজগৃহ হইতে গয়ায় আগমন করেন এবং তথায় গয়াশির বা ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে কিছুকাল ধ্যানে অতিবাহিত করেন। * রাজা বিম্বিসরের মৃত্যুর অল্প কিছু পরই বুদ্ধদেব ও মহাবীরের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়। এই বংশের শেষ নরপতি মহারাজ মহানন্দী শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে নন্দমহাপদ্ম নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ইনিই নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে শিশুনাগ বংশের লোপ হইলে মগধ সাম্রাজ্য নন্দবংশের হস্তগত হয়। মহাপদ্ম

---

* ডাঃ মিত্র লিখিত "বুদ্ধগয়া" গ্রন্থ, ২য় অধ্যায়।

প্রবল পরাক্রমশালী ছিলেন। ইনি ক্ষত্রনরপতি-কুলের উচ্ছেদ সাধন করেন। ইহাঁর আট পুত্র, জ্যেষ্ঠের নাম সুমাল্য। এই অষ্ট পুত্র ধারাবাহিক রূপে মগধ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

মৌর্য্যবংশ।

রাজনীতিবিশারদ তক্ষশিলাবাসী চাণক্যের ( ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুগুপ্ত ) কৌশলে নন্দবংশ সমূলে বিনষ্ট হইলে মগধে অমিত পরাক্রমশালী মৌর্য্যরাজগণের অভ্যুদয় হয়। 'মৌর্য্য নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভাষ্যকার বলেন নন্দ মহাপদ্মের এক মহিষীর নাম মুরা। মুরার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত * মৌর্য্য নামে অভিহিত হইতেন।'

মহারাজ চক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক মৌর্য্যবংশ স্থাপিত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে ভাগীরথী ও শোণের সঙ্গমতটে অবস্থিত পাটলিপুত্র ( গ্রীক্ পালিবোথ্রা ) সমগ্র ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল।

* বিখ্যাত গ্রীক্ ঐতিহাসিকদিগের প্রদত্ত চন্দ্রগুপ্তের বিভিন্ন নাম :—
১। Athenaeus এবং Schlegel—সান্ড্রাকোপ্টাস।
২। Plutarch আন্ড্রোকোটাস্।
৩। Diodorus Siculus জান্ড্রামাস্ চান্দ্রমাস।

মহারাজ অশোক এই মৌর্য্যকুলসম্ভূত ছিলেন। ইহাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গয়া পুনরায় পূর্ব্ব গৌরব প্রাপ্ত হয়। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি ও উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। বোধিগয়ার মন্দির ও বিহার প্রতিষ্ঠা ইহাঁরই কীর্ত্তি। বরাবর পাহাড়ের প্রস্তর ক্ষোদিত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইনি জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু সর্ব্ব ধর্ম্মকেই সম্মান করিতেন। *

রাজা অশোকের পৌত্র দশরথের মৃত্যুর পর ১৮৪ খৃঃ পূঃ অব্দে মৌর্য্যবংশের অবসান হইলে মৌর্য্য রাজাদের প্রধান সেনাপতি পুষ্যা-

গুপ্তবংশ।

মিত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ইহাঁর রাজত্ব অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, কারণ কলিঙ্গাধিপতি খারবেল বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া ১৫৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পাটলিপুত্র আক্রমণ করেন। এই সময় হইতে কুশানবংশীয় রাজা হুবিষ্কের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ( ১৫০ খৃঃ ) মগধের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। রাজা হুবিষ্ক বৌদ্ধ ছিলেন, কথিত আছে ইনি বোধিগয়ায় মন্দির নির্ম্মাণের জন্য বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে গয়া তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দে সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় গয়া নগরী জনশূন্য এবং মরুভূমির মত ছিল। তখন বোধিগয়া বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল ছিল বলিয়া সিংহল, ব্রহ্ম, চীন ও জাপান হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ

এখানে আসিতেন। নবম শতাব্দের প্রারম্ভে পাল-বংশীয় রাজগণ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাঁরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পালবংশীয় নৃপতিগণ হিন্দুদ্বেষী ছিলেন না; ইহাঁদের সময়ে গয়ায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। অধিকন্তু এই সময় হইতেই গয়া তীর্থভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হয়, এবং উক্ত নগরী বহু মন্দির দ্বারা সুশোভিত হইয়া উঠে।

প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে গয়ার বিশেষত্ব অস্বীকার করা যায় না। এখানে সেই আদিযুগের অসংখ্য দেবমন্দির, বৌদ্ধস্তূপ এবং স্তম্ভ এখনও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্ত্তি নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দে পালবংশীয় নৃপতিগণের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন। এই বৌদ্ধ ও হিন্দু মতোক্ত দেবদেবীর আকৃতি মধ্যে প্রাচীন ভারতের মূর্ত্তিশিল্পের উৎকর্ষ পূর্ণ মাত্রায় পরিলক্ষিত

বৌদ্ধস্মৃতি।

হয়। অধিকন্তু এই প্রাচীন শিল্পকলার ও স্থাপত্যের সমন্বয় হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ধীরে ধীরে অনেক দিক্ দিয়া হিন্দুধর্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। এখানকার বৌদ্ধমূর্ত্তির বিশেষত্ব এই যে ইহা হইতেই ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ শিল্পকলার সম্পূর্ণতার একটা আভাস পাওয়া যায়।

গয়ার অন্তর্গত নওদা মহকুমায় সীতামারি নামক স্থানে একটি সুবৃহৎ গুহা আছে। ইহা পর্ব্বতগাত্র খুদিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ স্থপতি-বিজ্ঞান অনুমোদিত এই গুহাটি কোন দেবশিল্পীর অঙ্কিত বলিয়া মনে হয়। এই গুহা এমন একটি নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিত যে, সেখানে গেলে আপনা হইতেই মন সংসারের সকল কথা ভুলিয়া গিয়া ভগবৎ প্রেমে পূর্ণ হয়। বিধাতা এই নিভৃত স্থানটিকে যেন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের সাধনার জন্য নিসর্গ-সুন্দর ও পরম রমণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। সৌন্দর্য্য-পিপাসু তীর্থযাত্রী এখানে আসিয়া যখন মাথার উপরে নীলাকাশ, পদতলে পর্ব্বতগাত্র হইতে নিম্নে

পতিতা স্রোতস্বতীর কল-মধুর গান, আর চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ শৈল-প্রাচীর বেষ্টিত রমণীয় প্রকৃতি, এবং তাহারই মধ্যস্থলে প্রাচীন বৌদ্ধ স্থপতি-বিজ্ঞানের নিদর্শনস্বরূপ গুহাগুলি দেখিতে পান তখন তাঁহার প্রাণের ভিতর জাতীয় গৌরবের একটা পরিপূর্ণ চিত্র নিশ্চয়ই জাগিয়া উঠে! কথিত আছে নির্ব্বাসিতা সীতা এই স্থানে লবকে প্রসব করেন। ইহা ব্যতীত আরও অনেক অদ্ভুত কথা এই গুহার সহিত জড়িত। কাহারও মতে দুর্ব্বাসা, লোমশ, গৌতম ও শৃঙ্গী প্রভৃতি ঋষিগণ এই স্থানে তপস্যা করিতেন এবং তাঁহাদের নামানুসারে নিকটবর্ত্তী কতকগুলি পাহাড়ের নামকরণ হইয়াছে।

পুণ্যতীর্থ গয়ায় পিতৃতর্পণ ও পিণ্ডদান প্রত্যেক হিন্দুরই অবশ্য কর্ত্তব্য। গয়াকৃত্যের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বায়ু পুরাণে সবিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় গয়া-মাহাত্ম্য ব্যাপারটাকে রূপক ভাবে ধরিয়া লইয়াছেন। তিনি 'বুদ্ধগয়া' পুস্তকে লিখিয়াছেনঃ—

'বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয় ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করাই গয়া-মাহাত্মের উদ্দেশ্য। গয়াসুর কি? ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণের পরিকল্পনা। বৌদ্ধধর্ম্মমতে নির্ব্বাণ বা মুক্তি সহজলভ্য বলিয়াই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত ইহার ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। গয়াসুরের বিরাট্ দেহ দশ যোজনব্যাপী ছিল, ইহার প্রকৃত অর্থ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার বা বিস্তৃতি ভিন্ন আর কিছুই নয়।'

বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রভূমি উড়িষ্যার অন্তর্গত বৈতরণীর তীরস্থিত যাজপুরে (বিরজাক্ষেত্র, গদক্ষেত্র, নাভিক্ষেত্র) এইরূপ একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে,—বিষ্ণুর প্রভাবে গয়াসুর নিশ্চল হইলে তাহার বিশাল দেহের নাভিদেশ যাজপুরে, গয়াক্ষেত্রে মস্তক, এবং রাজমন্দ্রিতে পদদ্বয় অবস্থিত হয়। সেই অবধি যাজপুর নাভিগয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ। অপর মতে বিষ্ণু কর্ত্তৃক সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীদেহ বিচ্ছিন্ন হইলে দেবীর নাভিদেশ এই স্থানে পতিত হয়; এই জন্য যাজপুর নাভিক্ষেত্র নামে অভিহিত।৩ যাজপুরের

একটি মন্দিরের প্রকোষ্ঠ মধ্যে একটি কূপ আছে। ইহাই নাভিগঙ্গা। যাত্রিগণ এই কূপে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। যাজপুরে বহু সংখ্যক পূজক ব্রাহ্মণের বাস। কথিত আছে যে, রাজা যযাতি কেশরী (৪৭৪ খৃঃ) কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া এক যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে এই স্থানের নাম যাজপুর বা যজ্ঞপুর হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সংগ্রাম ও উত্তর কালে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সহিত মিলিয়া যাওয়াই উপরোক্ত কিম্বদন্তীগুলির মূল উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

গয়াতীর্থের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

গয়াতীর্থের প্রাচীনত্ব।* রামায়ণে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—

'এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিৎ গয়াং ব্রজেৎ।'

অযো—১০৭—১৩।

* প্রমাণাদিসহ বিশেষ বিবরণ ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

কোন্ সময় হইতে গয়ায় তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কাহারও মতে দশম শতাব্দে পালবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে গয়া বিশেষভাবে তীর্থযাত্রীর নিকট পরিচিত হয়। অক্ষয়বটের নিকট দশম শতাব্দের একখানা শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। নরপালের শাসনকর্ত্তা বজ্রপাণির অপ্রকাশিত শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, ১০৬০ খৃঃ ইনি গয়াকে নগণ্য পল্লী হইতে বৃহৎ নগরীতে পরিণত করেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই গয়ালীরা বিষ্ণুপাদ মন্দিরের বিগ্রহ পূজা ও মন্দির সংরক্ষণের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপর এক খানি শিলালিপিতে প্রকাশ যে কোন রাজ-পুত-মন্ত্রী ১২৪২ খৃষ্টাব্দে গয়াতীর্থে আসিয়াছিলেন। এই তীর্থ পর্যাটন স্মরণীয় করিবার জন্য তিনি লিখিয়া গিয়াছেন 'আমি গয়াকাজ করিয়াছি। প্রপিতামহ ইহার সাক্ষী।'

গয়ার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এল, এস্, এক্স, ওমেলি

( L. S. S. O' Malley. I. C. S ) সাহেবের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে সপ্ততীর্থের শ্লোকে গয়ার উল্লেখ নাই বলিয়া মনে হয় গয়া ৮ম শতাব্দে তীর্থপ্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। শ্লোকটী এই ঃ—

'অযোধ্যা-মথুরা-মায়া-কাশী-কাঞ্চী-অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতীচৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকা॥'

শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই শ্লোকটী ৮ম শতাব্দে রচিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, প্রথমেই গয়াযাত্রী পুন্ পুন্ নদীতীরে ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। গয়ায় পৌঁছিয়া গয়ালীর পাদপূজা করা বিধি। অতঃপর গয়াশ্রাদ্ধ করিতে হয়। সংকল্প করিয়া স্নানের সাধারণ মন্ত্রপাঠ ও ফল্গুতীর্থে স্নান করিবে। ফল্গু, বিষ্ণুপদ, ও অক্ষয়বটমূলে যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি ও তর্পণ গয়ার প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড দান

গয়াকৃত্য।

করিয়া যাত্রী অক্ষয়বটমূলে আগমন করেন এবং সেখানে পিণ্ডদান ও গয়ালীকে দক্ষিণা দিয়া তাঁহার নিকট 'সুফল' গ্রহণ করিতে হয়। গয়ালী যাত্রীর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া 'সুফল' বলেন। এই বাক্য হইতেই বুঝিতে হয় যাত্রীর গয়াকর্ম্ম যথাযথরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। তখন গয়ালী তাঁহাকে কিছু মিষ্টান্ন, গলায় একছড়া ফুলের মালা ও কপালে ফোঁটা পরাইয়া দেন।

মনিয়র উইলিয়মস্ এম্, এ, সি, আই, ই, তাঁহার রচিত 'ধর্ম্মজীবন ও চিন্তা' নামক গ্রন্থে গয়াযাত্রীর বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

ছয়টি মনুষ্য ও একজন গয়ালী-পাণ্ডা মন্দিরের স্তম্ভশ্রেণীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে বসিয়া পড়িল এবং পাণ্ডা এই যাত্রীদলের পুরোভাগে আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপর অন্ন ও দুগ্ধ দিয়া দ্বাদশটী পিণ্ড প্রস্তুত করা হইল। * * * * পিণ্ডগুলি পবিত্র তুলসী পত্রের সহিত ছোট ছোট মাটীর শরাতে রাখা হইল। ইহার পর ঐ পিণ্ড-

সমূহের উপরে কুশতৃণ এবং ফুল ছড়ান হইল। আমাকে বলা হইল যে,যে দ্বাদশটী পিণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে উহা যে দ্বাদশটি পিতৃপুরুষের জন্য শ্রাদ্ধ করা হইতেছে তাঁহাদের উদ্দেশেই প্রস্তুত হইয়াছে। এই মাঙ্গলিক-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবার জন্য শ্রাদ্ধকারীদের হস্ত সংশোধনের মানসে তাহাদের অঙ্গুলিতে কুশতৃণ জড়ান হইল। তৎপর তাহাদের হাতের তালুতে জল ঢালিয়া দেওয়া হইল, এই জলের কিছু তাহারা মাটীতে ছড়াইয়া দিল আর কিছু পিণ্ডের উপরে দিল। ইহাদের মধ্যে একজন কি দুইজন তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র হইতে সূত্র বাহির করিয়া পিণ্ডের উপরে স্থাপিত করিল। এই কার্য্য দ্বারা তাহাদের মৃত আত্মীয়দের পরিধেয় প্রদান করা হইল। ইত্যবসরে গয়ালীর নির্দ্দেশ অনুসারে মন্ত্র পাঠ এবং প্রার্থনা হইতে লাগিল এবং সময়ে সময়ে আশীর্ব্বাদ দেওয়ার ভাবে হস্ত পিণ্ডের উপরে বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। পরে পূজারী ব্রাহ্মণের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ প্রণত হইয়া এবং

তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া সমগ্র ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি করা হইল।

যে পিতৃপুরুষদের জন্য শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাঁহাদের সংখ্যানুসারে পিণ্ডের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং যাহারা পিণ্ডদান করে তাহাদের জাতি ও দেশ অনুসারে পিণ্ডের উপাদান ও আকৃতির ইতর বিশেষ হয়। আমি একদলকে শস্যচূর্ণ দ্বারা * * * বড় বড় পিণ্ড দিতে দেখিয়াছি। কখন কখন পানের উপরে মুদ্রা সহ পিণ্ড রক্ষিত হয়; ঐ মুদ্রা পুরোহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। কখন কখন এই ক্রিয়াতে যে জল ব্যবহৃত হয় তাহা জলপূর্ণ ঘটের মধ্যে কুশতৃণগুচ্ছ ডুবাইয়া দিয়া উঠান হয় এবং উহাতে সংলগ্ন জলই পিণ্ডের উপরে ছিটাইয়া দেওয়া হয়। সর্ব্বক্রিয়া শেষ হইলে অজানিত ত্রুটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। ইহার পর পিণ্ডদানার্থে ব্যবহৃত শরাগুলি মন্দিরের সন্নিহিত একটি নির্দ্দিষ্ট প্রস্তরের নিকট বহন করিয়া লইয়া তাহাতে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। কোন উচ্ছিষ্ঠ শরা-ই

দ্বিতীয়বার ব্যবহৃত হয় না। পিণ্ডগুলি কখন বা পক্ষী কি অন্যান্য প্রাণীকে খাইতে দেওয়া হয়, কখন বা ভক্তির সহিত উহা নদীতে বিসর্জ্জিত হয়।

অনেকের মতে গয়ায় গদাধরের পাদপূজা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। গয়ায় বিভিন্ন মন্দিরে পাদপূজা করিতে হয়। কনিংহ্যাম সাহেব বলেন সম্ভবতঃ ইহা বুদ্ধদেবের পদ-চিহ্ন। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় ব্রাহ্মণেরা ইহা বিষ্ণুপদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। ডাঃ রজেন্দ্র লাল মিত্র তাঁহার 'বুদ্ধগয়া' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—'সমগ্র বৌদ্ধদেশে বুদ্ধদেবের

পাদপূজা। *

* নবদ্বীপের বিখ্যাত স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিসম্বন্ধে তাঁহার নূতন ও সুসংস্কৃত মত প্রচারের জন্য দেশভ্রমণে বাহির হইয়া পিতৃমাতৃ কার্য্যের জন্য গয়াতীর্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই ষোড়শ শতাব্দে গয়ালী ব্রাহ্মণেরা অগ্রে পণ গ্রহণ করিয়া যাত্রীকে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করিতে অনুমতি দিতেন। রঘুনন্দনকে সামান্য যাত্রী মনে করিয়া গয়ালীরা উচ্চ পণের জন্য জেদ করেন। স্মার্ত্তের কাতর প্রার্থনায় গয়ালীদের প্রাণে কিঞ্চিন্মাত্রও দয়ার ভাব জাগিল না। তখন রঘুনন্দন শাস্ত্রমতে 'পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং

পদ-চিহ্ন অতি ভক্তির সহিত পূজিত হয়। এই পদ-চিহ্ন সকলেই দেখিতে পায় মন্দিরের এমন কোন এক স্থানে উহা রক্ষিত হয়; সেই আদিযুগে বুদ্ধদেবের পদাঙ্ক পূজার পদ্ধতি সর্ব্বত্র প্রচালিত ছিল এবং জনসাধারণ ইহার অনুকূলে ছিলেন। হিন্দুগণ যখন গয়া অধিকার করেন, তখন তাঁহারা এই পুণ্য পদ-চিহ্ন নষ্ট না করিয়া বিষ্ণু-পদ চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভারত-বর্ষের বহু স্থান হইতে পিতৃগণের মুক্তির জন্য এই পদ-চিহ্ন পূজা করিতে আগমন করিয়া থাকেন।'

এইরূপ একটা অনুমানের উপর পাদপূজা ব্যাপারটাকে প্রতিষ্ঠিত করা কোন মতে সমীচীন

ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ' এই বচন উদ্ধৃত করিয়া বিষ্ণুপাদমন্দির হইতে দূরে এক প্রান্তরে যাইয়া পিণ্ডদানের উদ্যোগ করেন। এই সময় গয়ালীরা সামান্য ব্রাহ্মণকে ভারতবিজয়ী স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বলিয়া জানিতে পারিলেন। এত বড় পণ্ডিত মন্দিরের বাহিরে পিণ্ড দিলে কেহ আর ভিতরে যাইবার ইচ্ছা করিবে না, এইজন্য তাঁহারা স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড দিতে সম্মত করিয়াছিলেন।

নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই পাদ-পূজা হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। কনিংহ্যাম্ ও ডাঃ মিত্র প্রভৃতি আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বুদ্ধ-গয়ার ইতিহাস সংগ্রহে তন্ময় হইয়াই হিন্দুগয়া সম্বন্ধে এইরূপ আজগবী কল্পনার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। গয়ামাহাত্ম্য নিতান্ত আধুনিক নহে, বৌদ্ধ-যুগের বহুপূর্ব্ব হইতেই ছিল। তাহা না হইলে বুদ্ধদেব গয়াতে যাইবেন কেন?

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বক্‌তিয়ার খিলিজি গয়া আক্রমণ করেন। সেই সময়ে বহু ভিক্ষু হত এবং বহু দেবালয় নষ্টশ্রী হইয়াছিল। যাঁহারা রক্ষা পাইয়াছিলেন তাঁহারা অনেকেই তিব্বত, নেপাল এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষে পলায়ন করিয়াছিলেন। এই ভাবে বিহারে বৌদ্ধ ধর্ম্মের লোপ হয়। ক্রমে গয়ার সহিত সমগ্র বিহার প্রদেশ মুসলমানের করতলগত হইয়াছিল। মিবারের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দে পুণ্যনগরী গয়া মুসলমানের হস্ত

গয়ায় মুসলমান।

হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অভিযান প্রেরিত হয়, কিন্তু রাজপুতগণ বহু চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই।

মুগল রাজত্বের অবসান সময়ে এবং ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে টিকারী, কামগড়খাঁ, বিষণ সিং, রামগড়ের রাজা প্রভৃতি জমীদারগণ গয়া জিলা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। ইহাঁদের মধ্যে রামগড়ের রাজাই প্রধান ছিলেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য 'মুতক্ষরীণ্' লেখকের পিতা ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত হন। রামগড়ের দুর্গ অধিকৃত হইবার পর সৈন্যেরা পাহাড়ে প্রবেশ করিতে যাইতেই মহারাষ্ট্রীয়দের আগমনবার্ত্তা প্রচারিত হয়। এই কারণে মুগল সেনাপতি অভিযান ফিরাইয়া আনিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ঘটনার চব্বিশ বৎসর পর বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজগণ জয়লাভ করিলে বাংলার সহিত গয়াও ইংরেজের হস্তগত হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহে ইংরেজ

রাজকে প্রথমে একটু বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু সদাশয় লর্ড ক্যানিং ও কৌশলী ইংরেজ সেনাপতিদের সমবেত চেষ্টায় সত্বরই বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইয়া দেশে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। গয়ার তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ মনির ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ২৮শে জুলাইর রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, গয়ার চতুর্দ্দিকে শান্তি বিরাজ করিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ দানাপুরের বিদ্রোহের সংবাদে গয়া সহর একটু চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন গয়ায় ৪৫ জন ইংরেজ ও এক শত শিখসৈন্য বিদ্যমান ছিল বলিয়া মিঃ মনি সহর-বাসীদিগের নিকট হইতে কোন প্রকার অত্যাচার বা লুণ্ঠনের আশঙ্কা করেন নাই। ৩১শে জুলাই তিনি বিভাগীয় কমিশনারের নিকট হইতে এই মর্ম্মে চিঠি পান যে তুলবারের দল আরার নিকট পরাজিত হইয়াছে। এখন দেশরক্ষার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একটি সুবিধাজনক কেন্দ্রস্থানে সমবেত হইতে হইবে। সেই পত্রে মিঃ মনির

সিপাহী বিদ্রোহ।

প্রতি আদেশ ছিল যে তিনি অবিলম্বে দলবল সহ পাটনায় গমন করিবেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় মিঃ মনি লোকজন সহ গয়া পরিত্যাগ করিয়া পাটনার দিকে রওনা হইলেন। তখন কারাগৃহে বহু কয়েদী ও কোষাগারে সাতলক্ষ টাকা ছিল। এই সমস্তই দারোগা ও নজীব প্রহরীর সুবাদারের জিম্মায় ফেলিয়া যাইতে হইয়াছিল। তাঁহারা সহর ছাড়িয়া তিন মাইল অগ্রসর হইয়াছেন এমন সময় মিঃ মনি ও অপিয়ম বিভাগের মিঃ হলিংস্‌এর হৃদয় এইভাবে পলায়নের জন্য লজ্জা ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইল। বীরের জাতি নিজ প্রাণরক্ষার জন্য এইভাবে কাপুরুষের মত পলাইয়া যাইতেছেন এই ভাবনায় তাঁহারা উভয়ে হৃদয়ে কেমন একটা যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহারা লোকজনকে থামিতে বলিলেন, সকলকে নিজ নিজ অভিপ্রায় জানাইয়া মেসার্স মনি ও হলিংস্‌ গয়ায় ফিরিয়া আসিলেন। গয়াবাসিগণ তাঁহাদিগকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল; ব্রিটিশ রাজ-

শক্তিকে এই বিপদের সময় যথাশক্তি সাহায্য করিবার জন্য গয়ালীগণ বদ্ধপরিকর হইলেন। ৩রা আগষ্ট দানাপুর হইতে সংবাদ আসিল 'নিজ নিজ চেষ্টা দেখুন, একটি কামান সহ দেশীয় অষ্টম পদাতিক সৈন্য গয়ার দিকে রওনা হইয়াছে।' কালেক্‌টরের আদেশে তখনই রণসভা আহূত হইল। সামান্য ৮০ জন সৈন্য লইয়া গয়া রক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনায় গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া ইংরেজ সৈন্যের পাহাড়ায় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়া ধনরত্নাদি কলিকাতায় প্রেরিত হইল। মিঃ মনি কোম্পানীর কাগজ পুড়িয়া ফেলিলেন। তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিতেই সংবাদ আসিল নজীব প্রহরীগণ জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া যে রাস্তায় টাকাকড়ি লইয়া গরুর গাড়ী যাইতেছিল সেই দিকে তাহারা ছুটিয়া চলিয়াছে। দেশীয়দের সঙ্গে ধনরক্ষক ইংরেজসৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, কিন্তু কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর নজীব প্রহরীগণ পরাজিত হইল। জয়লাভ করিয়া ইংরেজ সৈন্য সরকারের টাকাকড়ি

নিরাপদে রাণীগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দেয় এবং তথা হইতে রেলসংযোগে টাকা কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হয়।

১৬ই আগষ্ট পুনরায় গয়া অধিকার করা হয়। এই সময়ে যোধহর সিংহ একদল ভোজপুর সৈন্য লইয়া গয়া জিলার উত্তর ও পশ্চিমাংশে অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করে। কাপ্তান রেলে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই এই বিদ্রোহ দমন করিয়া গয়া জিলা হইতে বিদ্রোহের শেষ চিহ্ন বিলোপ করেন।

---

# প্রসিদ্ধ স্থান।

গয়া নগরী পুরাতন গয়া ও সাহেবগঞ্জ এই দুই অংশে বিভক্ত। পুরাতন গয়ায় দেব-মন্দির ও গয়ালীদের বাড়ী। সাহেবগঞ্জ বাণিজ্যের স্থান। এখানে আদালত, সাহেবদের বাসস্থান প্রভৃতি স্থাপিত। অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগে কালেক্টর মিঃ ল ( Law ) এই সহর প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার রাস্তাঘাটগুলি বেশ সোজা, প্রশস্ত ও পরিষ্কার। পুরাতন গয়া ও রামশিলার মাঝখানে নদীতীরে সহরের এই অংশকে সাহেবগঞ্জ বলা হয়। য়ুরোপীয় ভদ্রলোকদের বাসস্থান বলিয়া 'লাহাবাদের' অন্য নাম সাহেবগঞ্জ।

সাহেবগঞ্জ।

বিষ্ণুপদই গয়ার প্রধান পবিত্র বস্তু। এই পুণ্য পদাঙ্কপূজা করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু
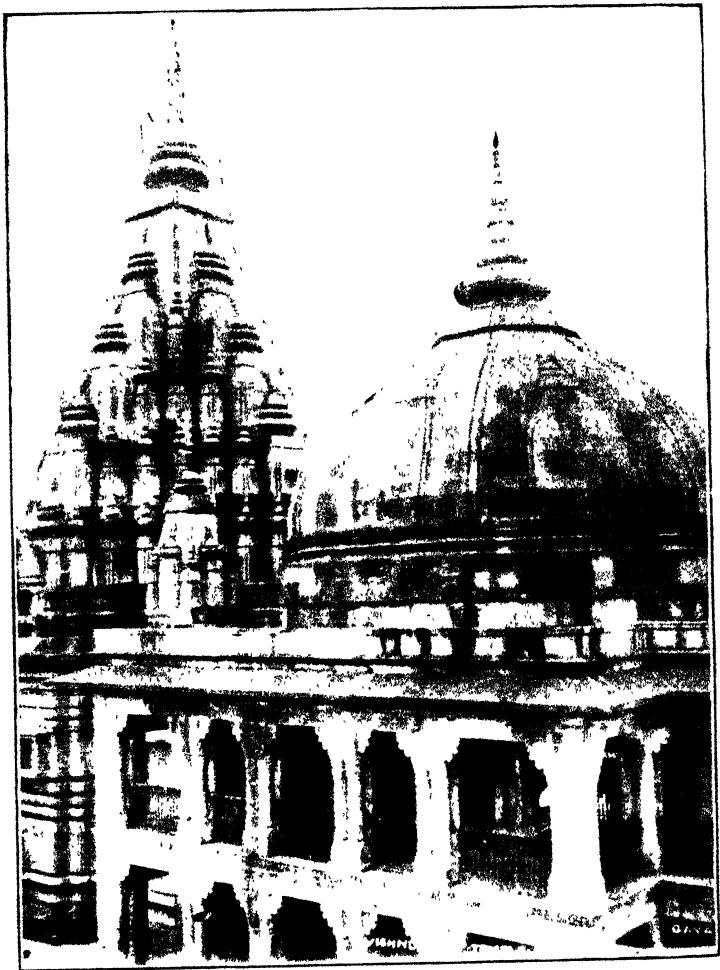
বিষ্ণুপদ মন্দির।

গয়াতীর্থে আগমন করিয়া থাকেন। এই মন্দির গয়াতীর্থের কেন্দ্রস্বরূপ। বিষ্ণুপদ-চিহ্ন হইতে এই মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী

**বিষ্ণু-পাদ মন্দির।** *

* বিষ্ণু-পাদ মন্দিরের স্থাপত্য ও নির্ম্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে মার্টিন সাহেব নিম্নোক্ত বিবরণ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে লিখিয়া গিয়াছেন :—

The area of the Vishnupada is so small that no good view of the building can be had, which is the more to be regretted, as it possesses much more elegance than any Hindu structure that I have yet seen. It was lately built by Ahalya Bai, the widow of Holkar; and workmen were brought on purpose from Jaynagar, not only to build it, but to quarry the stones. The total length on the outside, as will appear from the ground plan is only 82½ feet, so that it would make a small parish church; and the stone, although well squared, and very soft, has not by any means been cut smooth; yet the building is said to have cost 3,00,000Rs. and it required 10 or 12 years' labour. The mandir over the object of worship is an octagonal pyramid, probably 100 feet high, with many mouldings exceedingly clumsy, and much in the * * style of the great gateways of the temples in the south of India, built by Krishna, King of Vijaya-

অহল্যাবাই অষ্টাদশ শতাব্দে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইহা সুদৃঢ় গ্রেনাইট

---

nagar, such as that of Kanchi or Conjeveram. The nat mandir or porch in front is however a very neat airy work, and consists of a square centre supporting a dome with a narrow gallery on three sides. The ground plan and elevation of one of the buttresses, which support the roof, will give some idea of the whole. My painters failed in an attempt at placing the whole building in anything like perspective. The outside of the dome is peculiarly graceful. Its inside is not so light but still is highly pleasing to the eye. The columns are very neat, disposed four and four in clusters ; but owing to this, and to their being placed in a double order one above the other, their dimensions are insignificant, which is the greatest defect in this part of the building.

The masonry of the dome is exceedingly curious, and is of a kind that I believe is unknown in Europe ; but on this subject I have at present no book to which I can refer. It was built without any centre, and instead of being arched, consists of horizontal rows of stone, each row forming a circle, and each circle being of less diameter than the one immediately below. The horizontal thickness of the stones in each row is the same throughout. Each

( কৃষ্ণ প্রস্তর ) প্রস্তরে নির্ম্মিত। মূলমন্দির দ্বিতল, ইহার পরিমাণ ৫৮ বর্গ ফিট্। ইহা আট সারি স্তম্ভের উপর স্থাপিত, প্রত্যেকটী স্তম্ভ চারিটি স্তম্ভের সমষ্টি। মন্দিরের উপরিভাগ গুম্ব-জাকার, ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। মন্দিরের যেই অংশে পদ-চিহ্ন স্থাপিত, তাহার উপরে সুউচ্চ পিরামিডের আকারের অষ্টকোণবিশিষ্ট টাওয়ার

row is defined by two concentric circles, and the ends of each stone are defined by two of the radii. The stones of each row are therefore firmly wedged together, so that no power could force them inwards, and each joining of the same row is united by three clamps of iron let into both stones. The clamp in the middle is quadrangular, and passes through the whole depth of the row. The other two reach about two inches into the upper surface of the stones ; the outer clamp being in form of a dove-tail, the inner in that of a parrellelogram, * * * * * * * * * The key-stone is circular, with a shoulder projecting over the edge of the uppermost horizontal row. The workmen say that the dome might have been constructed twice the size on the same plan. *

দৃষ্ট হয়। ইহার উচ্চতা একশত ফিট্। ইহার অগ্রভাগে স্বর্ণ নির্ম্মিত চূড়া ও ধ্বজা আছে। মন্দির-দ্বার রৌপ্য নির্ম্মিত। এই দ্বারদেশে দুইটি ঘণ্টা আছে। প্রথম ঘণ্টা নেপালের রাজমন্ত্রী রণজিৎ পাঁড়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। দ্বিতীয় ঘণ্টাটি যাত্রী-কর আদায়ের কালেক্টর গিলেণ্ডার সাহেব উপহার দিয়াছিলেন। উহার গায়ে লিখিত আছে,—'মিঃ ফ্রান্সিস্ গিলেণ্ডারের দান। গয়া, ১৫ই জানুয়ারী, ১৭৯০ খৃঃ।'

মন্দিরের সম্মুখভাগে নাট-মন্দির, ইহা কলিকাতার রাজা রাধাকান্ত দেব প্রস্তুত করাইয়া দেন।

মন্দিরাভ্যন্তরে প্রায় ১৩ × ৬ ফিট্ বিস্তৃত একখানি প্রস্তর ফলকের উপর রৌপ্য নির্ম্মিত ষোলটি কোণবিশিষ্ট কুণ্ড মধ্যে বিষ্ণু-পাদ-পদ্ম আছে। এই কুণ্ডে কচ্ছপের পীঠের ন্যায় অর্দ্ধ গোলাকার শিলাখণ্ডে একখানি পদ-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পদাঙ্ক এখন আর সুস্পষ্ট নহে, তবে দুগ্ধ ঢালিয়া দিলে পা খানি বেশ ফুটিয়া উঠে। এই বিষ্ণুপদ-চিহ্ন

ভক্তের নিকট পরম পবিত্র বস্তু বলিয়া পরিগণিত। হিন্দুর বিশ্বাস এখানে পিণ্ডদান করিলে মৃতব্যক্তির আত্মার সদ্গতি হয়।

মন্দির প্রাঙ্গণ সংকীর্ণ ও চারিদিকে সমান নয়। অন্যান্য বহু মন্দির ইহার চারিদিকে ঘিরিয়া থাকাতেই ইহা অল্প পরিসর হইয়াছে। দেবতা ও মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার পূর্ব্বে 'সোলাবেদি' মুক্ত প্রাঙ্গণে যাত্রিগণ প্রথমে মিলিত হন। সংলগ্ন অপর প্রাঙ্গণে গদাধর মন্দির। এই মন্দিরের সিংহদ্বারে ইন্দ্রের অতি সুন্দর একটি মূর্ত্তি আছে; দেবরাজ দুইটি হস্তীর উপর একখানি সিংহাসনে বসিয়া আছেন। এই মন্দিরের উত্তর পশ্চিমাংশে গয়েশ্বরী দেবী বা মহিষাসুরনাশিনী অষ্টভুজার মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। পালবংশীয় নৃপতিদের সময়ে বিষ্ণু-পাদ মন্দিরের বিভিন্নাংশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিষ্ণু-পাদ মন্দির প্রবেশের পথে ক্ষুদ্র একটি মন্দিরে একটি হাতী বৃক্ষ হইতে ফল ও পুষ্প ছিঁড়িতেছে এই ধরণের প্রস্তর মূর্ত্তি

দৃষ্ট হয়। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মনে করেন এই মুর্ত্তিটী খৃষ্ট শতাব্দের প্রথমভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রবাদ এই যে, ব্রহ্মা এই মন্দিরে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-পাদ মন্দির অপেক্ষা এই মন্দির আয়তনে ক্ষুদ্র। কতক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঠ লইয়া এই মন্দির গঠিত। মন্দিরের ছাদ অনেকগুলি সারি সারি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। একটি স্তম্ভের উপর

গদাধর মন্দির। *

---

* গদাধর মন্দির এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী মন্দিরের প্রাচীরগাত্রের শিলালিপি সম্বন্ধে Montgomery Martin সাহেব বলেন —From the area around Gadadhar there is a narrow winding passage into the area, which encompasses the Vishnu pada. This passage is enclosed by small rude buildings, in one of which is an image not worshipped. On a rude pillar at the door of this are several inscriptions, which have been cut at different times, and are partly in a kind of DevaNagri, partly in the Tailauggu characters. One in a kind of Nagri, is dated in sambhat 1377 (A.D. 1210) ; but, owing to some ambiguity in the language, the Pandit of the Survey can make nothing certain of its meaning, except that it concerns a certain Karma Deva, Son of Harideva, a

শিলালিপি খোদিত আছে, কিন্তু উহা হইতে মন্দির নির্ম্মাতা অথবা প্রতিষ্ঠাতার নাম ও তারিখ কিছুই জানা যায় না। বর্ত্তমান মন্দির প্রায় ১৫০ দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সূর্য্যমন্দির।

বিষ্ণু-পাদ মন্দিরের অল্প একটু উত্তরে সূর্য্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরাভ্যন্তরে সূর্য্যদেবতার মূর্ত্তি। সেই চিত্রে সারথি অরুণ সাতটি ঘোড়ার রশ্মি ধরিয়া আছেন। মন্দিরের দক্ষিণদিকে প্রাচীরবেষ্টিত একটি কুণ্ড আছে। বহু যাত্রী পিতৃগণের উদ্দেশে এই কুণ্ডে পিণ্ডদান করেন। ইহার নাম 'সূর্য্যকুণ্ড'।

একটি সংকীর্ণ গলির ভিতর দিয়া বিষ্ণু-পাদ

---

descendant of Kasyup who came to Gaya Hill. Another inscription in a similar character seems to be equally difficult of explanation. It is dated a year earlier than the other and mentions a Datta Sen, prince of Brahmas of Sattapur. The inscription in the Tailauggu character mentions, that some persons on the 3rd of Ashara performed his ceremonies at Gaya.

মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়। এই গলি যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে গয়েশ্বরীর ক্ষুদ্র মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

গয়েশ্বরী।

জনশ্রুতি এই যে, গয়ানগরী স্থাপনের সময় এইখানে ব্রহ্মা গয়েশ্বরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গয়েশ্বরীর অপর নাম জগদম্বা। ইনি সিংহবাহিনী দুর্গা। মন্দিরের শিরোভাগে একখানি শিলালিপি আছে।

বিষ্ণু-পাদ মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের নিম্নভাগে বিখ্যাত অক্ষয়বট বিদ্যমান। সাক্ষ্য প্রদানকালে সত্য কথা বলিয়া এই বৃক্ষ সীতাদেবীর নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়। গয়াকার্য্য শেষ হইলে এই বৃক্ষমূলে যাত্রিগণ গয়ালীঠাকুরের নিকট হইতে 'সুফল' গ্রহণ করিয়া থাকেন।

অক্ষয়বট।

গয়ামাহাত্ম্যে এই মূর্ত্তির কোনও উল্লেখ নাই। এই মন্দির সংলগ্ন বৈঠকখানায় গয়ালীরা সমবেত

অক্ষয় বট।
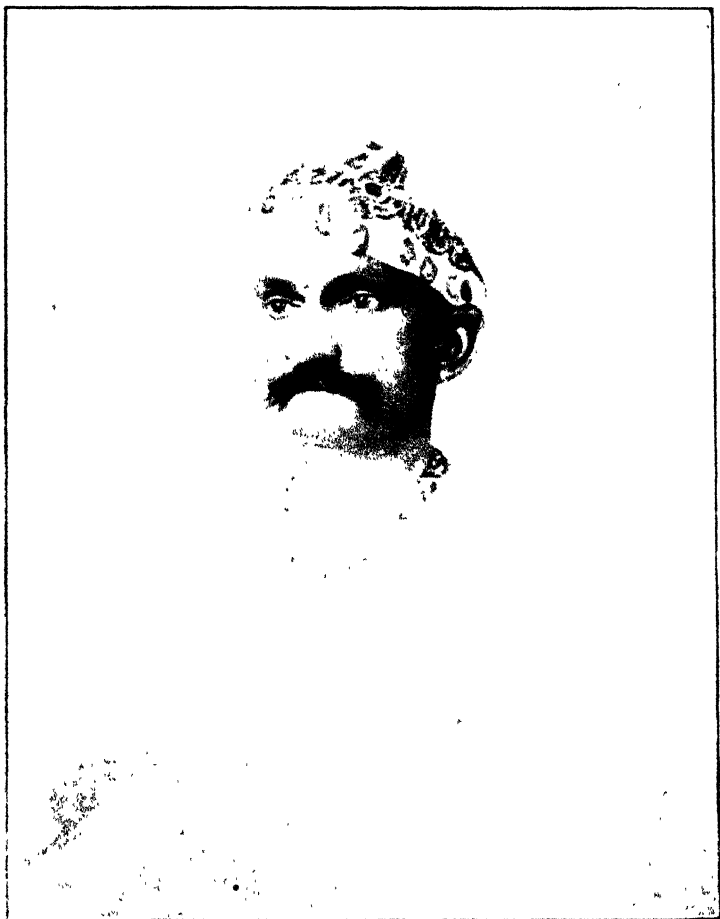
গয়ালী

৺ ছোট্টুলাল সেজওয়ার সি, আই, ই।

বৃক্ষরাজি

হন। এই মন্দির প্রাঙ্গণে অনেক দেবমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দির।

গয়া হইতে ১৪ মাইল দূরে কোচ নামে একটি সহর আছে। সেখানে চারিকোণবিশিষ্ট একটি শিবমন্দির দৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি এই যে, কোল নৃপতিরা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মুসলমান বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই দেশে কোলেরা রাজত্ব করিতেন। এখানে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আছে।

কোচ।

গয়া সহরের দক্ষিণে এই পাহাড় অবস্থিত। এই পাহাড়ের উপরে ক্ষুদ্র একটি মন্দিরে সাবিত্রী গায়ত্রী ও সরস্বতী প্রভৃতি ব্রহ্মশক্তির মূর্ত্তি আছে। সম্ভবতঃ ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে এই মূর্ত্তিত্রয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানে 'ব্রহ্মযোনি' নামে এক গুহা আছে। হিন্দুর

ব্রহ্মযোনি। *

* Respecting the hills near Gaya, and commencing with the little cluster near Pretsila, and part of this wing nearest the centre, the highest and sacred peak,

বিশ্বাস এই গুহায় প্রবেশ করিয়া বাহির হইয়া আসিলে পুনর্জন্ম হয় না। সমতলভূমি হইতে এই

---

although almost a mere rock, is not near so rugged as if it had been composed of proper granite ; and in fact, although it is an aggregate rock the greater part of it has much the appearance of a siliceous dark-coloured hornstone, in which are disseminated small fragments of felspar. In other places, again, the granulations are more distinct, and white quartz, a black powdery matter and felspar are evidently the component parts. The small peaks at the bottom of the hill are clearly granite, although not good, and are vastly more rugged than the principal hill. The large hummock of Kewanipur at the south side of this cluster, consists of a very strange stone, which has a good deal of the conchoidal fracture, and is exceedingly difficult to break. It has no appearance of strata, and consists of fine grains variously coloured, and the colours in general disposed in patches like many jaspers, to which on the whole it has the greatest affinity. Some parts are of a blackish grey, with black dots intermixed; others consist of white and blackish grains, and others with the black are composed of grains which are rust coloured. In some parts the black grains are pretty equally disseminated ; in others they are conglomerated into irregular spots.

পাহাড়ের উচ্চতা ৪৫০ ফিট্। পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে যাত্রীদের আরোহণের সুবিধার জন্য মহারাষ্ট্র

---

The rock of Ramsila very much resembles that of Pretsila, being somewhat intermediate between granite and hornstone. It consists of three substances, one black and powdery, another greyish and splintery, and a third shining like felspar ; but the hill is not near so rugged as those of granite, and the rock, like hornstone, is divided into cuboidal masses by fissures vertical and horizontal. The hill, at the east end of which the town of Gaya is situated, consists of various peaks and hummocks, composed of many different rocks very strangely intermixed. The view which I could take of it was superficial ; but I have seen no place, an accurate study of which seems more likely to throw light on the various forms which, what are called primitive rocks, have assumed. The greater part consists of an imperfect granite, inclining more or less in its appearance to hornstone, like that of the hills to the north just now described. In some places this would appear to have been impregnated with hornblende, as it is very dark in colour and exceedingly difficult to break. In some places, again, that which has in most respects a very strong resemblance to hornstone, contains many small black and shining dots, as if it were a very fine grained imperfect granite.

দেবরাও ভাও সাহেব এক সিঁড়ি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এই পাহাড়ের একস্থানে বসিয়া ব্রহ্মা

---

In others, again, both imperfect granite and hornstone have degenerated into a kind of sand-stone, the former spotted, the latter of an uniform white. It must however be observed, that at the east end of the hill there are large solid rocks of a perfect grey granite: immersed in one of these at Bhimgaya, is a large mass of siliceous hornstone, the two substances being in every part perfectly contiguous. In other parts of these hills there are large rocks of quartz, white glassy, etc. The most remarkable is a hummock, west from Brahmayoni, the masses of which have, in decay, the appearance of vertical strata; they are partly red, partly white, with a few greenish portions, and, it is said, may be cut into seals. Perhaps they may approach in their nature to cornelian, as they have a greasy appearance and admit of a polish; but all that I saw was full of rents. West from thence, the imperfect granite and hornstone is decaying in vertical schistose masses; but whereever the rock is entire, there is not the slightest appearance of stratified matter or arrangement. At the small hill called Katari, a little west from the above, is a quarry of indurated reddle (Geru), reckoned of a good quality, and used to stain the clothes of the Sannyasis, as well as a paint. Various

গো-দান করিয়াছিলেন। পর্ব্বতগাত্রে অসংখ্য গো-পদ-চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। অপর স্থানে তৃতীয় পাণ্ডব ভীমসেন পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার জঙ্ঘার চিহ্ন পাণ্ডাগণ আজিও দেখাইয়া থাকেন।

রামশিলা।

গয়া সহরের উত্তরে এই পাহাড়। জনপ্রবাদ শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে সীতাদেবীর সহিত এই গিরি-জাত নদীতে অবগাহন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ইহার নাম 'রাম-শিলা' হইয়াছে। ইহার উচ্চতা ৩৭২ ফিট্। এখানে পাতালেশ্বর মহাদেব লিঙ্গ স্থাপিত আছেন। মন্দি-রের উপরিভাগ আধুনিক, কিন্তু নিম্নাংশ ১০১৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। টিকারীরাজ রণ বাহাদুর এই পাহাড়ে উঠিবার সিঁড়ি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

প্রেতশিলার উচ্চতা ৫৪০ ফিট্। গয়া সহরের উত্তর-

---

other pursuits prevented me from visiting this place. *Eastern India.*

পশ্চিমে ৫ মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। এখানে একটি মন্দির আছে, উহা ধর্ম্মরাজ যমের নামে উৎসর্গীকৃত। যাত্রিগণ এখানে আসিয়া শ্রাদ্ধাদি করেন। মন্দিরাভ্যন্তরে একখানি প্রস্তরে পিণ্ডদান করিতে হয়। কলিকাতাবাসী হিন্দু-গণ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে এই পাহাড়ে উঠিবার জন্য সিঁড়ি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পাহাড়ের পাদদেশে সতী, নিগ্র ও সুখ এই তিনটি ও পাহাড়ের উপর যম-মন্দিরের নিকট রামকুণ্ড নামে আর একটি কুণ্ড আছে। কথিত আছে রামচন্দ্র শেষোক্ত কুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন। আশ্বিন মাসে এখানে বহুলোকের সমাগম হয়। 'ধামিন' পুরোহিতগণ এখানে কাজ করাইয়া থাকেন। গয়ালী ও ধামিন ব্রাহ্মণে কোন-ই সম্বন্ধ নাই। প্রেতশিলায় কাজ করিয়া যাত্রিগণ যাহা দেন তাহার তিন ভাগ ধামিনেরা পান ও বাকী একভাগ গয়ালীরা পাইয়া থাকেন। এই পাহাড়ের পাদদেশে অনেক গোলাকার প্রস্তর দৃষ্ট হয়; জনশ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে এই প্রস্তর-

প্রেতশিলা।
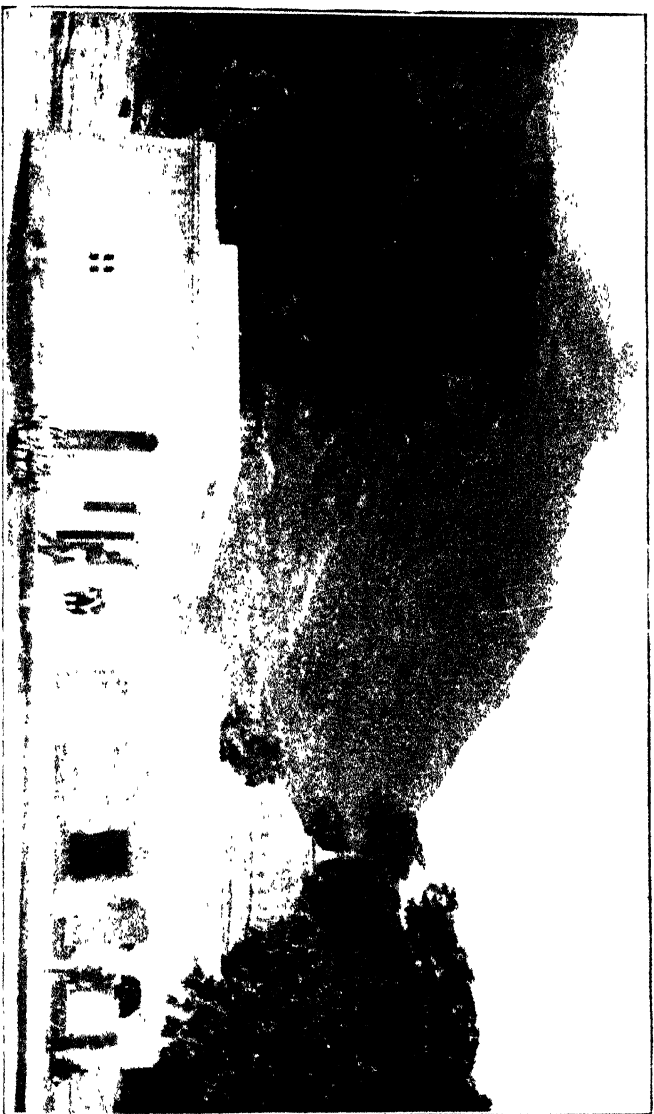
প্রেতশিলা।

গুলি কোলদের আনীত; এবং তাহাদের হাতে কাটা বলিয়া অনেক প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও মিশনরী সাহেবেরা মনে করেন পূর্ব্বে এই পাহাড়ে কোলেরা অপদেবতা ও পূর্ব্ব পুরুষদের পূজা করিত। †

যাত্রিগণ দক্ষিণমুখী হইয়া প্রেতশিলার শ্রাদ্ধাদি করেন। ছাতু এবং তিল সংযোগে পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহা ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে হয়। এখানে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিলে আত্মার প্রেতত্ব দূর হইয়া পিতৃগণ স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হন।

---

† 'The existence of some rude stone circles near the foot of the hill, which are traditionally ascribed to the Kols, at least lends colour to the belief that it was once a centre of their Worship.'

*L. S. S. O'Malley.*

# গয়ালী।

গয়ার পাণ্ডাদের কথা সকলেই জানেন, ইহা-দিগকে 'গয়ালী' বা 'গয়াপাল' বলা হয়। গয়ালীরা জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইহাঁরা গয়াশ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের মন্ত্র পাঠ করান। গয়াতীর্থ করিতে যত যাত্রী আসে তাহারা সকলেই কোন না কোন পাণ্ডার আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাতে গয়ালীদের বেশ উপার্জ্জন হয়। গয়ালী ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বায়ুপুরাণে লিখিত আছে, —ব্রহ্মা গয়াসুরকে নিশ্চল রাখিবার জন্য গদাধর-দেবকে গয়া-তীর্থে স্থাপন করিয়া এক যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এই সময়ে তিনি অমৃত, শৌনক, যাজলি, মৃদু, কুমুথি, বেদ প্রভৃতি বহুসংখ্যক ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ চতুর্দ্দশ গোত্রে বিভক্ত করেন। যজ্ঞশেষে তিনি পূর্ণাহুতি দিয়া

অবতরণিকা।

ঋত্বিক্‌দিগকে দুগ্ধপ্রবাহ মহানদী, মধুস্রবা মধুনদী, সুবর্ণ-দীর্ঘিকা ও বহুবিধ অন্নপর্ব্বত দান করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা কখনও স্থানান্তরে শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু কালক্রমে ইহাঁরা 'ধর্ম্মারণ্য' নামক স্থানে ধর্ম্মকে যজ্ঞ করাইয়া সেই ধর্ম্মযজ্ঞে লোভহেতু ধনাদি গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ দেন। অভিশাপের ফলে অন্নাদির পাহাড়গুলি পাষাণময় এবং দুগ্ধ ও মধুপূর্ণ নদী জল হইয়া যায়। হতভাগ্য ব্রাহ্মণেরা তখন ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। ব্রহ্মা দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন,—"যদিও তোমরা দুগ্ধপ্রবাহ নদী ও অন্নের পাহাড় হারাইয়াছ, তথাপি আমার বরে তোমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের কোনই অসুবিধা হইবে না। নিয়ত গয়াশ্রাদ্ধে পুণ্যবান্ লোকেরা তোমাদিগকে পূজা-ভক্তি ও অর্ঘদান করিবে।" ইহাই হইল প্রজা-পতি ব্রহ্মা প্রকল্পিত গয়ালী ব্রাহ্মণের উৎপত্তির ইতিহাস। গয়ালী ব্যতীত গয়াশ্রাদ্ধ হইতে পারে

না, গয়ালী ভিন্ন অপর কেহ অক্ষয়বট মূলে 'সুফল' দিতে পারেন না। 'সুফল' না বলিলে হিন্দুর বিশ্বাস মৃত পিতৃগণের মুক্তিলাভ হয় না। এই সকল কারণে ব্রাহ্মণ সমাজে গয়ালীর অত্যন্ত সম্মান।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনা সময়ে গয়ার মাজিষ্ট্রেট্ ইঁহাদিগকে পঞ্চগৌড়, পঞ্চ দ্রাবিড় এবং শাকদ্বীপ পর্য্যায়ে বিভক্ত করেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহাঁদের বংশ অতি দ্রুতবেগে লোপ পাইতেছে। প্রথমে ইহাঁরা ১৪৮৪ ঘর ছিলেন। ডাক্তার বুকানন হ্যামিলটনের সময়ে ইহাঁরা এক হাজার ঘর ছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ছোটলাট সাহেবের আগমনোপলক্ষে ইহাঁদের গণনা হয়। তখন ইহাঁরা ১২৮ ঘর ছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনায় পুরুষ ১৬৮ ও স্ত্রীলোক ১৫৩ জন ছিল। এই লোক হ্রাসের প্রধান কারণ বিবাহ সমস্যা। ইহাঁদের মধ্যে বিবাহযোগ্য কন্যার সংখ্যা অতি অল্প। বিপত্নীকদের বিবাহ প্রায়ই হয় না। ধীরে ধীরে পুরাতন পরিবারগুলি লোপ পাইয়া

আসিতেছে। অনেক গৃহে এমনও দেখা যায় যে সেখানে কেবলি স্ত্রীলোক, পরিবারে একটিও পুরুষ নাই।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গয়ালী ব্রাহ্মণ-পত্নীরা বর্ত্তমান সময়ের মত এতটা অবরোধবাসিনী ছিলেন না। এখন তাঁহারা কেবল মাত্র স্ত্রী-যাত্রীদের নিকট হইতে নিজ গৃহে পাদপূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। অবরোধবাসিনী বলিয়া তাঁহারা অক্ষয়বট মূলে যাইতে পারেন না। অক্ষয়বট মূল হইতে পূজা গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহারা দত্তক গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ পঞ্চম বর্ষীয় শিশুকেই দত্তকরূপে গ্রহণ করা হয়। সময় সময় ইহাঁরা বয়স্থ ব্যক্তিকেও দত্তক স্বরূপ গ্রহণ করেন। গয়ালীদের বার্ষিক আয় দুই কি তিন শত টাকা হইতে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত হয়। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক গয়ালীরই বিশ হাজার টাকা বার্ষিক আয় হইয়া থাকে।

গয়ালীরা যজুর্ব্বেদী। পুত্র সন্তান জন্মিলে

যজুর্ব্বেদ মতে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করা হয়। এই শ্রাদ্ধ-ক্রিয়ার উপকরণ মাতামহ সংগ্রহ করিয়া দেন। জন্মের ষষ্ঠ রাত্রিতে ষষ্ঠীপূজা হয়। পুত্র সন্তান জন্মিলে বিংশ দিবসে ও কন্যা সন্তান জন্মিলে দ্বাদশ দিবসে প্রসূতির অশৌচান্ত-স্নান করা বিধি।

জন্মোৎসব।

দেবগ্রামস্থিত সূর্য্যমন্দিরে শিশুর চূড়াকরণ অথবা মুণ্ডন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যজ্ঞোপবীত সংস্কার সাধারণতঃ বৈদ্যনাথ মন্দিরে, সময় বিশেষে কোনও শিবমন্দিরে অথবা নিজ গৃহে অনুষ্ঠিত হয়।

চূড়াকরণ।

বল্লালসেন প্রতিষ্ঠিত কৌলীন্যপ্রথা এখানে প্রচলিত নাই। কিন্তু সগোত্রে বিবাহ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। গয়ালীরা চতুর্দ্দশ গোত্রে বিভক্ত যথা, গৌতম, কাশ্যপ, কৌৎস, কৌশিক, কৌণ্ডিন্য, ভরদ্বাজ, ঐষুৎ, বাৎস্য, পরাশর, হারীতকুমার, বাশিষ্ঠ, মাণ্ডব্য, গোলখ্য ও আত্রেয়। ইহাঁদের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্র নাই। সাধারণতঃ

বিবাহ।

পুরুষের সপ্তদশ হইতে উনবিংশ বৎসর বয়সে ও কন্যার তিন হইতে নবম বৎসর বয়সে বিবাহ হয়।

গয়ালী ব্রাহ্মণের বিবাহে নিম্নলিখিত আচার অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য।

(১) 'দেখাউনি'—বরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটি শুভ দিন নির্দ্দিস্ট করা হয়। কন্যাগৃহ হইতে কয়েকটি বালক-বালিকা বরের গৃহে যাইয়া 'বরণের' তারিখ বলিয়া আসে। এই সংবাদ পাইয়া বর-যাত্রীরা বাদ্যভাণ্ডসহ শোভাযাত্রা করিয়া কন্যার গৃহে গমন করেন এবং সেখানে তাঁহারা ফুলশয্যার প্রথানুসারে অভ্যর্থিত হন। কন্যার আত্মীয়-স্বজন বরকে চিনির মঠ ও মিষ্টান্ন এবং কন্যার পিতা (পিতার অভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) নারিকেলের উপর একটি সুবর্ণ মুদ্রা স্থাপন করিয়া পাগড়ী, শাল, জামা, গরদের ধুতি ও চাদর এবং পুরুষের ব্যবহারযোগ্য অলঙ্কার নির্ব্বাচিত বরকে উপহার দেন। বর ও বরযাত্রীর অভ্যর্থনা শেষ হইলে বরপক্ষ নববধূকে ক্রোড়ে করিয়া কতকগুলি চিনির মঠ ও মিষ্টান্ন

উপহার দিয়া থাকেন। অতঃপর বরপক্ষীয় স্ত্রীলোকেরা দলবলসহ কন্যার গৃহে গমন করিয়া তথায় নির্ব্বাচিত কন্যার আঁচলে প্রায় পাঁচ সের মিষ্টান্ন ঢালিয়া আবাহন-গীতি গাইতে থাকেন। অবশেষে কন্যার মাতা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনসহ বরের মাতা ও পিতামহীকে ( যদি তিনি জীবিত থাকেন ) রেশমের সাড়ী উপহার দেন এবং মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া এই ক্রিয়ার শেষ হয়।

(২) কন্যার প্রথম অভ্যর্থনা দিনে বরপক্ষের আত্মীয়-স্বজন শোভাযাত্রা বাহির করিয়া জাকজমকের সহিত নিম্নলিখিত জিনিষগুলি সঙ্গে লইয়া কন্যার গৃহে গমন করেন। কাগজ ও কাচের নানাবিধ খেলনা, কাচ ও পিতলের বাসনপত্র, উড়নী, জামা ও পিতাম্বরী সাড়ী, শাখার বালা ও চূড়ি, দধি, মাছ ও মিষ্টান্ন। বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অলঙ্কারগুলি কন্যার গায়ে পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া 'লক্ষ্মী' সম্বোধনে প্রণাম করেন। অল্প কিছু পর বরপক্ষ কন্যার পিতা, পিতামহ ও মাতামহকে ( যদি জীবিত

থাকেন) রেশমের পাগড়ী, চাপকান, কিংখাপের পাজামা, পাদুকা প্রভৃতি উপহার দিয়া বরগৃহে ফিরিয়া যান।

(৩) বর ও কন্যাপক্ষ প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহে গৃহ-দেবতার পূজা করেন। এই সময়ে একটি খুঁটি পুতিয়া 'অধিবাসের' স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়।

(৪) 'দুয়ারলাগা'—বরের আত্মীয়াগণ বরকে কন্যাগৃহের দরজায় লইয়া যান। তথায় বাদ্যকেরা কন্যার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পরিহাস ও কৌতুক করিয়া গান গায় ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করে। ইহার অনুরূপ ক্রিয়া কন্যাপক্ষের স্ত্রীলোকেরাও বরগৃহে অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

(৫) বসুধারা (ঘৃতধারা) ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ—বিহারে 'বসুধারার' অন্য নাম 'ঘিউধারী'।

(৬) কঙ্কনবন্ধন—বিষ্ণু-পাদ মন্দিরের নিকট-বর্ত্তী সূর্য্যকুণ্ডে কোনও এক মেছুনীকে উৎকৃষ্ট কতকগুলি জিনিষ উপহার দেওয়া হয়। এই ক্রিয়া শেষে বরের আত্মীয়-স্বজন কন্যাগৃহে গমন করিয়া

খাদ্যদ্রব্য ছড়াইয়া দিয়া আসেন এবং পরিশেষে মঙ্গল-সূচক কতকগুলি জিনিষ কন্যাকে পাঠাইয়া দেন।

উপরোক্ত প্রাথমিক ক্রিয়াগুলি শেষ হইলে পাল্কীতে চড়িয়া বর শোভাযাত্রা করিয়া বাহির হন। গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত সদর দরজায় পৌঁছিতেই বরের ভগ্নী, খুড়ী, পিসিমা প্রভৃতি রমণীরা পাল্কীর গমনপথে বাধা দেন। বর স্বয়ং স্বর্ণমুদ্রা দিয়া অব্যাহতি পান। ইহার পর বর কন্যা-গৃহে পৌঁছিলে পুণ্যজল, অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা অভ্যর্থিত হন; এবং তথায় তাঁহাকে কলা-তলায় গমন করিয়া পঞ্চদেবতা, দশদিক্‌পাল, নব-গ্রহ, গণেশ ও গৃহদেবতার পূজা করিতে হয়। এই কাজ শেষ হইলেই ব্রাহ্মণগণ মঙ্গলস্তোত্র ও বরের মাতামহবংশের কুলজী আবৃত্তি করেন। তারপর কন্যাদান ও কুশণ্ডিকা। বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও নব বর-বধূ হোমানলে লাজ বর্ষণ করিলে বর ও বধূর হস্ত সূত্রে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অবশেষে পরস্পরের অঞ্চলের কোণ বাঁধিয়া বর-বধূ সাতবার হোমানল প্রদক্ষিণ করেন।

হোমানল প্রভৃতি ক্রিয়া শেষ হইলে বরের পিতা কুশাসনে বসিয়া নব বর-বধূ ও কন্যার সাত আট বৎসরের কোন আত্মীয়াকে নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করেন এবং বরের হাতে একটি টাকা, শণপাট ও সিন্দূরপূর্ণ একখানি কাঠের থালা দেন। এই সময়ে বরের হাতের নীচে কন্যার হস্ত ও তাঁহার নীচে অপর বালিকার হস্তখানি স্থাপিত হয়। বর ভাবী গৃহলক্ষ্মীর কপালে পাঁচবার সিন্দূরের টিপ পরাইয়া দেন। তারপর নানাবিধ কৌতুকাবহ খেলা আরম্ভ হয়। বরকে ঠকাইয়া আমোদ উপভোগ করাই এই খেলার উদ্দেশ্য। পরিশেষে কন্যা বরের ঘাড়ে একখানি লাঙ্গল চাপাইয়া দিয়া বলে 'তোমাকে আমার ভার বহন করিতে হইবে। আমি অপরাধ করিলেও তোমাকে আমার গৃহে-ই আসিতে হইবে।' ক্রিয়া শেষে বর-বধূ ও অন্যান্য লোকজনকে দধি চিড়া খাইতে দেওয়া হয়। মাঙ্গলিক ক্রিয়ার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত গৃহে স্ত্রীলোকেরা গান গাহিয়া থাকেন।

যৌতুক—ঘোড়া, গাড়ী, পাল্কী, অলঙ্কার ও পণ

ব্যতীত বরকে সাধারণতঃ একটি স্বর্ণমুদ্রা, একটি টাকা ও একটি পয়সা যৌতুকস্বরূপ দেওয়া হয়। বিদায়ের পূর্ব্বে কন্যার পিতা মেয়ের আঁচলে ধান ও অন্যান্য জিনিষ পূর্ণ করিয়া তাহাকে বৈবাহিকের ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বলেন,'আমি আপনাকে হাতী-ঘোড়া দিতে অক্ষম, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে আপনাকে একটি কর্ম্মপটু বালিকা দান করিতেছি।' অবশেষে বর-বধূ অপরাপর লোকজনসহ বিষ্ণু-পাদ মন্দিরে গমন করিয়া তথায় দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন এবং তথা হইতে নিজগৃহে চলিয়া যান।

বিবাহ সংস্কারের অব্যবহিত পরই অন্যান্য কতকগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিধি আছে। তন্মধ্যে 'বৌধারী' ক্রিয়া প্রথমে করিতে হয়। এই সময়ে বরের পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বালিকার মুখে হলুদ লেপন করিয়া নিজ নিজ অবস্থানুসারে কিছু অর্থ দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। এই ক্রিয়ার পর বধূকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বধূর পিতৃগৃহ গমনের চারিদিন পর বর শ্বশুরগৃহে যাইয়া হাতের

সূতা ছিঁড়িয়া ফেলেন এবং স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া আসেন। বিবাহের একাদশ দিবসে বর বধূসহ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অল্প কিছুকাল পর বধূকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং বয়স্থা না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যা পিতৃগৃহে থাকেন। ঋতুমতী হইলে তাঁহার শ্বশুর বধূর জন্য অলঙ্কার ও গায়ের জামা উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া দেন।

মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া।

১। রাত্রি ১২টার পর মৃত্যু হইলে শবদেহ পরবর্ত্তী দিবসে ঊষাগমের পূর্ব্বে দাহ করিবার জন্য শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হয় না। কিন্তু ১২টার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে সেই রাত্রেই দাহের ব্যবস্থা করিতে হয়।

২। দশদিনের মরণাশৌচগ্রহণ মৃত্যু সময় হইতে গণনা না করিয়া দাহ সময় হইতে ধরা হয়।

৩। সৎকার সময়ে 'কণ্টাহার' (কটাহা) ব্রাহ্মণ-গণ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। গয়ালী সমাজে ইহাঁদের স্থান বাংলার মহাব্রাহ্মণ বা অগ্রদানি-ব্রাহ্মণের ন্যায়।

৪। চতুর্থ দিবসে বিষ্ণুপাদপদ্মের পুণ্যোদক, দধি ও গঙ্গাজল একত্র মিশাইয়া শ্মশানাগ্নি নির্ব্বাপিত করা হয়। চিতা হইতে পাঁচখানা হাড় তুলিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ 'বাচস্পতি মিশ্র' মতে উহা হরিদ্বার, বারাণসী, প্রয়াগ অথবা ফতুয়ার নিকটবর্ত্তী গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করেন। অসমর্থ পক্ষে পুনপুন্ নদীতেই অস্থি বিসর্জ্জন দেওয়া যায়।

৫। শবদাহ দিন হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত চিতার উপর একটি পিপুল গাছে জলপূর্ণ একটি মাটীর ঘট ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। দশম দিবসে স্নান ও ক্ষৌর কর্ম্ম হইলেই অশৌচের শেষ হয়।

বাংলার অনুকরণে একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কণ্টাহার ব্রাহ্মণদিগকে গো-দানের ব্যবস্থা আছে। মৃত্যুর দ্বাদশ দিবসে চিতাভূমির পিপুল গাছে ৩৬০ ঘট জল ঢালা হয়। ইহার পর দান; দানের জিনিষগুলি সাধারণতঃ রৌপ্য ও পিতল নির্ম্মিত দিতে হয়। আত্মার সদগতির জন্য নগদ

শ্রাদ্ধ।

টাকাসহ থাল, ঘটী, গ্লাস, রূপার আংটী, প্রদীপ, একখান ধুতি, পাদুকা, ছত্র, আসন ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির জামাতা, দৌহিত্র এবং ভগ্নীপতিকে দান করা হয়। দানের পর নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের ভোজনের 'দীয়তাং, ভুজ্যতাং' রবে শ্রাদ্ধগৃহ মুখরিত হইয়া উঠে।

মৃত্যুর পর এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসে বিষ্ণুপাদ মন্দিরে মৃতব্যক্তির আত্মার মঙ্গলের জন্য শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এবং বৎসরান্তে ধূমধামের সহিত বাৎসরিক শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। এই সময়ে দানের জিনিষগুলি আদ্যশ্রাদ্ধের মত জামাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনই পাইয়া থাকেন।

গয়ালীরা বৈষ্ণব। পুরাতন গয়া সহরে কেহই মাংস খাইতে অথবা মদ্য পান করিতে পারে না।

ধর্ম্মভাব ও নৈতিক জীবন।

অবশ্য তামাক, গাঁজা অথবা ভাঙ খাইতে কোন বাধা নাই। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন এবং সকলেই নির্ব্বিবাদে বিষ্ণু-পাদ

মন্দিরে দেবার্চ্চনার জন্য যাইতে পারেন। 'ভাইস' শ্রেণীর লোকগণ রাত্রে বিষ্ণুর অঙ্গরাগ ও সাজ-সজ্জা সম্পাদনের একমাত্র অধিকারী।

গয়ালীরা সাধারণতঃ কোন প্রকার চাকরী করেন না। যাত্রী হইতে যাহা পান তাহাতেই তাঁহারা সংসার চালান। তবে বর্ত্তমান সময়ে গয়ালীদের মধ্যে অনেক জমিদার ও উত্তমর্ণ আছেন।

প্রায় অধিকাংশ গয়ালীই এক জাতীয় পাখী পুষিয়া থাকেন। তাঁহারা গান ও বাদ্যে অনেক সময় অতিবাহিত করেন। মোটের উপর তাঁহাদের জীবন বেশ স্বচ্ছল এবং বিলাসিতায় পরিপূর্ণ।

গয়ালীদের মধ্যে ভাল ভাল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও আছেন। পরলোকগত ছোট্টুলাল সেজওয়ারের সুনাম ও প্রতিপত্তি অনেকের নিকটই সুপরিচিত। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইনি লেখাপড়ায় খুব অভিজ্ঞ ছিলেন না বটে, কিন্তু ইহাঁর সরল হৃদয়, বদান্যতা ও

জন-হিতকর কার্য্যে উৎসাহ ইহাঁকে বিহার প্রদেশে চিরপরিচিত করিয়া রাখিয়াছে।

গয়ালীরা * নিজ সমাজের লোক ভিন্ন অপর কাহারও গৃহে ভোজন করেন না। তবে যজমান

---

* 'পূর্ব্বে ব্রহ্মকল্পিত গয়াপাল বা গাওয়াল ব্রাহ্মণেরাই গয়া-শ্রাদ্ধে পৌরহিত্য করিতেন। কালক্রমে তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা ও ক্রিয়াকর্ম্মে নৈপুণ্য হ্রাস হয়। এক সময় কাশ্মীর হইতে এক রাজা পুরোহিত, মন্ত্রী ও সৈন্যাদি সহ গয়াশ্রাদ্ধ করিতে আগমন করেন। রাজার দুইটি পুরোহিতের শাস্ত্রজ্ঞান ক্রিয়ানৈপুণ্য এবং বেদ ও জ্যোতিঃ শাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার দেখিয়া সুফলদানের সময় গয়াপাল, ধনরত্নের পরিবর্ত্তে ঐ দুইটি ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন। রাজা মহাসমস্যায় পতিত হন। অবশেষে গয়াপালের নির্ব্বন্ধে ব্রাহ্মণদ্বয়কে গয়াক্ষেত্রে বাস করিতে অনুরোধ করেন। ব্রাহ্মণেরা বলেন 'আমরা দুই ঘরমাত্র বাস করিতে পারিব না। গয়াপাল-গণ যদি দ্বাদশ ঘর ব্রাহ্মণের অন্নের সংস্থান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা বাস করিতে পারি।' গয়াপালেরা তাহাতেই স্বীকৃত হন। ব্রাহ্মণেরা কাশ্মীরে গিয়া আর দশ ঘর ব্রাহ্মণের সহিত সপরিবারে রাজার সৈন্য কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গয়ায় আগমন করেন এবং গয়াপাল ও সমাগত তীর্থযাত্রীদের পৌরহিত্য স্বীকার করেন। কালক্রমে বংশবৃদ্ধি হওয়ায় সমস্ত বিহারে ও বাঙ্গালায়

নিমন্ত্রণ করিলে অক্ষয়বট অথবা বিষ্ণু-পাদ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী কোনও নির্দ্দিষ্ট পুণ্যস্থানে লুচি ও মিষ্টান্ন আহার করেন। স্ত্রীলোকেরা নির্ধন হইলেও কখনও রূপার অলঙ্কার শরীরের ঊর্দ্ধভাগে ব্যবহার করেন না। দেবদর্শনের জন্য পুরাতন গয়ায় সর্ব্বত্রে পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইবার জন্য অধিকারটুকু স্ত্রীলোক-

---

ছড়াইয়া পড়েন। বিহারে পল্লীগ্রামে ইহাঁদিগকে 'গৌঞা-পাণ্ডে' অর্থাৎ গ্রামপুরোহিত বলে। যাঁহারা গয়াশ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়ান এবং যাত্রীদের আনয়ন কিংবা শ্রাদ্ধাদির আয়োজন করিয়া দেন, তাঁহারা সাধারণতঃ 'আচার্য্য' নামে খ্যাত। কিন্তু যাঁহারা ঐ কার্য্য করেন না তাঁহারা পাণ্ডে, মিশ্র, উপাধ্যায়, পাঠক প্রভৃতি কুলোপাধি ধারণ করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অনেকে জ্যোতিষশাস্ত্রে কৃতী ও পঞ্জিকাকার ছিলেন! কাশ্মীরে যে সকল জ্যোষী ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশের পৌরহিত্য ও জন্মপত্রিকা নির্ম্মাণ একমাত্র উপজীবিকা। ইহা দ্বারা কাশ্মীরের জ্যোষি-ব্রাহ্মণগণের সহিত গয়া প্রদেশের জ্যোষি-ব্রাহ্মণের অভিন্নত্ব সূচিত হইতেছে। বিহারে এখনও লক্ষাধিক জ্যোষী ব্রাহ্মণের বাস আছে। জ্যোষী ব্রাহ্মণগণ বলেন 'যখন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা গয়াক্ষেত্রে আগমন করেন, তখন বোধিসত্ত্বজী প্রকট হন নাই।' প্রকৃতিবাদ অভিধান।

দিগকে দেওয়া হয়। কিন্তু পুণ্য গয়ার বাহিরে যাইতে হইলে গাড়ী অথবা পাল্কীর প্রয়োজন *।

---

* গয়ালীদের সম্বন্ধে মিঃ মার্টিন ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লিখিত 'Eastern India' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

The Gayawals—The Gayawals are very numerous. None of them have any learning, so that they are unable to read the necessary forms of prayer, and for that purpose employ Brahmans of Sakadwip, Kanouj, and Srotryas, who are called Acharyas, are allowed a very slender pittance, and are severely exercised. A Gayawal who has much employment requires the assistance of three or four Acharyas, while one of these readers serve for 3 or 4 of the Gayawalas who are little employed. Formerly there was a constant and miserable scramble among the Gayawals for customers, and the first who could lay his hands on a votary considered him as his property ; but of late an order has been issued that the votary should be allowed to select whatever Gayawal he pleases, which has tended very much to produce peace, although there is no possible measure of avoiding numerous squabbles.

The Dhamins, who give one-fourth of their profits to the Gayawals, and who receive fewer and less valuable presents, have been under the necessity of applying more to study, and being unable to hire

readers, are themselves able to read the ceremonies ; but none of them attempt any other science. Each man officiates by turns at the different temples belonging to the order, and takes his chance of the profits that occur in his turn of duty.

The influence of both depends entirely upon the power they are supposed to possess by birth, the whole efficacy of the ceremony depending on their pronouncing it duly performed. On this occasion even the most learned pandit or greatest prince, when he makes his offering, must bend down and receive on his head the foot of a Gayawal.

* * * * * *

A Gayawal man cannot marry a second wife, even if his first wife has died, unless he can find a single girl whose father has died, but this very seldom happens, as the girls are married very young ; and unless the orphan is exceedingly poor she will not accept of a widower for her husband. Their marriages are intolerably expensive. Like the Brahmans of the South they eat neither meat nor fish.

* * *

Most of the Gayawals follow an unmarried sage of the Madhava Sect from the South of India, and the Maharastra Brahmans are their priests.

পরিশিষ্ট

পিণ্ডদান ।

# গদাধরের স্তব।

১

গদাধরং ব্যপগত কথষং গয়াগতং
বিদিতগুণং গুণাতিগং গুহাগতং
গিরিবর-গৌর-গেহগং গণার্চ্চিতং
বরদমহং নমামি।

২

যশঃ শ্রিয়ং ত্রিদশগণাদিহৃশ্রিয়ং
ভবশ্রিয়ং দিতিভবদারণশ্রিয়ং কলিশ্রিয়ং,
কলিমলমর্দ্দনশ্রিয়ং গদাধরং
নৌমিতমাশ্রিতশ্রিয়ং।

৩

দৃঢ়াদ্দৃঢ়ং পরিদৃঢ়গাঢ়সংস্তুতং
কামাদ্ভুতং সুদৃঢ়মরূঢ়িরূঢ়িগং তমাহৃগং,
দৃঢ়হরিভাস্ত ঢৌকিতং স্বঢৌকৃতং
দৃঢ়তরগোত্রমূর্ত্তিভং।

৪

বিদেহগং কারণকলাবিবর্জ্জিতং
বিজন্মকং দিনকর বেদি মূষিতং গদাধরং,
ধ্বনি মুখবর্জ্জিতন্তং পরং নমাম্যহং
সততমনাদিমীশ্বরং হরিং।

৫

মনোতিগং মতিগতিবর্জ্জিতং পরং
গদাধরং স্তুতি শিরসি সম্ভতং বুধৈঃ।
চিদাত্মকং কলিগতকারণাতিগং
গদাধরং হৃদয়গতং নমামি তং॥

# গয়াকৃত্য।

গয়াশ্রাদ্ধে পুত্র পৌত্র এবং প্রপৌত্র প্রধান অধিকারী। নরকভয়েভীত পিতৃগণ মুক্তিরজন্য পুত্রের আকাজ্ক্ষা করেন এবং গয়াগত পুত্রকে দেখিয়া তাঁহারা আনন্দিত মনে বলিয়া থাকেন,—

পুত্রের কর্ত্তব্য।

'পদ্ভ্যামপি জলং স্পৃষ্ট্বা সোঽস্মভ্যং কিং ন প্রদাস্যতি' 'ইহারা পদদ্বারাও কি জলস্পর্শ করিয়া আমাদিগের উদ্দেশে প্রদান করিবে না?' যে সুপুত্র গয়াতীর্থে বিষ্ণু-পাদপদ্মে পিতৃলোকের মুক্তির জন্য পিণ্ডদান করে, সেই পুত্রদ্বারাই পিতা পুত্রবান্ হন। এই গয়াশ্রাদ্ধে যে কেবল পিতৃগণই মুক্তিলাভ করেন এমত নহে, শ্রাদ্ধাধিকারী পুত্র আয়ু, সন্তান, বিদ্যা, সুখ, স্বর্গ ও মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। গয়াশ্রাদ্ধে সময়বিশেষের বাধাবাধি নিয়ম নাই।

গয়া শ্রাদ্ধের ফল ও অধিকার।

এখানে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সকল সময়েই যাওয়া যায়। শাস্ত্রে আছে,—

গয়ায়াং সর্ব্বকালেষু পিণ্ডং দন্তাদ্বিচক্ষণঃ।
অধিমাসে জন্মদিনে অস্তেচ গুরুশুক্রয়োঃ।
ন ত্যক্তব্যং গয়াশ্রাদ্ধং সিংহস্থেচ বৃহস্পতৌ। *

এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিতে স্ত্রীপুরুষ রোগী বা নীরোগ সকলেই অধিকারী। কেবল যাঁহার পিতা জীবিত তিনি গয়াশ্রাদ্ধ করিবেন না। এসম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি এই যে,

অমায়ানং গয়াশ্রাদ্ধং দক্ষিণামুখভোজনং।
ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাৎ কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ॥ *

কিন্তু ত্রিস্থলী সেতুবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা বলেন, যাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে পিতা জীবিত, সেই ব্যক্তি যদি কর্ম্মোপলক্ষে গয়াতে গমন করে, তবে অন্বষ্টকাশ্রাদ্ধের ন্যায় কেবলমাত্র মাতৃপার্ব্বণ করিবে। সন্ন্যাসীরা সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগী বলিয়া গয়াশ্রাদ্ধে তাঁহাদের অধিকার নাই। তবে তাঁহারা বিষ্ণুপদাদি শ্রাদ্ধস্থানে মাত্র দণ্ড স্পর্শ করিবেন। জনন, মরণ বা রজস্বলা অশৌচ থাকিলে গয়াশ্রাদ্ধ করা যায় না। সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্বে গয়াশ্রাদ্ধ করা যায় না, কারণ গয়াশ্রাদ্ধের পর প্রেতক্রিয়া করা নিষিদ্ধ। অতএব গয়া-শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই 'সপিণ্ডনান্ত প্রেতক্রিয়া' সম্পন্ন করা বিধি।

---

* বায়ুপুরাণ।

কিন্তু যদি প্রসঙ্গতঃ গয়াতে গমন করিতে হয় এবং পুনর্ব্বার গয়ায় আসিবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে পুত্র ভক্তিসহকারে প্রথম বর্ষেও গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারে। স্ত্রীলোকের স্বামী মরিলে দেহাশুদ্ধি থাকিতে স্বামীর গয়াশ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিবার অধিকার নাই। কিন্তু গয়াশ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া যদি দেহাশুদ্ধি থাকিতে পুত্র বা স্ত্রীকে গয়াকার্য্য করিতে হয় তাহা হইলে 'মাসিকাদি সপিণ্ডন শ্রাদ্ধ অপকর্ষান্তে পিতা মাতা বা স্বামীর মাত্র গয়াকৃত্য করিতে পারিবে।' * বিষপান, অস্ত্রাঘাত, সর্পাঘাত, জলমজ্জন, প্রভৃতি আকস্মিক কারণে মৃতব্যক্তির গয়াশ্রাদ্ধ সংবৎসরের পর নারায়ণ-বলি করিয়া করিতে হয়। নারায়ণ-বলি-বিধি সম্বন্ধে বায়ুপুরাণের অন্তর্গত 'গয়ামাহাত্ম্যে' লিখিত আছে,—'কোন একটি শুক্লা একাদশীতে সামান্য পূজাপদ্ধতির পর বিষ্ণু, যম এবং বৈবস্বত পূজা করিয়া হৃদয়মধ্যে বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে এবং দক্ষিণ মুখে বসিয়া অপঘাতে মৃতব্যক্তির

---

* 'গয়াশ্রাদ্ধে পিতৃলোক মুক্ত হয়; সুতরাং গয়াশ্রাদ্ধের পর প্রেতক্রিয়া করা যায় না। অতএব গয়াশ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই সপিণ্ডনান্ত প্রেতক্রিয়া সমাধা করিবে।' গয়াকৃত্য-তত্ত্ব।

নাম, গোত্র উচ্চারণ করিয়া কুশের উপরি ঘৃত মধু ও তিল সংযুক্ত দশটি পিণ্ডদান করিবে। পরে ধূপ, দীপ ও ভোজ্য দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া পিণ্ডগুলি নদীর জলে নিক্ষেপ করিবে এবং নিজে উপবাস করিয়া নব সপ্ত অথবা পঞ্চ সংখ্যক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে। পরদিন মধ্যাহ্নে পূর্ব্বদিনের ন্যায় বিষ্ণুপূজা করিয়া পিতৃগণকে হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিতে করিতে তিলাদি সংযুক্ত হবিষ্য দ্বারা পঞ্চ পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া ক্রমে বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব ও যমকে চারিটি পিণ্ডদান করিবে। পরে মনোমধ্যে নাম, গোত্র উল্লেখ করিয়া মৃতব্যক্তিকে স্মরণ ও বিষ্ণুনাম জপ করিয়া শেষ পিণ্ড প্রদান করিবে।'

যে সুপুত্র গয়া উদ্দেশে গৃহ হইতে যাত্রা করেন,—'স্বর্গারোহণ সোপানং পিতৃণাঞ্চ পদে পদে'—তাঁহার প্রতি পাদবিক্ষেপ, তাঁহার ও তাঁহার পিতৃগণের স্বর্গারোহণের সোপানস্বরূপ হইয়া থাকে। যে দিন গয়াযাত্রা করিবে, তাহার

গয়াযাত্রা

পূর্ব্ব পূর্ব্বদিন নিরামিষ ভোজন করিবে। পরদিন উপবাস, মুণ্ডন এবং তৎপরদিন স্নান ও তর্পণ শেষ করিয়া গণেশ ও নবগ্রহের পূজা করিবে। তারপর যথাবিধি পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া তীর্থযাত্রীর বেশে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিবে। গয়াযাত্রা করিয়া যে ব্যক্তি

প্রতিগ্রহত্যাগী, সংযমী, সতত পবিত্র ও অহঙ্কারশূন্য হয়, সে-ই তীর্থফল লাভে সক্ষম হয়। তীর্থযাত্রা অবধি পুনর্ব্বার গৃহ-প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আমিষ ভোজন, স্ত্রীসংসর্গ, প্রতিগ্রহ, কুৎসিত আলাপ ও খট্টাদিতে শয়ন পরিহার এবং সর্ব্বদা সংযতভাবে ভক্তির সহিত শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করিতে হয়। এই সময়ে ছত্র ও পাদুকা বর্জ্জন করিবে। *

**উপকরণ সংগ্রহ।**

গয়াশ্রাদ্ধের উপাদানগুলি পূর্ব্বেই সংগ্রহ করা উচিত। প্রত্যেকেরই মনে রাখা উচিত গয়াযাত্রার প্রধান উদ্দেশ্যই বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান দ্বারা পিতৃগণের উদ্ধার করা। যদি বিহিত দ্রব্যাদি দ্বারা যথাবিধি ক্রিয়া না করা যায় তবে কখনই পিতৃগণের পারত্রিক উপকার হয় না। এই সব অসুবিধা নিরাকরণের জন্য সুপুত্র প্রথমেই নিম্নলিখিত জিনিষগুলি সংগ্রহ করিয়া লইবেন, যথা—গব্যঘৃত, বিশুদ্ধ মধু, কৃষ্ণ তিল, যব ও তণ্ডুলচূর্ণ, সুপারি ও চরণপূজার জন্য নারিকেল।

গয়ায় উপস্থিত হইয়া সেই দিবসেই ফল্গুনদীতে স্নান

---

* পিণ্ডদানের পূর্ব্বে পুত্র শুদ্ধাচার, সংযম, নিষ্ঠা, নিবৃত্তি আদির দ্বারা নিজকে বিশুদ্ধ শক্তিশালী করিবেন। কারণ 'মানসিক সত্ত্বময়ী শক্তি ও সিদ্ধ বেদমন্ত্রানুগত প্রভাবের বলে মহামূর্চ্ছাপ্রাপ্ত সূক্ষ্ম শরীরগত প্রেতাত্মা জাগরিত' হন।

করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান ও উত্তরীয় ধারণ করিবে। প্রতি দিন শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের পর বস্ত্র দুই খানা ধুইয়া দিবে। গয়াকৃত্যের প্রথম দিন হইতে শেষদিন পর্য্যন্ত—

বিধি।

১। প্রত্যহ একবার হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে।

২। তৈলপক্ক কোন বস্তু আহার করিবে না।

৩। গাত্রে তৈল ম্রক্ষণ নিষিদ্ধ।

৪। পিপাসা হইলে জল ভিন্ন অন্য কোন পানীয় গ্রহণ করিতে পারিবে না।

প্রথমে ফল্গুতীর্থে যাইয়া 'ততো গয়া প্রবেশে চ পূর্ব্বতোহস্তি মহানদী, তত্র তোয়ং সমুৎপাদ্য স্নাতব্যং নির্ম্মলে জলে' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ফল্গুগর্ভ হইতে তিন মুষ্টি বালুকা তুলিয়া লইয়া স্নান করিবে। স্নান ও আচমনের পর 'বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা সমস্ত পিতৃণাং বিষ্ণুলোকাবাপ্তয়ে আত্মনশ্চ ভুক্তিমুক্তিপ্রাপ্তয়ে ফল্গুতীর্থে স্নানমহং করিষ্যে' এই মন্ত্র জপ করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

প্রথমদিনকৃত্য।

তাহার পর মৃত্তিকা লইয়া 'ওঁ উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহনা। আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়' এই মন্ত্র

পাঠে পুনর্ব্বার স্নান ও জলে দাঁড়াইয়া ভিজা কাপড়ে তর্পণ করিবে। 'তর্পণের সময় আচমন করিয়া তিলরহিত জল দ্বারা দেবতর্পণ সমাপনান্তে তিলমিশ্রিত জলদ্বারা পিত্রাদি তিন, মাতামহাদি তিন, মাত্রাদি তিন, মাতামহ্যাদি তিন, এই দ্বাদশ ব্যক্তির প্রত্যেকের নামেই তিন তিনবার তর্পণ করিবে।' * 'তীর্থ মাত্রেতু কর্ত্তব্যং তর্পণং তিলমিশ্রিতং' তাই তিল ব্যতীত পিত্রাদি তর্পণ করিবে না। স্মার্ত্তমতে সামবেদীরা পিত্রাদি বৃদ্ধ প্রমাতামহ পর্য্যন্ত ছয় পুরুষের, যজুর্ব্বেদীরা পিত্রাদি নয় পুরুষের শ্রাদ্ধ করিবেন। সর্ব্বশেষে ষোড়শ পিণ্ডদান করিয়া স্ত্রীষোড়শীও করা যাইতে পারে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে—

নিষিদ্ধ শ্রাদ্ধদ্রব্য।

অমেধ্যৈর্জ্জন্তুমে দৃষ্টং শুষ্কং পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ,
অশিতং পরিদৃষ্টঞ্চ তথৈবাগ্রাবলেহিতং,
শর্করাকেশ পাষাণৈঃ কীটৈর্যচ্চাপ্যুপদ্রুতং,
পিন্যাকমথিতঞ্চৈব তথা তিলযবাদিষু,
সিদ্ধাক্কতাশ্চ যে ভক্ষ্যাঃ প্রত্যক্ষলবণীকৃতাঃ,
বাসসাচার ধূতানি বর্জ্যানি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি,
অভক্ষ্যং যৎ স্বরূপেণ নিষিদ্ধং স্নাতকেষু যৎ,
বর্জনীয়ং প্রযত্নেন দ্রবং তৎ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।

---

* গয়াকৃত্য তত্ত্ব।

অর্থাৎ 'নীচজাতি এবং শৃগাল কুক্কুর জন্তু কর্তৃক যাহা দৃষ্ট হয় এবং শুষ্ক ও ভুক্তাবশিষ্ট পরিত্যক্ত বস্তু এবং যে বস্তুর অগ্রভাগ অন্যে ভোজন করিয়াছে এবং শর্করা কেশ ও প্রস্তর মিশ্রিত বস্তু এবং কীটে যে বস্তু দংশন করিয়াছে এবং যে সকল সিদ্ধ বস্তুতে লবণ দেওয়া হইয়াছে এবং বস্ত্রদ্বারা যাহা ছাঁকিয়া লওয়া হইয়াছে ঐ সকল বস্তু শ্রাদ্ধে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।' পেঁয়াজ, কুষ্মাণ্ড, অলাবু, বার্তাকু, গ্রাম্য মহিষ-দুগ্ধ, পালং শাক, এবং রাই সরিষা শাক, বিশেষভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। মৃণ্ময়, সীসক, লৌহ ও ভগ্নপাত্রে শ্রাদ্ধ দ্রব্য রাখিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা, পুরোহিত এবং ভোক্তা সকলেই নরক গমন করেন। *

**বিহিত শ্রাদ্ধদ্রব্য।**

চন্দন, কুঙ্কুম, কর্পূর, আগর, পদ্মকাষ্ঠ, জাতি, মল্লিকা, কুন্দ, যুই, করবী, বক, (রক্তবর্ণ পুষ্প যথা জবা, ভাণ্ডী, আকন্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ) শ্রাদ্ধে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু এ সব বস্তুর অভাবে শাস্ত্রমতে যব ব্যবহার করা যায়। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কদলীত্বক (খোলা) এবং গণ্ডার নির্ম্মিত পাত্রে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ পরম সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন।

---

* বৃদ্ধশাতাতপে যথা—'পাত্রেতু-মৃন্ময়ে যস্তু শ্রাদ্ধেতু ভোজয়েৎ পিতৄন, সবৈ দাতা পুরোধাশ্চ ভোক্তা চ নরকং ব্রজেৎ।'

গয়ায় পৌঁছিয়া সেই দিনই নিমিত্তিকশ্রাদ্ধ করা বিধি। কারণ তাহার পর কিম্বা পর পর দিন ঐ শ্রাদ্ধ করিতে পারা যায় না। কিন্তু যদি কেহ রাত্রিতে অথবা রাক্ষসী * বেলায় গয়ায় উপস্থিত হন তাহা হইলে পরদিন শ্রাদ্ধ করিতে কোন বাধা নাই। এই শ্রাদ্ধ করিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিবেন না। গয়াশ্রাদ্ধে অনধিকার বলিয়া জীবিৎপিতৃক এবং স্ত্রীলোক এই শ্রাদ্ধ করিতে পারিবেন না। এই শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্যান্য ক্রিয়া করিতে আপত্তি নাই। ফল্গুতীরে এই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা হয় বলিয়া ইহাকে ফল্গুশ্রাদ্ধ বলে।

ফল্গুশ্রাদ্ধ।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা পিতৃপক্ষের অন্নপাত্র স্পর্শ করিয়া 'ওঁ বিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষমদীয়ং' মন্ত্রে অন্নাদিতে তিলজল নিক্ষেপ করিবেন। তৎপরে ঐ সকল অন্নে মধু দিবেন। শ্রাদ্ধতত্ত্বে মধুদানের মন্ত্র অতি অপূর্ব্ব। মন্ত্র যথা,—

মধুবাতা মন্ত্র।

'ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীর্ম্মধুনক্তমুতোষসো

---

* পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত দিবামানের প্রত্যেক ভাগকে মুহূর্ত্ত বলে। পঞ্চদশ মুহূর্ত্তের শেষ তিন মুহূর্ত্তের নাম রাক্ষসী বেলা।

মধুমৎ পার্থিবং রজঃ,

মধুদ্যৌরস্তনঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতি-

র্ম্মধুমাংস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ।

মধু মধু মধু।'

কর বায়ু মধুগতি

মধুময়ী স্রোতস্বতী,

মধুময় বনস্পতি, মধু ফুল ফল,

মধুময়ী নিশীথিনী,

মধুময়ী পয়স্বিনী

মধুময় সূর্য্যালোক, মধু মেঘদল! †

পিতৃগণের মুক্তির জন্য গয়াকৃত্যের প্রারম্ভে গয়ালীর চরণপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই পূজা গয়াকৃত্যের পূর্ব্বে কি পরে করিতে হইবে সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিধি না থাকিলেও ব্যবহার বশতঃ পূর্ব্বে করাই যুক্তিযুক্ত। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি এই যে

**গয়ালীর চরণপূজা।**

'গয়াং প্রদক্ষিণীকৃত্য গয়াবিপ্রান্ প্রপূজ্য চ।

অন্নদানাদিকং সর্ব্বং কৃতং তত্রাক্ষয়ং ভবেৎ॥'

শ্রাদ্ধকর্ত্তা যথাশক্তি স্বর্ণ অথবা রৌপ্য মুদ্রা, বস্ত্র, নারিকেল ও যজ্ঞোপবীত লইয়া আচমন স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক 'এতানি

---

† এষা।

বস্ত্র-যজ্ঞোপবীত-কাঞ্চনখণ্ড-নারিকেলফলানি অমুক গোত্রায় শ্রী অমুক দেবশর্ম্মণে ব্রহ্মপ্রকল্পিত ব্রাহ্মণায় নমঃ' মন্ত্রে উপরোক্ত দ্রব্য গয়ালীর হস্তে দান করিয়া গয়াকৃত্যের অনুমতি গ্রহণ করিবে।

বায়ুপুরাণ মতে—

পিণ্ডদান দ্রব্য।

পায়সেনাপি চরুণা শক্তুনা পিষ্টকেন বা,
তণ্ডুলৈঃ ফলমূলাদ্যৈর্গয়ায়াং পিণ্ডপাতনং।
তিলকল্কেন খণ্ডেন গুড়েন সঘৃতেন বা,
কেবলেনৈবদধ্না বা উর্জ্জেন মধুনাথবা।
পিণ্যাকং সঘৃতং খণ্ডং পিতৃভ্যোঽক্ষয়মিত্যুত,
ইজ্যতে বার্ত্তবং ভোজ্যং হবিষ্যান্নং মুনীরিতং।
একতঃ সর্ব্ববস্তূনি রসবন্তি মধুনি হি,
স্মৃত্বা গদাধরাঙ্ঘ্র্যুক্তং ফল্গুতীর্থাম্বু চৈকতঃ।

'পায়স, চরু, শক্তু (ছাতু), পিষ্টক, তণ্ডুল, ফল, মূল, তিল বাটা, খণ্ড গুড়, এই সমুদায় দ্রব্যের যে কোন দ্রব্য ঘৃতযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা পিণ্ডদান করিবে। অথবা কেবল মধু বা দধি ঘৃতযুক্ত পিষ্টক কিম্বা গুড় দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের অক্ষয় ভোজ্য হয়। অথবা হবিষ্যান্ন দ্বারা পিণ্ড দিবে, অথবা সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া তদ্দ্বারা ফল্গুতীর্থ জলের সহিত পিণ্ডদান করিবে। গয়াতে সাধারণতঃ

বাঙ্গালীরা যবের ছাতু সংযোগে পিণ্ডদান করেন। পশ্চিম-দেশীয় লোকেরা অন্নের পিণ্ড দিয়া থাকেন।

'মুষ্টিমাত্র প্রমাণঞ্চ' গয়াশ্রাদ্ধে পিণ্ডের পরিমাণ এক মুষ্টি।

অতি প্রত্যুষে ফল্গুতীর্থে স্নান তর্পণ সমাধা করিয়া বিষ্ণু-পদ হইতে ৬ মাইল দূরে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে প্রেতপর্ব্বতে গমন করিবে। এই প্রেতশিলা গয়াসুরের মস্তকে স্থাপিত। এখানে পর্ব্বতের মূলদেশে অবস্থিত ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান এবং নিজ নিজ বেদবিহিত তর্পণ করিতে হয়। 'ব্রহ্মকুণ্ডে ততঃ স্নাত্বা দেবাদীংস্তর্পয়েৎ সুধীঃ।' আচমন স্বস্তিবাচনান্তে উত্তর মুখ হইয়া কোন পাত্রে তিল, তুলসী, হরীতকী, জল সংযোগে স্নানের সংকল্প করিবে। 'বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদস্থ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা পিতৃণাং সম্ভাবিত প্রেতত্বনাশপূর্ব্বক শাশ্বত ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি-কামনায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানমহং করিষ্যে।' এই সংকল্প করিয়া স্নান করিবে। স্নান ও তর্পণ শেষে এই কুণ্ড হইতে জল লইয়া শ্রাদ্ধের জন্য প্রেতশিলায় আরোহণ করিবে। এখানে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের পর সতিল জলাঞ্জলি দিয়া বলিবে—

দ্বিতীয়দিনকৃত্য।

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরং,
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্তিমায়ান্তু সর্ব্বশঃ।

পুত্রকামী ব্যক্তি এখানে বিধিমতে অতিরিক্ত চারিটি পিণ্ডদান করিবেন। মন্ত্র যথা,—

১

ওঁ যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশ্যতি বা স্বয়ং।
তস্য কাশ্যপগোত্রস্য বায়ুরূপস্য দেহিনঃ।
প্রেতস্যোদ্ধারবিষয়ে তস্মৈ পিণ্ডং দদাম্যহং॥

২

ওঁ যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশ্যতি বা স্বয়ং।
তস্য প্রেতস্য দত্তোঽত্র পিণ্ডোয়মুপতিষ্ঠতু॥

৩

ওঁ যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশ্যতি বা স্বয়ং।
বিষ্ণুরূপং সলভতাং তাং যা পিণ্ডার্পণাহুতিঃ।
তস্য কাশ্যপগোত্রস্য বায়ুরূপস্য দেহিনঃ।
অয়ং পিণ্ডো ময়া দত্তো যঃ পীড়াং কুরুতে মম॥

৪

ওঁ ইমং তিলময়ং পিণ্ডং মধু সর্পিঃ সমন্বিতং।
দদামি তস্মৈ প্রেতায় যঃ পীড়াং কুরুতে মম॥

এইরূপে কার্য্যশেষে প্রেতপর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া গয়ার উত্তর দিকে মহানদীর পশ্চিমতীরে প্রেতশিলায় গমন করিবে।

প্রথমে পা ধুইয়া আচমন স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধের সংকল্প করিবে। লৌকিকাচার আছে বলিয়া এখানে নূতন একটি মাটীর হাঁড়ি ভাঙ্গিতে হয়। তারপর প্রেত-শিলার নিম্নস্থিত প্রভাস পর্ব্বতে 'রামতীর্থ' হ্রদে আচমন স্বস্তিবাচন করিয়া স্নানের সংকল্প কবিতে হইবে।

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ,
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্ত্বিহ।
ওঁ জন্মান্তর শতং পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং,
তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতু রামতীর্থাভিষেচনাৎ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অবগাহন বা মার্জ্জন স্নান করিবে। তর্পণ ও শ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া যমরাজ এবং ধর্ম্মরাজ উদ্দেশে কুশ-তিল-জল-সংযুক্ত বলিদান করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ দ্বৌশ্বানৌ শ্যামশবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ
তাভ্যাং বলিং প্রদাস্যামি রক্ষেতাং পথি সর্ব্বদা।
এষ বলিঃ যমরাজ ধর্ম্মরাজানুচরাভ্যাং নমঃ॥

এই বলি অবশ্য দেয়, নতুবা গয়াশ্রাদ্ধ অনর্থক হয়।

তৃতীয়দিন কৃত্য। ফল্গুতীর্থে যথাবিধি নিত্যক্রিয়া করিয়া উত্তরমানস তীর্থে যাইয়া মস্তকে জল প্রক্ষেপ করিবে। স্নানের সংকল্প মন্ত্র যথা,—

'বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ

অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা আত্মশুদ্ধি সূর্য্যোলোকাদি-প্রাপ্তি পিতৃমুক্তিকামঃ উত্তরমানসে স্নানমহং করিষ্যে।' এই সংকল্প করিয়া স্নান করিবে। অতঃপর নিজ নিজ বেদানুসারে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়া 'ওঁ নমো ভগবতে ভর্ত্তে সোমভৌমজ্ঞরূপিণে, জীব ভার্গব সৌরেয় রাহুকেতু-স্বরূপিণে' মন্ত্রদ্বারা হৃদয় মধ্যে পিতৃগণের সূর্য্যালোক প্রাপ্তি কামনা করিবে। তদনন্তর মৌনী হইয়া দক্ষিণমানসে যাইবে। এখানে উদীচী নামক তীর্থে স্নানতর্পণাদি করিতে হয়। দক্ষিণমানস হইতে কনখল তীর্থে যাইয়া স্নান তর্পণ-শ্রাদ্ধাদি করিবে। এই তীর্থত্রয়ের কার্য্য শেষ করিয়া গদাধরের পূর্ব্বদিকে ফল্গুতীর্থে যাইয়া স্নান তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিবে। ইহাকে পঞ্চতীর্থকৃত্য বলে। মধুস্রবার দক্ষিণে অবস্থিত পিতামহেশ্বরশিবকে—

'ওঁ নমঃ শিবায় দেবায় ঈশান পুরুষায় চ,
অঘোর বামদেবায় সদ্যোজাতায় সম্ভবে।' মন্ত্র দ্বারা নমস্কার ও পূজা করিয়া পুনর্ব্বার ফল্গুতীর্থে স্নান করিবে। স্নান শেষে গদাধর দর্শন, প্রণাম ও পূজা করিবে। পিতৃগণের সহিত নিজের বিষ্ণুপদ কামনা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পঞ্চতীর্থে স্নান তর্পণ করিয়া গদাধরের নিকট ফিরিয়া আসিবে। এইবার 'অমৃতৈঃ পঞ্চভিঃ স্নানং পুষ্পবস্ত্রাদ্যলঙ্কৃতং' মন্ত্রশোধিত

পঞ্চামৃত (দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করা) দ্বারা গদাধরকে স্নান করাইয়া পূজা করিবে। গদাধরকে পঞ্চামৃত স্নান অবশ্য করাইবে, নতুবা গয়াশ্রাদ্ধ বিফল হয়।

ফল্গুতীর্থে স্নান তর্পণাদি নিত্যকর্ম্ম করিয়া বিষ্ণুপদ হইতে ৬ মাইল দূর অগ্নিকোণে অবস্থিত ধর্ম্মারণ্যে যাইয়া

চতুর্থদিন কৃত্য। মতঙ্গবাপীতে যথাবিধি স্নান ও তর্পণ করিবে। অনন্তর মতঙ্গবাপীর উত্তর-দিকে মতঙ্গেশ্বরকে দর্শন করিয়া—

ওঁ প্রমাণং দেবতাঃ সন্তুলোকপালাশ্চ সাক্ষিণঃ,
ময়াগত্য মতঙ্গেঽস্মিন্ পিতৄণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা।

মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

মতঙ্গেশ্বর পূজা শেষে ব্রহ্মতীর্থ নামক ব্রহ্মকূপে যাইয়া প্রাতঃস্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া ধর্ম্ম ও ধর্ম্মেশ্বরকে নমস্কার করিবে। বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মকূপটি আর নাই, সেখানে একটি মাত্র বটবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বটবৃক্ষের নীচে আত্মস্বর্গ কামনায় শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধশেষে

ওঁ চলদ্দলায় বৃক্ষায় সর্ব্বদা স্থিতিহেতবে,
বোধিসত্ত্বায় যজ্ঞায় অশ্বত্থায় নমো নমঃ।

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া বিষ্ণুপদের

পঞ্চমদিন কৃত্য। এক মাইল দূর নৈর্ঋত কোণে ব্রহ্মসরোবরে যাইয়া—

'বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা ঋণত্রয়বিমুক্তিকামঃ ব্রহ্মসরসি স্নানমহং করিষ্যে' মন্ত্রে স্নানতর্পণ ও স্বস্ব বেদবিহিত শ্রাদ্ধাদি করিবে। শ্রাদ্ধশেষে ব্রহ্মযূপের নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধের সংকল্প করিবে। পিতামহ ব্রহ্মা এখানে যজ্ঞ করিয়া যে যূপ উঠাইয়াছিলেন তাহাকেই ব্রহ্মযূপ কহে। এখানে আম্রবৃক্ষ সেচনের সংকল্প করিয়া 'পিতৃমোক্ষকামঃ ব্রহ্মকল্পিতাম্রবৃক্ষসেচনমহং করিষ্যে' মন্ত্রে আম্রবৃক্ষ সেচন করিবে। তদনন্তর, বাজপেয় যজ্ঞের ফলসম ফলপ্রাপ্তি কামনা পূর্ব্বক ব্রহ্মযূপ প্রদক্ষিণ এবং পিতৃগণের ব্রহ্মপুর কামনা করিয়া ব্রহ্মার নমস্কার ও পূজা করিবে। পূজা শেষে

'ওঁ যমরাজধর্ম্মরাজৌ নিশ্চলার্থং হি সংস্থিতৌ তাভ্যাং বলিং প্রদাস্যামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে। এষ কুশতিলজলমিশ্রিতো বলিঃ যমরাজধর্ম্মরাজভ্যাং নমঃ' মন্ত্রে যম বলি দিবে। পরিশেষে কুক্কুর বলি ও কাক বলির বিধি আছে। কাকবলি দান জন্য অশুচিতা পরিহারার্থ পুনর্ব্বার বিনা মন্ত্রে ফল্গুতীর্থে স্নান করিবে।

অতি প্রত্যূষে ফল্গুতীর্থে 'বিষ্ণু ওঁ তৎসদন্ত অমুকে

মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা দশলক্ষাশ্বমেধযজ্ঞজন্যফলপ্রাপ্তি-কামঃ ফল্গুতীর্থে স্নানমহং করিষ্যে।'

ষষ্ঠদিন কৃত্য।

মন্ত্রে স্নান করিয়া বিষ্ণু-পাদ-মন্দিরে গমন করিবে। এখানে পুণ্যশিলায় পিণ্ডদানই গয়াকৃত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। প্রথমে বিষ্ণুপদ দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে—

'ওঁ অত্র বিষ্ণুপদং দিব্যং দর্শনাৎ পাপনাশনং,
স্পর্শনাৎ পূজনাচ্চৈব পিতৃণাং মুক্তিহেতবে।'

এই মন্ত্রোচ্চারণের পর বিষ্ণুপদ স্পর্শ করিবে। তদনন্তর বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া শক্তিমত পূজা * করিবে। পূজাশেষে পিণ্ডদানের সংকল্প করিয়া—

'বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা আত্মীয়কুলসহস্র-সমুদ্ধারপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকগমনকামঃ বিষ্ণুপদে পিণ্ডদানমহং করিষ্যে' মন্ত্রে সংকল্প করিবে। সংকল্প মন্ত্রোচ্চারণের পর দক্ষিণমুখ হইয়া উপবেশন করিবে এবং নিজ নিজ বেদোক্ত পিণ্ডদান বিধি অনুযায়ী পিণ্ডদানাদি করিয়া পিতৃষোড়শী, স্ত্রীষোড়শী ও মাতৃষোড়শী করিবে। বিষ্ণুপদে পিণ্ডদানের সময় পিণ্ডগুলি এই ভাবে দিবে যাহাতে এক পিণ্ডের উপর

* মন্ত্র—এতৎ পাদ্যং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

অপর পিণ্ড পতিত না হয়। পিণ্ডকার্য্য শেষ হইলে বিষ্ণু-পদ হইতে পিণ্ডগুলি উঠাইয়া ফেলিবে। এই পিণ্ডগুলি গয়ালীরা গরুর আহারের জন্য লইয়া যান।

ষোড়শবেদীর শ্রাদ্ধ।

বিভিন্ন ষোলটি পদের নিকট যাইয়া শ্রাদ্ধ করাকে 'ষোড়শবেদী' শ্রাদ্ধ কহে। ষোড়শটি পদ যথা—

রুদ্রপদ, ব্রহ্মপদ, দক্ষিণাগ্নিপদ, গার্হপত্যপদ, আহবনীয়-পদ, সত্যাগ্নিপদ, আবসথ্যাগ্নিপদ, সূর্য্যপদ, কার্ত্তিকেয়পদ, ইন্দ্রপদ, অগস্ত্যপদ, চন্দ্রপদ, গণেশপদ, ক্রৌঞ্চপদ, মাতঙ্গপদ ও কশ্যপপদ।

রুদ্রাদিপদ সকলের শ্রাদ্ধফল যথা—রুদ্রপদে শ্রাদ্ধ করিলে শতকুলের সহিত শিবপুর প্রাপ্তি, ব্রহ্মপদে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি, দক্ষিণাগ্নিপদে নিজের বাজপেয় যজ্ঞ ফলপ্রাপ্তি, গার্হ-পত্যপদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি, আহবনীয়পদে রাজসূয় যজ্ঞ ফলপ্রাপ্তি, সূর্য্যপদে পঞ্চশত কুলের সূর্য্যপুর প্রাপ্তি, কার্ত্তিকেয়পদে পিতৃলোকের শিবপুর প্রাপ্তি, ইন্দ্রপদে পিতৃ-লোকের ইন্দ্রপদ প্রাপ্তি, অগস্ত্যপদে পিতৃলোকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি এবং চন্দ্র, গণেশ ও কশ্যপপদে পিতৃলোকের ব্রহ্মপুর প্রাপ্তি হয়।

ষোড়শবেদী শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া বিষ্ণুপদ মন্দিরের উত্তরে

কনকেশ্বর, কেদারেশ্বর, নরসিংহ ও বামন এই চারিটি দেব-মূর্ত্তি দর্শন, পূজা ও প্রণাম করিবে।

ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি প্রাত্যহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বিষ্ণুপদ হইতে দক্ষিণ দিকে এক মাইল দূর গদালোল তীর্থে

সপ্তমদিন স্নান তর্পণ করিবে। দেবগণের প্রার্থনায়

কৃত্য। বিষ্ণু গদা দ্বারা হেতি রাক্ষসকে বধ করিয়া এই স্থানে গদা প্রক্ষালনের জন্য মৃত্তিকা খুঁড়িয়াছিলেন। সেই অবধি ইহাকে গদালোল তীর্থ কহে। এখানে উপস্থিত হইয়া আচমন স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক 'বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্থ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা আত্মনঃ শুদ্ধয়ে, অক্ষয়স্বর্গপ্রাপ্তয়েচ গদালোলে স্নানমহং করিষ্যে।' মন্ত্রে স্নানের সংকল্প করিতে হয়। সংকল্পের পর 'ওঁ গদালোলে মহাতীর্থে গদা প্রক্ষালনাদ্ধরেঃ, স্নানং করোমি তীর্থেঽস্মিন্ অক্ষয়ং পদমাপ্নুয়াৎ' মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে। তারপর তর্পণাদি শেষে 'বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্থ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা পিতৃতৃপ্তি-ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি কামনয়া গদালোলে শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে' সংকল্প মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি করিবে। গদা-লোলের কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে অক্ষয়বটের নিকট যাইতে

হয়। পিতৃলোকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি কামনা করিয়া 'বিষ্ণু-রোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা পিতৃণাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকাম-নয়া অক্ষয়বটছায়ায়াং শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে' সংকল্প মন্ত্রে অক্ষয়-বটের ছায়াতে শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। শ্রাদ্ধশেষে ব্রহ্ম-কল্পিত গয়ালী ব্রাহ্মণ ভোজন ও তাঁহাকে ষোড়শাদি দান অবশ্য কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে—

'* * * একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতাঃ।
দেয়ং দানং ষোড়শকং গয়াতীর্থ পুরোধসে।'

অধুনা অক্ষয়বট মূলে শ্রাদ্ধ ও গয়ালী ভোজন সাধারণতঃ তীর্থ পুরোহিতের নিকট হইতে 'সুফল' গ্রহণ করিবার দিনই অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রাদ্ধশেষে ও ব্রাহ্মণ ভোজনের পর অক্ষয় বটেশ্বরকে দর্শন ও পূজা করিয়া

'ওঁ একার্ণবে বটস্যাগ্রে যঃ শেতে যোগনিদ্রয়া,
বালরূপধরস্তস্মৈ নমস্তে যোগশায়িনে।
ওঁ সংসারবৃক্ষ শস্ত্রায় সর্ব্বপাপক্ষয়ায় চ,
অক্ষয়ায় ব্রহ্মদাত্রে নমোঽক্ষয়বটায়তে ॥'

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

সর্ব্বশেষে রুদ্রের নিকট পিতৃলোকের রুদ্রলোক কামনা

করিয়া প্রপিতামহরূপ গদাধরকে পূজা ও প্রণাম করিয়া বলিবে—

'ওঁ কলৌ মহেশ্বরা লোকা যেন তস্মাৎ গদাধরঃ
লিঙ্গরূপো ভবেত্বঞ্চ বন্দে শ্রীপ্রপিতামহং।'

ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বদিন উপবাস করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে গায়ত্রীতীর্থে যাইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা ও শ্রাদ্ধাদি করিবেন। অন্য
অনিয়ত দিন দিন উদ্যন্ত পর্ব্বতে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, তর্পণ
কৃত্য। ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া সরস্বতী তীরে গমন এবং তথায় স্নান ও সন্ধ্যা তর্পণাদি করিবেন। শিলা, লেলিহান, ভরতাশ্রম, মুণ্ডপৃষ্ঠ, আকাশ গঙ্গা, গিরিকর্ণ মুখ এবং গদাধর সমীপে কুলশতের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি কামনায় শ্রাদ্ধ অথবা পিণ্ডদান করিবেন। বৈতরণীতীর্থে একবিংশতি কুলোদ্ধার কামনা করিয়া স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ শেষে গোদান করিয়া বলিবেন—

'ওঁ যা সা বৈতরণী নাম নদী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা,
সাদ্যোত্তীর্ণা মহাভাগা পিতৃণাং তারণায় বৈ।'

তদনন্তর দেবনদী, গো-প্রচার, ঘৃতকুল্যা, মধুকুল্যা, গদালোল, কোটিতীর্থ এবং রুক্মিণীকুণ্ড এই সকল স্থানে পিতৃস্বর্গ কামনায় শ্রাদ্ধ অথবা পিণ্ডদান করা বিধি। মার্কণ্ডেয়েশ্বর ও কোটিশ্বরকে প্রণাম করিয়া পাণ্ডুশিলাতে পিতৃলোকের অক্ষয়

তৃপ্তি কামনাপূর্ব্বক সংকল্প করিয়া শ্রাদ্ধ অথবা পিণ্ডদান করিবেন। মধুস্রবাতীর্থে অশ্বমেধফল কামনায় স্নান ও তর্পণ করিয়া সহস্রকুলের নরকোদ্ধার পূর্ব্বক বিষ্ণুপুরে গমন কামনা করিয়া শ্রাদ্ধ এবং দশাশ্বমেধ, হংসতীর্থ, মহানদী, বৈতরণী, মথকুণ্ড এই সকল তীর্থে নিজের মুক্তি কামনায় স্নান, পিতৃতৃপ্তি কামনায় তর্পণ ও শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতৃস্বর্গ কামনায় সঙ্গমেশ্বর তারকেশ্বরকে প্রণাম করিয়া গয়াকূপে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এখানে আত্মঘাতী ব্যক্তিদের মুক্তি কামনায় সংবৎসরের পর গয়াশ্রাদ্ধ করা শাস্ত্রসম্মত। এই ভাবে ভস্মকূপে ভস্মদ্বারা স্নান ও সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন, গয়াগ্রাম মধ্যস্থ সুষুম্না-তীর্থে মহাকালীর নিকট পিতৃলোকের স্বর্গকামনায় শ্রাদ্ধ, বশিষ্ঠতীর্থে স্নান-তর্পণ ও বশিষ্ঠেশ্বর শিবকে প্রণাম, ধেনুকারণ্যের জলাশয়ে স্নান, নমস্কার এবং সংকল্প করিয়া কামধেনুপদে শ্রাদ্ধ, কর্দ্দমাল, গয়ানাভি, মুণ্ডপৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে পিণ্ডদানবিধি দ্বারা শ্রাদ্ধ, চণ্ডিকা, ফল্গু, চণ্ডীশ শিব ও মঙ্গলাদি এঁকে নমস্কার, গয়াগজ, গয়াদিত্য, গায়ত্রী, গদাধর, গয়া, গয়াশির এই ষড়্ গয়ায়* পিতৃলোকের মুক্তিকামনায় সংকল্প করিয়া শ্রাদ্ধ,

* গয়াগজো গয়াদিত্যো গায়ত্রী চ গদাধরঃ
গয়া গয়াসুরশ্চৈব ষড়্ গয়া মুক্তিদায়িকাঃ।

একবিংশতি কুলোদ্ধার কামনায় গয়াতে বৃষোৎসর্গ, আদি-গদাধরের ধ্যান, ভস্মকূটে জনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া নিজের বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি কামনায় পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ, দধিমিশ্রিত তণ্ডুল দ্বারা নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া জনার্দ্দনের বামহস্তে পিণ্ডদান ও 'ওঁ এষ পিণ্ডো ময়া দত্ত স্তব হস্তে জনার্দ্দন, গয়াশীর্ষে ত্বয়া দেয়ো মহ্যং পিণ্ডো মৃতে ময়ি' মন্ত্র পাঠ, এবং 'ওঁ জনার্দ্দন নমস্তুভ্যং নমস্তে পিতৃরূপিণে, পিতৃপতে নমস্তুভ্যং নমস্তে মুক্তিহেতবে' মন্ত্রে প্রণাম, ঋণত্রয় বিমুক্তি কামনায় পুণ্ডরীকাক্ষ দর্শন এবং স্বর্গ কামনা করিয়া—

'ওঁ লক্ষ্মীকান্ত নমস্তেঽস্তু নমস্তে পিতৃমোক্ষদ,
তং ধ্যাত্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ।'

মন্ত্র পাঠে প্রণাম, ফল্গুনদীর পরপারে যাইয়া ভরতাশ্রম নিকটস্থ ফল্গুনদীতে ( মহানদী ) স্নান ও তর্পণ এবং তথায় রামেশ্বর শিবকে যথাবিধি পূজা ও রামপদে শ্রাদ্ধ করিয়া—

'ওঁ রাম রাম মহাবাহো দেবানামভয়ঙ্কর,
ত্বাং নমাম্যত্র দেবেশ মম নশ্যতু পাতকং।'

মন্ত্রে সীতাসহিত রামচন্দ্রকে প্রণাম, কুণ্ডপর্ব্বতে সংকল্প করিয়া মতঙ্গপদে শ্রাদ্ধ, উদ্যন্ত পর্ব্বতে মধ্যাহ্নস্নান, সন্ধ্যা ও তর্পণ, এবং তথায় বেদ বেদাঙ্গপারগ বিপ্রত্ব কামনা করিয়া

সাবিত্রী পূজা, অগস্ত্যপদে স্নান ও শ্রাদ্ধ, জন্মনিবারণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিকামনায় ব্রহ্মযোনিতে প্রবেশ ও নিগম, ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য গয়াকুমার প্রণাম, পিতৃলোকের চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি কামনা করিয়া সোমকুণ্ডে স্নান, তর্পণ, ও শ্রাদ্ধ, সপ্তজন্মকৃত পাপক্ষয় কামনা করিয়া কাকশিলাতে 'ওঁ যমোঽসি যমদূতোঽসি বায়সোঽসি মহাবল, সপ্তজন্মকৃতং পাপং বলিং ভুক্ত্বা বিনাশয়।' মন্ত্রে বলিদান, স্বর্গদ্বারেশ্বর শিবকে প্রণাম, ব্যোমগঙ্গাতে শ্রাদ্ধ, কপিলানদীর তীরে কপিলেশ্বর শিবপূজা, স্বর্গকামনায় মাহেশ্বরীকুণ্ডে ও রুক্মিণীকুণ্ডে স্নান, শ্রাদ্ধ এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে সৌভাগ্য-কামনায় গৌরীপূজা, শিবত্বপ্রাপ্তি কামনায় ঋণমোক্ষেশ্বর ও পাপমোক্ষেশ্বর শিব দর্শন, বিঘ্ননাশন জন্য গজরূপী গণেশ দর্শন এবং পিতৃমাতামহশ্বশুরকুলের স্বর্গকামনায় ক্রৌঞ্চপদ পর্ব্বতস্থ জলাশয়ে শ্রাদ্ধ সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বায়ুপুরাণে দৃষ্ট হয়। এইরূপে যথাশক্তি গয়ায় শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গয়া প্রদক্ষিণ করিবে এবং গদাধরকে পূজা ও প্রণাম করিয়া বলিবে—

'গদাধরং কলিশত কল্মষাপহং গয়াগতং বিদিতগুণং
গুণাতিগং গুহাগতং গিরিবরগেহ গোপিতং সুরার্চ্চিতং
বরদমহং নমামি তং॥'

প্রণামান্তে গদাধরকে গয়াকৃত্যের সাক্ষী করিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে বলিবে—

'আগতোঽস্মি গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর,
ত্বমেব সাক্ষী ভগবাননৃনোঽহমৃণত্রয়াৎ।'

সর্ব্বশেষে অক্ষয়বট অথবা বিষ্ণুপদ মন্দিরে যাইয়া তীর্থ পুরোহিত গয়ালীর নিকট হইতে সুফল লইতে হয়। 'সুফল' ব্যতিরেকে গয়াকার্য্য সমস্তই বিফল।

**সুফল গ্রহণ।**

সম্পূর্ণ গয়াকৃত্যকে 'খাপ্‌রী' কহে। 'খাপ্‌রী করা সকলের শক্তি ও সময়ে কুলায় না বলিয়া সংক্ষেপেও গয়াকৃত্য করিবার বিধি আছে।

**সংক্ষেপে গয়াকৃত্য।**

প্রথম দিন ফল্গুস্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ ও গয়ালীর চরণ-পূজা করিবে। এই ভাবে প্রতি দিনের কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া ষষ্ঠদিনে 'সুফল' লইতে হয়। ইহাই মধ্যম গয়া।

**দর্শনী বা মধ্যম গয়াকৃত্য।**

'দর্শনী' গয়াকৃত্য করিতে অসমর্থ ব্যক্তি প্রথম দিনে ফল্গুস্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ ও গয়ালীর চরণপূজা করিবে। দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান ও গদাধরের পূজা

একোদ্দিষ্ট বা অধমগয়াকৃত্য।

করিবে এবং তৃতীয় দিনে অক্ষয়বটের ছায়ায় পিণ্ডদান করিয়া গয়ালীর নিকট হইতে 'সুফল' লইবে। এই ক্রিয়াকে একোদ্দিষ্ট কহে।

গয়াতে ভূম্যাদি ষোড়শদান সাধারণতঃ অক্ষয়বটের নিকট হইয়া থাকে, কারণ এস্থানে দানই শাস্ত্রমতে

ষোড়শ দান।

প্রশস্ত। ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, দীপ, অন্ন, তাম্বূল, ছত্র, গন্ধ, মাল্য, ফল শয্যা, পাদুকা, গাভী, কাঞ্চন, রজত প্রভৃতি দানই ষোড়শ-দান। ষোড়শদানের সময় প্রত্যেক দানের সহিত বস্ত্রা-চ্ছাদিত একটি ভোজ্য দিতে হয়। ভূমিদানের সঙ্গে কিছু ধান্য দিবে।

সামবেদ মতে গায়ত্রী পাঠ করিয়া গোমূত্র শোধন করিতে

পঞ্চগব্য শোধন।

হয়। শোধন মন্ত্র যথা :—'ওঁগাবশ্চিদগা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ, সবান্ধবঃ রিহতে ককুভো মিথঃ' মন্ত্রে গোময় শোধন করিবে। 'ওঁ গব্যো সুনো-হথা পুরা অশ্বয়োথ রথয়া রবিবস্যা মহোনাম' মন্ত্রে দুগ্ধ শোধন করিবে। 'ওঁ দধিক্রাব্নোহকার্যাং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ, সুরভিনো মুখাকরোৎপ্রণতাযুং ষিতার্ষৎ' মন্ত্রে দধিশোধন করিবে। 'ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধু দুধে

সুপেষসা স্থাবা পৃথিবী বরুণস্থ ধর্ম্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা।' মন্ত্রে ঘৃতশোধন করিতে হয়। 'ওঁ দ্যৌরাপঃ কণিক্কদাৎ সিন্ধোরায়ো মরুতো মাদয়ন্তাং ঘর্ম্মজ্যোতিঃ' মন্ত্রে কুশোদকশোধন করিবে।

মাতৃগয়া কৃত্য।

যাঁহারা মাতার মৃত্যুর পূর্ব্বে পিতৃগয়াকৃত্য করিয়াছেন, অথবা পিতা জীবিত থাকিতে যাঁহাদের মাতার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহারা যদি কার্য্যোপলক্ষে গয়া যান, তবে তাঁহারা মাতৃগয়া করিতে পারেন। পিতা জীবিত থাকিলে কেবল ফল্গুস্নান করিয়া সৌভাগ্যকুণ্ডে যাইবেন। তথায় আচমন স্বস্তিবাচন করিয়া 'বিষ্ণুরোম্ তৎসদগু অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা মাতৃণাং স্বর্গপ্রাপ্তয়ে আত্মনশ্চ মুক্তয়ে সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নানমহং করিষ্যে' মন্ত্রে সংকল্প পূর্ব্বক স্নান করিবেন। স্নানান্তে পঞ্চগব্য দ্বারা শ্রাদ্ধভূমি বিশুদ্ধ করিয়া 'বিষ্ণুরোম্ তৎসদগু অমুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রায়াঃ মাতুঃ অমুকী দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়াঃ পিতামহ্যাঃ অমুকী দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়াঃ প্রপিতামহ্যাঃ অমুকী দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়াঃ মাতামহ্যাঃ অমুক দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়াঃ প্রমাতামহ্যাঃ অমুকী দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়াঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহ্যাঃ

অমুকী দেব্যাঃ সৌভাগ্যকুণ্ডে শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে' সংকল্প পূর্ব্বক নিজ নিজ বেদানুসারে শ্রাদ্ধ করিবেন। শ্রাদ্ধ হইয়া গেলে শ্রাদ্ধভূমির নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আচ্ছাদন কুশ পাতিত করিয়া উহাতে তিলজল প্রোক্ষণপূর্ব্বক দক্ষিণ দিক্ হইয়া ঐ কুশে 'ওঁ সপ্তগোত্র মৃতা যা মে ধাত্র্যো বা যা মৃতা মম, তাসামুদ্ধরণার্থায় পিণ্ডমেতদ্দদাম্যহং—যথাগোত্র-নামধেয়া অস্মাকং সপ্তগোত্রা ধাত্র্যশ্চ ইদমক্ষয্যং পিণ্ডং যুস্মভ্যং নমঃ' মন্ত্রে জলের সহিত পিণ্ডদান করিবে। ঐ পিণ্ডে মাতৃগণকে হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিয়া করজোড়ে বলিবে—'ওঁ আগচ্ছন্তু মহাভাগা মাতরো মে সদৈবতাঃ, কাঙ্ক্ষিণ্যো যাশ্চ পিণ্ডং মে পিণ্ডমাগতা তিষ্ঠয়ে।' তারপর জগন্মাতৃদর্শন, পূজা ও প্রণাম করিয়া মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহীর নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধশেষে আস্তরণকুশ পাতিত করিয়া তিলজল ছিটাইয়া দিয়া মাতৃষোড়শী মন্ত্রে ষোড়শ পিণ্ডদান করিবে এবং সেই সকল পিণ্ডের উপর ষোড়শীর নিয়মানুসারে তিলজল সেচন করিয়া দেবগণকে সাক্ষী করিতে হয়। মাতার অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তির জন্ম ব্রাহ্মণকে নানাবিধ দ্রব্যপূর্ণ একটি ডালা উৎসর্গ করিয়া বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিবে। পিণ্ডদানের পর দক্ষিণ হস্তে

জল লইয়া 'মাতৃগয়াকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু' মন্ত্রে জল ফেলিয়া দিবে। এই সময় পুরোহিত 'ওমস্তু' বাক্য বলিলে জগন্মাতাকে ক্রোড়দান ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দক্ষিণা ও প্রণাম করিয়া দেবগণকে সাক্ষী রাখিয়া বলিবে—

'ওঁ সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা,
ময়া গয়াং সমাগত্য মাতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা।'

ঊনবিংশতি পিণ্ডদানকে ষোড়শপিণ্ডদান কহে। ইহার মন্ত্র সাম, ঋক্, যজু সকল বেদেরই একরূপ। বিষ্ণুপদে

পিতৃষোড়শী।

ষোড়শী করিলে উহাতেই দর্ভ পাড়িয়া মন্ত্র দ্বারা তিলজল ছিটাইয়া দিবে। 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিষ্ণুপদায় নমঃ' মন্ত্রে বিষ্ণুপদ পূজা করিবে। তদনন্তর ঐ কুশে

'ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ,
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং,
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকং।'

মন্ত্রে তিনবার সতিল জলাঞ্জলি দিবে। সর্ব্বশেষে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠে পাতিত কুশে মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত ক্রমশঃ পিণ্ড দান করিবে।

১

অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে,
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।

২

ওঁ মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে,
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।

৩

ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে,
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।

৪

ওঁ অজাতদন্তা যে কেচিৎ যে চ গর্ভে প্রপীড়িতাঃ,
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।

৫

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেচিৎ নাগ্নিদগ্ধাস্তথাপরে,
বিদ্যুচ্চৌরহতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।

৬

ওঁ দাবদাহে মৃতা যে চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যে,
দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্বাপি তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।

৭

ওঁ উদ্বন্ধনমৃতা যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে,
আত্মাপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

৮

ওঁ অরণ্যে বর্ত্মনি বনে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ,
ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যৈঃ * তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

৯

ওঁ রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যে স্থিতাঃ,
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

১০

ওঁ অনেকযাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকে চ যে গতাঃ,
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

১১

ওঁ অনেকযাতনাসংস্থা যে নীতা যমকিঙ্করৈঃ,
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

১২

অসিপত্রবনে ঘোরে কুম্ভীপাকে চ যে গতাঃ ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥

---

* পাঠান্তর—ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ ।

১৩

ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ সংস্থিতাঃ,
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।

১৪

ওঁ পশুযোনিগতা যে চ পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ,
অথবা বৃক্ষযোনিস্থাঃ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।

১৫

ওঁ জাত্যন্তরসহস্রেষু ভ্রমন্তঃ স্বেন কর্ম্মণা,
মানুষ্যং দুর্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।

১৬

ওঁ দিব্যান্তরীক্ষভূমিষ্ঠাঃ পিতরো বান্ধবাদয়ঃ।
মৃতাপসংস্কৃতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।

১৭

ওঁ যে চ কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম,
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডেনানেন সর্ব্বদা।

১৮

ওঁ যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ,
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্।

১৯

ওঁ পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে চ যে মৃতাঃ,
গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যে চান্যেঽবান্ধবাঃ মৃতাঃ।
যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ,
ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাতান্ধাঃ পঙ্গবাস্তথা।
বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম,
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্।

২০

ওঁ আব্রহ্মণো যে পিতৃবংশজাতা,
মাতুস্তথা বংশভবা মদীয়াঃ।
কুলদ্বয়ে যে মম দাসভূতাঃ,
ভৃত্যাস্তথৈবাশ্রিতসেবকাশ্চ॥
মিত্রাণি সর্ব্বে পশবশ্চ বৃক্ষাঃ,
দৃষ্টাহদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ।
জন্মান্তরে যে মম সঙ্গতাশ্চ,
তেভ্যঃ স্বধা পিণ্ডমহং দদামি॥

নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনই এই ক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ যে সকল স্ত্রীলোক অজ্ঞাত এবং যাঁহারা

সাংসারিক নানাপ্রকার দুরবস্থায় মৃত্যুর অধীন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য ঊনবিংশতি মন্ত্র দ্বারা যে ঊনবিংশতি পিণ্ডদান করা হয়, তাহাকেই স্ত্রী-ষোড়শী বলে। কুশে তিলজল প্রক্ষেপ মন্ত্র :—

**স্ত্রী-ষোড়শী।**

১

অস্মৎকুলে মৃতা যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে,
আবাহয়িষ্যে তাঃ সর্ব্বা দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ।

২

ওঁ মাতামহ কুলে যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে,
আবাহয়িষ্যে তাঃ সর্ব্বা দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ।

৩

ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে,
আবাহয়িষ্যে তাঃ সর্ব্বা দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ।

তিলজল প্রক্ষেপের পর ঐ দর্ভে ক্রমশঃ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ঊনবিংশতি পিণ্ডদান করিবে, যথা—

১

ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে,
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।

২

ওঁ মাতামহকুলে যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে,
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

৩

ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে,
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

৪

ওঁ অজাতদন্তা যাঃ কাশ্চিৎ যাশ্চ গর্ভে প্রপীড়িতাঃ,
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

৫

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যাঃ কাশ্চিন্নাগ্নিদগ্ধাস্তথাপরাঃ,
বিদ্যুচ্চৌরহতা যাশ্চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

৬

ওঁ দাবদাহে মৃতা যাশ্চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যাঃ,
দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্যাশ্চ তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

৭

ওঁ উদ্বন্ধনমৃতা যাশ্চ বিষশস্ত্র হতাশ্চ যাঃ,
আত্মাপঘাতিন্যো যাশ্চ তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

৮

ওঁ অরণ্যে বর্ত্মনি বনে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ,
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

৯

ওঁ রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যা মৃতাঃ,
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

১০

ওঁ অনেকযাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকে চ যা গতাঃ,
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

১১

ওঁ অনেকযাতনাসংস্থাঃ যা নীতা যমকিঙ্করৈঃ,
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

১২

অসিপত্রবনে ঘোরে কুম্ভীপাকেচ যা গতাঃ,
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদামাহম্ ।

১৩

ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ সংস্থিতাঃ,
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

১৪

ওঁ পশুযোনিগতা যাশ্চ পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ,
অথবা বৃক্ষযোনিস্থা স্তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।

১৫

ওঁ জন্মান্তরসহস্রেষু ভ্রমন্ত্যঃ স্বেন কর্ম্মণা,
মানুষ্যং দুলর্ভং যাসাং তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।

১৬

ওঁ দিব্যান্তরীক্ষভূমিষ্ঠাঃ মাতরো বান্ধবাদয়ঃ,
মৃতা অসংস্কৃতা যাশ্চ তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।

১৭

ওঁ যাঃ কাশ্চিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে মাতরো মম,
তাঃ সর্ব্বাঃ তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডং দানেন সর্ব্বদা।

১৮

ওঁ যা বান্ধবাবান্ধবা বা যাঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ,
তাসাং পিণ্ডো ময়া দত্তো অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং।

১৯

ওঁ পিতৃবংশে মৃতা যাশ্চ মাতৃবংশেচ যা মৃতা,
গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যাশ্চান্যা বান্ধবা মৃতাঃ।

যা মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পতিপুত্রবিবর্জ্জিতাঃ,
ক্রিয়ালোপগতা যাশ্চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবাস্তথা।
বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম,
তাসাং পিণ্ডো ময়া দত্তোঽক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং।

২০

ওঁ আব্রহ্মণো যা পিতৃবংশজাতা,
মাতুস্তথা বংশভবা মদীয়াঃ।
কুলদ্বয়ে যা মম দাসীভুতা,
ভৃত্যাস্তথৈবাশ্রিতসেবিকাশ্চ॥
মিত্রাণি সখাঃ পশবশ্চ বৃক্ষা,
দৃষ্টাহ্যদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারা।
জন্মান্তরে যা মম সঙ্গতাশ্চ,
তাভ্যঃ স্বধা পিণ্ডমহং দদামি॥

**মাতৃষোড়শী।** গয়ায় বিষ্ণুপদে মাতৃষোড়শী অবশ্য কর্ত্তব্য। ষোলটি মন্ত্রে ষোলটি পিণ্ডদান করিতে হয়। যাঁহার মাতা পরলোকগতা হইয়াছেন, তিনিই মাতৃষোড়শীর অধিকারী। প্রথমে বিষ্ণুপদে কয়েকটি তিল দিয়া, কুশ পাতিত করিয়া তাহাতে তিলোদক অঞ্জলি দিতে হয়। পিণ্ডদান মন্ত্র :—

১

ওঁ গর্ভাদবগমেচৈব বিষমে ভূমিবর্ত্মনি, *
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্।

যে জননী গর্ভে জন্ম করিয়া গ্রহণ
বিষম ধরণীপথে হয়েছি পতন।
বিষ্ণুপাদপদ্মে, তাঁর নিস্তার কারণ,
এই মাতৃপিণ্ড আমি করি নিবেদন॥

২

ওঁ মাসি মাসি কৃতং কষ্টং বেদনা প্রসবেষু চ,
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্।

মাসে মাসে কত কষ্ট কতই যাতনা
পেয়েছেন যে জননী প্রসবে বেদনা।
বিষ্ণুপাদপদ্মে, তাঁর নিস্তার কারণ,
এই মাতৃপিণ্ড আমি করি নিবেদন॥

৩

ওঁ শৈথিল্যে প্রসবে চৈব, † মাতুরত্যন্তদুষ্করং,
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্।

---

পাঠান্তর—* গর্ভাদবগমে দুঃখং বিষয়ে ভূমিবর্ত্মনি।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥

পাঠান্তর—† শৈথিল্যাং প্রসবে প্রাপ্তে ইত্যাদি।

সন্তান প্রসবে শিথিলতা নিবন্ধন
মাতা পেয়েছেন কত ক্লেশ অগণন।
বিষ্ণুপাদপদ্মে, তাঁর নিস্তার কারণ,
এই মাতৃপিণ্ড আমি করি নিবেদন॥

৪

ওঁ পদ্ভ্যাং জনয়তে মাতুর্দুঃখঞ্চৈব সুদুস্তরং,
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্।
গর্ভবাসকালে করি পদ সঞ্চালন
যাঁহার অশেষ দুঃখ করেছি জনন।
বিষ্ণুপাদপদ্মে, তাঁর নিস্তার কারণ,
এই মাতৃপিণ্ড আমি করি নিবেদন॥

৫

ওঁ অগ্নিনা শোষতে দেহং ত্রিরাত্রানশনেষু চ, ‡
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্।
জন্মিলে যাঁহার দেহ হয়েছে শোষণ
অনলে ও তিন রাত্রি থাকি অনশন।
বিষ্ণুপাদপদ্মে, তাঁর নিস্তার কারণ,
এই মাতৃপিণ্ড আমি করি নিবেদন॥

---

পাঠান্তর—‡ বহ্নিনা শোষয়েদ্ দেহং ত্রিরাত্রোপোষণেন চ।

৬

ওঁ পিবেচ্চ কটুদ্রব্যাণি ক্লেশানি বিবিধানি চ, *
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্।

মাতা কত কটুদ্রব্য করেন সেবন
সহেন বিবিধ ক্লেশ সন্তান কারণ।
বিষ্ণুপাদপদ্মে, তাঁর নিস্তার কারণ,
এই মাতৃপিণ্ড আমি করি নিবেদন।

৭

ওঁ দুর্লভং ভক্ষ্যদ্রব্যস্য ত্যাগে বিন্দতি যৎফলং, †
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্।

সন্তানের শুভফল ভাবি অনুক্ষণ
মাতা কত ভক্ষ্য বস্তু করেন বর্জ্জন।
বিষ্ণুপাদপদ্মে, তাঁর নিস্তার কারণ,
এই মাতৃপিণ্ড আমি করি নিবেদন॥

৮

ওঁ রাত্রৌ মূত্রপুরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃকর্পটং, ‡
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্।

---

পাঠান্তর—* যৎপিবেৎ কটুদ্রব্যাণি ক্বাথানি বিবিধানি চ।
পাঠান্তর—† দুর্লভানিচ ভক্ষ্যাণি ক্ষুদত্যাত্মজবে সতি।
পাঠান্তর—‡ রাত্রৌ মূত্রপুরীষাভ্যাং যন্মাতুর্গাত্রপীড়নম্।

বিষ্ঠামূত্রে সিক্ত বস্ত্র করিয়া ধারণ
রাত্রিতে মাতার কত ক্লেশের কারণ।
বিষ্ণুপাদপদ্মে, তাঁর নিস্তার কারণ,
এই মাতৃপিণ্ড আমি করি নিবেদন ॥

৯

ওঁ পুত্রং ব্যাধিসমাযুক্তং মাতৃদুঃখমহর্নিশং,
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্।

রোগের শয্যায় পুত্র থাকিলে শয়ান
দিবানিশি মাতা মনে কত দুঃখ পান।
বিষ্ণুপাদপদ্মে, তাঁর নিস্তার কারণ,
এই মাতৃপিণ্ড আমি করি নিবেদন ॥

১০

ওঁ যদা পুত্রো ন লভতে তদা মাতুশ্চ শোচনং,
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদামাহম্।

পুত্রলাভ না হইলে কতই শোচনা
করেন জননী সদা হয়ে খিন্নমনা।
বিষ্ণুপাদপদ্মে, তাঁর নিস্তার কারণ,
এই মাতৃপিণ্ড আমি করি নিবেদন ॥

১১

ওঁ ক্ষুধয়া বিহ্বলে পুত্রে দদাতি নির্ভরং স্তনং,
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্।

যখনি হয়েছে পুত্র ক্ষুধায় কাতর
দিয়াছেন মাতা তারে স্তন নিরন্তর।
বিষ্ণুপাদপদ্মে, তাঁর নিস্তার কারণ,
এই মাতৃপিণ্ড আমি করি নিবেদন॥

১২

ওঁ দিবারাত্রৌ যদা মাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃপুনঃ,
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্।

পুত্র হিত কামনায় হইয়া অধীর
দিবারাত্রি শুকায়েছে মায়ের শরীর।
বিষ্ণুপাদপদ্ম, তাঁর নিস্তার কারণ,
এই মাতৃপিণ্ড আমি করি নিবেদন॥

১৩

ওঁ পূর্ণেতু দশমে মাসি মাতুরত্যন্ত দুষ্করং, *
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্।

দশ মাস পূর্ণ হলে কষ্ট অতিশয়
হইয়াছে জননীর প্রসব সময়।
বিষ্ণুপাদপদ্মে, তাঁর নিস্তার কারণ,
এই মাতৃপিণ্ড আমি করি নিবেদন॥

---

* পাঠান্তর—সম্পূর্ণে দশমে মাসি অত্যন্তং মাতৃপীড়নম্।

১৪

গাত্রভঙ্গো ভবেন্মাতু স্তৃপ্তিং নৈব প্রযচ্ছতি, †
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

গর্ভকালে গাত্রভঙ্গ হয় জননীর
তৃপ্তিবোধ নাহি হয়, বিকল শরীর ।
বিষ্ণুপাদপদ্মে, তাঁর নিস্তার কারণ,
এই মাতৃপিণ্ড আমি করি নিবেদন ॥

১৫

ওঁ অল্পাহারবতী মাতা যাবৎ পুত্রোঽস্তি বালকঃ,
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

অল্পাহারে জননীর দেহ হয় ক্ষীণ
পুত্রের শৈশবকাল থাকে যতদিন ।
বিষ্ণুপাদপদ্মে, তাঁর নিস্তার কারণ,
এই মাতৃপিণ্ড আমি করি নিবেদন ॥

১৬

ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে পথি মাতুশ্চ শোচনং ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্ ।

ঘোর যমদ্বার পথে করিতে গমন
ভয়ভীত জননীর কতই শোচন ।

---

† পাঠান্তর—গাত্রভঙ্গেন যন্মাতুর্মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতম্ ।

বিষ্ণুপাদপদ্মে, তাঁর নিষ্ঠার কারণ,
এই মাতৃপিণ্ড আমি করি নিবেদন ॥

এইরূপে পিণ্ডদান মন্ত্র পাঠ ও পিণ্ডে তিলজল সেচন করিয়া 'ওঁ মাত্রাদিভ্যো নমঃ' মন্ত্রে প্রণাম করিবে। তারপর দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া 'ওমদ্য কৃতৈতৎ মাতৃষোড়শপিণ্ডদান-কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু' মন্ত্র পাঠান্তে জল পরিত্যাগ করিবে। এই সময়ে পুরোহিত 'ওমস্তু' বলিবেন। সর্ব্বশেষে দেবতাদিগকে সাক্ষী করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে—

'ওঁ সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা,
ময়া গয়াং সমাগত্য মাতৄণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা।'

ফল্গুতীর্থে মন্ত্রপাঠ।

ওঁ নমো দেবদেবায় শিতিকণ্ঠায় দণ্ডিনে।
রুদ্রায় চাপহস্তায় চক্রিণে বেধসে নমঃ ॥
সরস্বতী চ সাবিত্রী বেদমাতা গরীয়সী।
সন্নিধানী ভবত্বত্র তীর্থপাপপ্রণাশিনী ॥
ওঁ সাগরস্বননির্ঘোষ দণ্ডহস্তা সুরান্তক।
জগৎস্রষ্টর্জ্জগদ্দিন্নমামি ত্বাং সুরেশ্বর ॥
তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাকায় কল্পান্তদহনোপম।
ভৈরবায় নমস্তভ্যমনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি ॥
ওঁ ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নানমাদৃতঃ।
পিতৄণাং বিষ্ণুলোকায় ভুক্তিমুক্তি প্রসিদ্ধয়ে ॥

পিতৃ নমস্কার।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥
ওঁ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ
তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডেন ময়া দত্তেন ভূতলে॥
মাতামহস্তৎ পিতা চ পিতা তস্যাপি তৃপ্যতু।
দ্বিজানাং তর্পণাদ্ধোমাৎ পিণ্ডদানাচ্চ মে সদা॥
গয়ায়াং মুণ্ডপৃষ্ঠে চ সরসি ব্রাহ্মণস্তথা।
গয়াশীর্ষে বটে চৈব পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ং॥
গয়ায়াং পিতৃরূপেণ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ।
তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ॥

---

# মনুর মতে শ্রাদ্ধবিধি

ধর্ম্মের মূলসূত্র ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস। পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যজাতির ধর্ম্ম এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেহাবসানে আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন জন্য শুধু নয়, যাহাতে দেহাবসানের পর জীব পাশমুক্ত হইয়া বিশ্বাত্মার বিশ্বজ্ঞানে যুক্ত হইতে পারেন সেই জন্য সৎপুত্র শ্রাদ্ধাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। পরলোকগত আত্মার প্রতি জীবিতের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মনুসংহিতায় * বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই আলোচনার ভিতর ঈশ্বরজ্ঞান বিদ্যমান; ইহা উড়াইয়া দেওয়া চলে না, ইহা সাধকের আত্মজ্ঞানের ফল, সুতরাং ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। এই ক্রিয়াকাণ্ড যদি প্রাচীন যুগের ঋষিদের খেয়াল হইত তাহা হইলে আজ সহস্র সহস্র বৎসর অন্তে আমরা সেই সত্যটী কখনই এই ভাবে প্রত্যেক বিশ্বাসীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতাম না। শ্রাদ্ধ প্রকরণের প্রারম্ভেই মনু বলিয়াছেন—

---

* মনুসংহিতা ৩য় অধ্যায়। ১২৩ শ্লোক হইতে আরম্ভ।

পিতৃযজ্ঞন্তু নির্ব্বর্ত্ত্য বিপ্রশ্চন্দ্রক্ষয়েঽগ্নিমান্ ।
পিণ্ডান্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মাসানুমাসিকং ॥

সাগ্নিক ব্রাহ্মণ অমাবস্যা তিথিতে পিতৃযজ্ঞ শেষ করিয়া 'অন্বাহার্য্য' শ্রাদ্ধ করিবেন। মাসিক শ্রাদ্ধকে অন্বাহার্য্য শ্রাদ্ধ কহে। শ্রাদ্ধের ভোজন ব্যাপারটী বড়ই গুরুতর। শ্রাদ্ধান্ন ভোজনের অধিকারী কে? পতিত ব্যক্তিকে ভোজন করাইলে কোনই ফলপ্রাপ্তি হয় না। তাই মনু শ্রাদ্ধে যে যে ব্রাহ্মণকে, যেরূপ অন্নদ্বারা ভোজন করাইতে হয়, সেই প্রসঙ্গে বলিলেন—

'দ্বৌ দৈবে পিতৃকার্য্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা ।
ভোজয়েৎ সুসমৃদ্ধোঽপি ন প্রসজ্জেত বিস্তরে ॥'

দৈবকার্য্যে দুই ও পিতৃকার্য্যে তিনজন অথবা দেবপক্ষে এক ও পিত্রাদিপক্ষে একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। ধনশালী হইলেও ইহা অপেক্ষা অধিক ব্রাহ্মণভোজন করাইবে না, কেন না,

'সৎক্রিয়াং দেশকালৌচ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদঃ ।
পঞ্চৈতান্ বিস্তরো হন্তি—————॥'

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাহুল্য হইলে তাঁহাদের সেবা দেশ কাল, শুদ্ধাশুদ্ধি এবং পাত্রাপাত্র বিচার সম্বন্ধে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা।

এই পিত্র্যকার্য্য কখন করা বিধি, সে সম্বন্ধে মনু বলেন—

'প্রথিতা প্রেতকৃত্যৈষা পিত্র্যং নাম বিধুক্ষয়ে।'

হব্যকব্যাদি অন্ন কাহাকে দিবে, এ সম্বন্ধে 'সংহিতায়' আছে—

'অর্হত্তমায় বিপ্রায় তস্মৈ দত্তং মহাফলম্।'

তারপর শাস্ত্রকার দেখিলেন কেবল বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইলেই চলিবে না, বংশপরম্পরা শুদ্ধ ব্রাহ্মণ চাই—

'দূরাদেব পরীক্ষেত ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।'

বেদপারগ ব্রাহ্মণের অতি দূর পর্য্যন্ত অর্থাৎ পিতা পিতা-মহাদি পূর্ব্বপুরুষগণের কিরূপ গুণ ও শুদ্ধভাব ছিল তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। মন্ত্রবিৎ একটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু বেদনাভিজ্ঞ দশলক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনে কোনই ফল হয় না। যথা—

'সহস্রং হি সহস্রাণামনৃচাং যত্র ভুঞ্জতে।

একস্তান্ মন্ত্রবিৎ প্রীতঃ সর্ব্বানর্হতি ধর্ম্মতঃ।'

অনেক চিন্তা ও পরীক্ষার পর

'জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠাস্তথাপরে।

তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কর্ম্মনিষ্ঠাস্তথাপরে॥'

এই চারিপ্রকার দ্বিজকে পিতৃলোক উদ্দিষ্ট কব্য দেওয়া ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া মনু নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

অনেকে শ্রাদ্ধকার্য্যে মিত্রতা নিবন্ধন ভোজন করাইয়া থাকেন। ইহা সঙ্গত নয়, কারণ—

'ন শ্রাদ্ধে ভোজয়েন্মিত্রং ধনৈঃ কার্য্যোঽস্য সংগ্রহঃ।'

অর্থাৎ ধনান্তর বা কারণান্তর দ্বারা মিত্রের প্রতি মিত্রতা দেখান উচিত। যাহার শ্রাদ্ধ অথবা দেবকার্য্য মিত্রপ্রধান অর্থাৎ প্রধানতঃ যাঁহার শ্রাদ্ধকর্ম্মে মিত্রগণই ভোজন করেন, তাঁহার সেই কার্য্যে পারলৌকিক কোন ফল নাই। এইরূপ মিত্রতা সাধন জন্য যে গোষ্ঠি ভোজন, ইহাকে ঋষিরা পিশাচ-ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন, যথা—

'সম্ভোজনী সাভিহিতা পৈশাচী দক্ষিণা দ্বিজৈঃ।
ইহৈবাস্তে তু সা লোকে গৌরন্ধেবৈকবেশ্মনি॥'

একগৃহে আবদ্ধ অন্ধগাভীর ন্যায়, ঐরূপ ভোজন দানে ইহলোকেই মিত্রাদি সংগ্রহরূপ উপকার হইয়া থাকে, পরন্তু উহাতে পিতৃলোকের পারলৌকিক কোন উপকারই হয় না। তাই যিনি শত্রুও নহেন মিত্রও নহেন অর্থাৎ উদাসীন, এমন ব্রাহ্মণকেই শ্রাদ্ধকার্য্যে ভোজন করান বিধি, যথাঃ—

'নারিং ন মিত্রং যং বিদ্যাত্তং শ্রাদ্ধে ভোজয়েদ্দ্বিজম্।'

মিত্রাদি ভোজনের বিরুদ্ধে এত কথা বলিয়া মনু শেষে বলিলেন—

'কামং শ্রাদ্ধেঽর্চ্চয়েন্মিত্রং নাভিরূপমপি ত্বরিম্।

দ্বিষতা হি হবির্ভুক্তং ভবতি প্রেত্য নিষ্ফলম্॥'

শ্রাদ্ধে বরং মিত্রকেও স্থলবিশেষে ভোজন করাইতে পারা যায়, কিন্তু শত্রু যদি অতি বিদ্বান্‌ও হন, তাঁহাকে ভোজন করান কোন মতেই বিধেয় নহে। কারণ বিরুদ্ধ-ভাবাপন্নশত্রু শ্রাদ্ধান্ন গ্রহণ করিলে পিতৃলোকের পক্ষে উহা একেবারে নিষ্ফল হয়।

শ্রাদ্ধে অতি যত্নের সহিত বেদজ্ঞ ঋগ্বেদী, অথবা সমুদয় শাখ্যাধ্যায়ী যজুর্ব্বেদী কিম্বা সমাপ্তাধ্যায় সামবেদী বিপ্রকে ভোজন করানই মুখ্যকল্প। ইহাদের অভাবে—

'মাতামহং মাতুলঞ্চ স্বস্রীয়ং শ্বশুরং গুরুম্।

দৌহিত্রং বিট্‌পতিং ( জামাতা ) বন্ধুমৃত্বিগ্‌যাজ্যৌচ

ভোজয়েৎ।'

ইহার পর ব্রাহ্মণ-পরীক্ষা বিধি। কাহাকে শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করাইতে হইবে সে সম্বন্ধে মনু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান অত্যন্ত দুরূহ বলিয়া, পিণ্ডদানে দুর্জ্ঞেয় ও অদৃশ্য সূক্ষ্মদেহের তৃপ্তি বিধান করিতে হইবে বলিয়া—এই অগ্নি পরীক্ষার ব্যবস্থা।

যে সকল ব্রাহ্মণ পতিত, চৌর্য্যরত, ক্লীব, নাস্তিক, চর্ম্ম-রোগগ্রস্ত, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, বহুযাজনশীল, চিকিৎসা ব্যবসায়ী, প্রতিমা পরিচারক, মাংসবিক্রয়ী, রাজার ভৃত্য, কুৎসিত নখরোগ বিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ দন্তবিশিষ্ট, গুরুর প্রতিকূলাচরণ-কারী, কুসীদজীবী, যক্ষ্মারোগী, পশুপালক, পরিবেত্তা, পঞ্চ-মহাযজ্ঞানুষ্ঠানরহিত, বিপ্রদ্বেষী, যে সবর্ণা বিবাহ না করিয়া শূদ্রাকে বিবাহ করিয়াছে, যিনি বেতন লইয়া বেদ অধ্যা-পনা করেন, যিনি শূদ্রশিষ্যত্ব স্বীকার ও শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, নিষ্ঠুরভাষী, যে পিতামাতা বা গুরুগণকে অকারণে পরিত্যাগ করে, গৃহদাহকারী, সোমলতা বিক্রেতা, যে স্তুতি-বাদদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে পিতার সহিত বিবাদ করে, মদ্যপায়ী, অপবাদযুক্ত, ছদ্মবেশে অধর্ম্মকারী, ইক্ষুরস বিক্রেতা, দুর্জ্জন, উন্মত্ত, অন্ধ, বা বেদ-নিন্দক, যে নানা জাতীয় লোকের যাজক, আচারহীন, যে নিয়ত ভিক্ষা দ্বারা অপরের বিরক্তি জন্মায়—

'এতান্ বিগর্হিতাচারান্ পাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্।
দ্বিজাতিপ্রবরো বিদ্বানুভয়ত্র বিবর্জ্জয়েৎ।'

মনু এই সকল অব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধকার্য্যে পরিবর্জ্জন করিয়া 'পংক্তিপাবন' ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধান্ন গ্রহণের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'পংক্তিপাবন' কে?

'অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সর্ব্বপ্রবচনেষু চ।
শ্রোত্রিয়ান্বয়জাশ্চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ॥
ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নিস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ।
ব্রাহ্মদেয়াত্মসন্তানো জ্যেষ্ঠসামগ এব চ॥
বেদার্থবিৎ প্রবক্তা চ ব্রহ্মচারী সহস্রদঃ।
শতায়ুশ্চৈব বিজ্ঞেয়া ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ॥'

অর্থাৎ 'সর্ব্ববেদে যাঁহারা অগ্রগণ্য, সমুদয় বেদাঙ্গেও যাঁহারা সমধিক ব্যুৎপন্ন এবং দশপুরুষ পর্য্যন্ত যাঁহাদের বংশে বেদাধ্যয়নের বিশ্রাম নাই, সেই ব্রাহ্মণদিগকে 'পংক্তিপাবন' বলিয়া জানিবে। যজুর্ব্বেদের প্রখ্যাত ভাগ ত্রিণাচিকেত যিনি ব্রত সহকারে অবলম্বন করিয়াছেন, যিনি পঞ্চাগ্নিবিশিষ্ট, প্রখ্যাত ত্রিসুপর্ণ যিনি ব্রতসহকারে গ্রহণ করিয়াছেন, ছয়টী বেদাঙ্গে যাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি, যিনি ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত এবং যিনি সামবেদের আরণ্যক গান করিয়া থাকেন,—এই ছয়জন পঙ্‌ক্তিপাবন বিপ্র। বেদার্থের বেত্তা ও প্রবক্তা, ব্রহ্মচারী, বহুদানশীল এবং শতায়ুবর্ষ-বয়স্ক বিপ্রকে পঙ্‌ক্তিপাবন বলিয়া জানিবে।'

শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের সংযম অতি অদ্ভুত। এ ক্ষেত্রে লোভপরবশ 'ভোজনে নৃত্যন্তি বিপ্রাঃ'র ভাবটি দেখাইলে চলিবে না। নিমন্ত্রিত বিপ্র নিমন্ত্রণের দিন হইতে

শ্রাদ্ধাহোরাত্র যাবৎ নিয়তাত্মা হইবেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সংযমের কারণ নির্ণয় করিয়া এবং সেই সঙ্গে পরলোকতত্ত্বের একটা দিক্ দেখাইয়া মনু বলিলেন—

'নিমন্ত্রিতান্ হি পিতর উপতিষ্ঠন্তি তান্ দ্বিজান্।
বায়ুবচ্চানুগচ্ছন্তি তথাসীনানুপাসতে ॥'

অর্থাৎ নিমন্ত্রিত বিপ্র শরীরে পিতৃগণ অদৃশ্যরূপে অনু-প্রবেশ করেন; তাঁহারা যেখানে যান, বায়ুর ন্যায় পিতৃগণ তাঁহাদের অনুগমন করেন এবং তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলে পিতৃগণও উপবিষ্ট হন।

শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকে সংযম করিতে হয়, ইহার কোন প্রকার অঙ্গহানি হইলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার যে কিছু পাপ আছে, সে সমুদয় তাঁহাতে সংক্রমিত হয়। যথা—

'আমন্ত্রিতস্তু যঃ শ্রাদ্ধে বৃষল্যা সহ মোদতে।
দাতুর্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিত্তৎ সর্ব্বং প্রতিপদ্যতে ॥'

পিতৃগণ ক্রোধশূন্য, শৌচপরায়ণ, এবং নিয়ত ব্রহ্মচারী-ভাবে অবস্থিত, এইজন্য তাঁহাদিগের উপাসনা করিতে হইলে তদ্ধর্ম্মী হওয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা, উভয়েরই কর্ত্তব্য।

শ্রাদ্ধভোক্তার আহার ও সংযমের যথাযথ ব্যবস্থা

করিয়া শাস্ত্রকার পিতৃলোকের উৎপত্তি ও পূজা প্রসঙ্গে বলিলেন—

'মনোর্হৈরণ্যগর্ভস্য যে মরীচ্যাদয়ঃ সুতাঃ।
তেষামৃষীণাং সর্ব্বেষাং পুত্রাঃ পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ॥
বিরাট্‌ সুতাঃ সোমসদঃ সাধ্যানাং পিতরঃ স্মৃতাঃ।
অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ দেবানাং মারীচালোকবিশ্রুতাঃ॥
দৈত্য-দানব-যক্ষাণাং গন্ধর্ব্বোরগ-রক্ষসাম্‌।
সুপর্ণ-কিন্নরাণাঞ্চ স্মৃতা বর্হিষদোঽত্রিজাঃ॥
সোমপা নাম বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং হবির্ভুজঃ।
বৈশ্যানামাজ্যাপা নাম শূদ্রাণান্তু সুকালিনঃ॥
সোমপাস্তু কবেঃ পুত্রা হবিষ্মন্তোঽঙ্গিরঃসুতাঃ।
পুলস্ত্যস্যাজ্যপাঃ পুত্রা বসিষ্ঠস্য সুকালিনঃ॥
অগ্নিদগ্ধানগ্নিদগ্ধান্‌ কাব্যান্‌ বর্হিষদস্তথা।
অগ্নিষ্বাত্তাংশ্চ সৌম্যাংশ্চ বিপ্রাণামেব নির্দ্দিশেৎ॥'

পিতৃলোকের পূজার প্রথমে আবাহন ও শেষে বিশ্বদেব বিসর্জ্জনাদি দেবকার্য্য করা বিধেয়। কারণ

'দৈবাদ্যন্তং তদীহেত পিত্র্যাদ্যন্তং ন তদ্ভবেৎ।
পিত্র্যাদ্যন্তং ত্বীহমানঃ ক্ষিপ্রং নশ্যতি সান্বয়ঃ॥'

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি অগ্রে দেবকার্য্য না করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধের

বিপ্রাদি নিমন্ত্রণ ও শেষে পিতৃ ব্রাহ্মণের বিসর্জ্জনাদি করেন, তিনি শ্রাদ্ধ বিঘ্নহেতু সত্বর সবংশে বিনাশ প্রাপ্ত হন।'

এক্ষণে শাস্ত্রকার শ্রাদ্ধযোগ্য স্থান ও শ্রাদ্ধক্রিয়া বিশদভাবে বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—

'শুচিং দেশং বিবিক্তঞ্চ গোময়েনোপলেপয়েৎ।
দক্ষিণাপ্রবণঞ্চৈব প্রযত্নেনোপপাদয়েৎ॥
অবকাশেষু চোক্ষেষু নদীতীরেষু চৈব হি।
বিবিক্তেষু চ তুষ্যন্তি দত্তেন পিতরঃ সদা॥
আসনেষূপক৯প্তেষু বর্হিষ্মৎসু পৃথক্ পৃথক্।
উপস্পৃষ্টোদকান্ সম্যগ্বিপ্রাংস্তানুপবেশয়েৎ॥'

তারপর শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণকে সুখময় আসনে উপবেশন করাইয়া কুঙ্কুমাদি বিলেপন ও গন্ধমাল্যদ্বারা দেবপূর্ব্বক্রমে তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিবে। অর্চ্চনার পর ব্রাহ্মণগণকে কুশ ও তিলমিশ্রিত অর্ঘ্যজল দান করিয়া সকলের অনুজ্ঞাক্রমে অগ্নিতে হোম করিবে। অগ্নি, সোম এবং যমকে প্রথমে যথাবিধি হবির্দ্দান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া পশ্চাৎ অন্নসংযোগে পিতৃলোকের সন্তোষ বিধান করিবে। যদি অগ্নির অভাব হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণহস্তেই উক্ত আহুতিত্রয় দান করিবে। কারণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বলেন 'যোহগ্নিঃ স দ্বিজো' যিনি অগ্নি তিনিই ব্রাহ্মণ। আহুতির পর

হুতাবশিষ্ট দ্রব্য সংযোগে তিনটি পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহা দক্ষিণাভিমুখে অনন্যমনে দক্ষিণ হস্তের পিতৃতীর্থ দ্বারা সেই কুশের উপর প্রদান করিবে। তারপর

'ন্যুপ্য পিণ্ডাংস্ততস্তাংস্তু প্রয়তো বিধিপূর্ব্বকম্।
তেষু দর্ভেষু তং হস্তং নিমৃজ্যাল্লেপভাগিনাম্॥
আচম্যোদক্ পরাবৃত্ত্য ত্রিরাচম্য শনৈরসূন্।
ষড়্ ঋতূংশ্চ নমস্কুর্য্যাৎ পিতৄনেব চ মন্ত্রবিৎ॥
উদকং নিনয়েচ্ছেষং শনৈঃ পিণ্ডান্তিকে পুনঃ।
অবজিঘ্রেচ্চ তান্ পিণ্ডান্ যথান্যুপ্তান্ সমাহিতঃ॥'

এইবার শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রাণমধ্যে পিতৃগণকে স্মরণ করিতে করিতে অন্নপূর্ণ পাত্র স্বয়ং উভয় হস্তে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণগণের নিকটে সংস্থাপন করিবে। দুই হস্তে পাত্র গ্রহণ না করিলে ঐ অন্ন অশুদ্ধ হয় এবং উহা দুষ্টচেষ্ট অসুরেরা হঠাৎ অপহরণ করে। পরিবেষণকালে শ্রাদ্ধকর্ত্তা সমাহিত মনে ভোজ্যদ্রব্যের গুণ কীর্ত্তন করিবেন। সে সময়ে

'নাস্রমাপাতয়েজ্জাতু ন কুপ্যেন্নানৃতং বদেৎ।
ন পাদেন স্পৃশেদন্নং ন চৈতদবধূনয়েৎ॥'

কারণ

'অস্রং গময়তি প্রেতান্ কোপোঽরীননৃতং শুনঃ।
পাদস্পর্শস্তু রক্ষাংসি দুষ্কৃতীনবধূননম্।'

অর্থাৎ 'অন্নহস্তে অশ্রুপাত করিলে সেই অন্নদ্বারা প্রেত-দিগের তৃপ্তিবর্দ্ধন, ক্রোধ করিলে সেই অন্ন দ্বারা শত্রু-দিগের, মিথ্যা কথা কহিলে তদ্দ্বারা কুক্কুরদিগের, পাদস্পর্শ দ্বারা রাক্ষসদিগের এবং অন্ন প্রক্ষিপ্ত হইলে তদ্দ্বারা দুষ্কৃত-কারিগণের পাপাত্মা তৃপ্ত হয়।' তাই শ্রাদ্ধকর্ত্তা অতি সাব-ধানে পরিবেষণ করিবেন। প্রাণে একটু অবজ্ঞা বা মলিন-ভাব আসিলে সেই অন্নে কখনও পিতৃলোকের তৃপ্তি হয় না। কেবল পরিবেষণ করিলে চলিবে না, সে সময়ে

'যদ্ যদ্ রোচেত বিপ্রেভ্যস্তত্তদ্দদ্যাদমৎসরঃ'

যে ভোজ্য গ্রহণে ব্রাহ্মণগণের অভিরুচি হয়, কৃপণতা না করিয়া সেই সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে পরিবেষণ করিবে। ইহার পরই শ্রাদ্ধকর্ত্তার অন্য একটি সময়োপযোগী কর্ত্তব্যের কথা তুলিলেন, সেটি 'ব্রাহ্মাত্মাশ্চ কথাঃ কুর্য্যাৎ' ভোজন-কালে পরমাত্ম-বিষয়ক আলাপ,

'স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানিচ॥'

শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি শুনাইতে হয়। এই ভাবে যত্ন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে পিতৃলোক অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন।

শ্রাদ্ধকার্য্যে তিনটি জিনিষ অতি পবিত্র—

'ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রঃ কুতপস্তিলাঃ।
ত্রীণি চাত্র প্রশংসন্তি শৌচমক্রোধমত্বরাম্‌॥'

অর্থাৎ দৌহিত্র, কম্বল এবং তিল অতি পবিত্র। শৌচ, অক্রোধ এবং শান্তভাবে কর্ম্ম করা অতি প্রশস্ত গুণ বলিয়া শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশংসিত।

ভোজ্যদ্রব্য কিরূপ হওয়া উচিত, অর্থাৎ কিরূপ হইলে উহা পিতৃগণ গ্রহণ করেন। 'সমুদয় অন্ন অত্যুষ্ণ হইবে এবং ব্রাহ্মণগণ সংযতবাক্‌ হইয়া তাহা ভোজন করিবেন।' কারণ—

'যাবদুষ্ণং ভবত্যন্নং যাবদশ্নন্তি বাগ্‌যতাঃ।
পিতরস্তাবদশ্নন্তি যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ॥'

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত অন্ন উষ্ণ থাকে, যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ বাক্‌সংযত হইয়া তাহা গ্রহণ করেন এবং যে পর্য্যন্ত ভোজ্যদ্রব্যের গুণাগুণ বলা না হয়, পিতৃগণ সেই পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণমুখে তাহা ভোজন করেন।

যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে ভোজন করেন তাঁহার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইলে যেরূপ শাস্তি বিধান হইবে সে সম্বন্ধে মনু বলেন—

"শ্রাদ্ধং ভুক্‌ত্বা য উচ্ছিষ্টং বৃষলায় প্রযচ্ছতি।
স মূঢ়ো নরকং যাতি কালসূত্রমবাক্‌শিরাঃ॥

শ্রাদ্ধভুগ্ বৃষলীতল্পং তদহর্যোঽধিগচ্ছতি।
তস্যাঃ পুরীষে তন্মাসং পিতরস্তস্য শেরতে॥'

ভোজনশেষে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্রাহ্মণদিগকে 'স্বদিত' বলিয়া আচমন করাইবেন এবং আচমনের পর তাঁহাদিগকে বিশ্রামের জন্য অনুরোধ করিবেন। এইবার ব্রাহ্মণগণ তৃপ্তমনে শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে 'স্বধাস্তু' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন। অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া 'ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন' ব্রাহ্মণগণ যাহাকে দিতে বলেন তাহাকেই দিবেন।

শ্রাদ্ধের প্রধান অঙ্গ কি? মনু বলেন—

'অপরাহ্নস্তথা দর্ভা বাস্তুসম্পাদনং তিলাঃ।
সৃষ্টির্মৃষ্টির্দ্বিজাশ্চাগ্র্যাঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মসু সম্পদঃ॥'

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা শুদ্ধমনে মৌনাবলম্বী হইয়া একাগ্রচিত্তে দক্ষিণদিক্ দেখিতে দেখিতে পিতৃলোকের নিকট প্রণাম করিয়া বলিবেন :—

'দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি॥'

অর্থাৎ 'হে পিতৃগণ, আমাদের বংশে যেন দাতার বৃদ্ধি হয়, প্রতি বেদশাস্ত্রের যেন সম্যক্ আলোচনা হয়, আমাদের পুত্র-পৌত্রাদি যেন চিরকাল বিস্তৃত থাকে, বেদের প্রতি শ্রদ্ধা যেন আমাদের কুল হইতে তিরোহিত না হয়

এবং দান করিবার জন্য দেয় দ্রব্যেরও যেন কখনও অভাব না ঘটে।'

প্রার্থনা শেষে পিণ্ডগুলি 'গাং বিপ্রমজমগ্নিং বা' গাভী, ব্রাহ্মণ, ছাগ অথবা অগ্নির দ্বারা ভোজন করাইবে, কিম্বা জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। *

পিণ্ডগুলি স্থানবিশেষে নিক্ষেপ করিয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা উভয় হস্ত ধুইয়া আচমনপূর্ব্বক জ্ঞাতিদিগকে ভোজন করাইবেন। জ্ঞাতিভোজন শেষ হইলে, মাতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণ-দিগকে ভোজন করাইবেন। সর্ব্বশেষে 'গৃহবলিং কুর্য্যাৎ' বলিয়া মনু বৈশ্বদেবাদি নিত্যকর্ম্মাদি করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধবিধির উপসংহারে মনু যে যে অন্ন যথাবিহিত প্রদান করিলে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তির কারণ হয় তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন—

'তিলৈর্ব্রীহিযবৈর্মাষৈরদ্ভির্মূলফলেন বা।
দত্তেন মাংসং প্রীয়ন্তে বিধিবৎ পিতরো নৃণাং॥

---

* পুত্রকামা ধর্ম্মপত্নী গৃহোক্ত মন্ত্রদ্বারা পিতামহের পিণ্ডভোজন করিলে যদি গর্ভবতী হন তাহা হইলে আয়ুষ্মান্, যশস্বী, মেধাসম্পন্ন, ধনবান্, সাত্ত্বিক এবং ধার্ম্মিক পুত্র লাভ করেন।

দ্বৌ মাসৌ মৎস্যমাংসেন ত্রীন্ মাসান্ হারিণেন তু।
ঔরভ্রেণাথ * চতুরঃ শাকুনেনাথ পঞ্চ বৈ॥

*   *   *   *

কালশাকং মহাশল্কাঃ খড়্গালোহামিষং + মধু।
আনন্ত্যায়ৈব কল্পন্তে মুন্যন্নানি চ সর্ব্বশঃ॥
যৎকিঞ্চিন্মধুনা মিশ্রং প্রদদ্যাৎ তু ত্রয়োদশীম্।
তদপ্যক্ষয়মেব স্যাদ্বর্ষাসু চ মঘাসু চ॥'

কোন্ তিথি এবং কোন্ সময়ে শ্রাদ্ধকর্ম্ম প্রশস্ত সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলেন,—

'চতুর্দ্দশী ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের দশমী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত পাঁচ তিথি শ্রাদ্ধকার্য্যে যেমন প্রশস্ত, অপরাপর প্রতিপদাদি তিথি সকল তেমন নহে। দ্বিতীয়া ও চতুর্থী প্রভৃতি যুগ্মতিথিতে এবং ভরণী ও রোহিণী প্রভৃতি যুগ্মনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সমুদয় কামনা সিদ্ধ হয় এবং অযুগ্মতিথিতে এবং অযুগ্মনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ধনবিদ্যাদিসম্পন্ন সন্ততিলাভ হয়।'

'রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত রাক্ষসী কীর্ত্তিতা হি সা।'

---

* মেষমাংস।

\+ রক্তবর্ণ ছাগের মাংস।

রাত্রি রাক্ষসীকাল বলিয়া রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ করিবে না। উভয় সন্ধ্যাকালে ও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেও শ্রাদ্ধ করিবে না। যদি মাসে মাসে শ্রাদ্ধ করিতে পারা না যায়, তবে হেমন্ত, বর্ষা ও গ্রীষ্মকালে তিনবার শ্রাদ্ধ করিবে; কিন্তু পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত শ্রাদ্ধ প্রতিদিনই করিবে। যথা :—

'অনেন বিধিনা শ্রাদ্ধং ত্রিরব্দস্যেহ নির্ব্বপেৎ।
হেমন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষাসু পাঞ্চযজ্ঞিকমন্বহম্॥'

লৌকিক অগ্নিতে পিতৃযজ্ঞের হোম করিবে না, যথা :—

'ন পৈতৃযজ্ঞিয়ো হোমো লৌকিকেঽগ্নৌ বিধীয়তে।
ন দর্শেন বিনা শ্রাদ্ধমাহিতাগ্নের্দ্বিজন্মনঃ॥'

---

# শ্রাদ্ধে বিরাটপাঠ

প্রাচীন কালে শ্রাদ্ধসভায় কঠোপনিষৎ, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ পঠিত হইত। যে সকল পুণ্যগ্রন্থে আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, শ্রাদ্ধকালে শোকার্ত্ত আত্মীয় স্বজনের নিকট তাদৃশ গ্রন্থ পাঠই সমধিক উপযোগী, কিন্তু কালক্রমে বাংলাদেশে উপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থের পরিবর্ত্তে বিরাটপাঠ প্রচলিত হইয়াছে। অধুনা কোন কোন স্থলে গীতাপাঠের প্রচলনও আছে। বৃষোৎসর্গের সঙ্কল্প করিয়া 'বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি মৎসঙ্কল্পিত সোপকরণ বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত সোপকরণ বৃষোৎসর্গাঙ্গ হোমীয় হবিরক্ষয়ত্ব কামঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি বেদব্যাস প্রোক্ত জয়াখ্য মহাভারতান্তর্গত ওঁ জনমেজয় উবাচ। কথং বিরাটনগরে মম পূর্ব্ব পিতামহা ইত্যাদি নগরং মৎস্যরাজস্য শুশুভে ভরতর্ষভ ইত্যন্তং বিরাটপর্ব্ব পাঠনামহং করিষ্যামি॥' মন্ত্রে বিরাটপাঠ করিতে হয়।

বঙ্গীয় সমাজে কি করিয়া যে, বিরাটপাঠের সূচনা হইল সে সম্বন্ধে আমি বাংলার কয়েকটি মনীষীকে পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহাদের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

নবদ্বীপের পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন—'এতদ্দেশে আত্মশ্রাদ্ধে বিরাটপর্ব্ব পাঠ কতদিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে তাহার সময় নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তবে এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্বকাল হইতে বিরাটপাঠ চলিতেছে। তিনি 'শুদ্ধিতত্ত্বে' লিখিয়াছেন যে

'আচারাৎ রাঢ়দেশীয়াঃ শ্রাদ্ধে বিরাটপর্ব্ব পাঠয়ন্তি।' ইহাতেই বোধ হয় যে অন্যদেশে এই পাঠ প্রচলিত নাই। এবং অস্মদেশে যে সকল পশ্চাত্য বৈদিকগণ বাস করিতেছেন তাঁহারাও আত্মশ্রাদ্ধে বিরাটপর্ব্ব পাঠ করান না। কিন্তু এই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা এবং অন্যান্য জাতীয়েরা শ্রাদ্ধে বিরাটপাঠ করান। ইহাতে এই অনুমান হয় যে, এই দেশে যখন আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, সেই সময় হইতেই হউক কিম্বা যখন এদেশে সপ্তশতী ব্রাহ্মণের বাস ছিল সেই সময় হইতে এই বিরাটপাঠ আরম্ভ হইয়াছে। বিরাটপাঠের সঙ্কল্প বাক্যে ইহাই আছে যে 'হবনীয় বস্তুর অক্ষয়ত্ব কামনা করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য।'

বিক্রমপুরের পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন—'শ্রাদ্ধ শব্দে একোদ্দিষ্ট তাহাতে বেদপাঠ করা উচিত, তবে অভাবে উহা কেহ করে না সুতরাং ঐ দৃষ্টে সমর্থেও এক প্রকার লোপ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে গীতা পাঠ করে। বৃষোৎসর্গের কালে বিরাটপাঠ করিতে হয়, বৃষোৎসর্গাদি যে হোম উহার হবি অসুরে নষ্ট করে তন্নিবারণার্থ ভারতকীর্ত্তন করিতে হয়। যথা—

'শুক্লবাসাঃ শুচির্ভূত্বা ব্রাহ্মণান স্বস্তিবাব্যস্ত। কীর্ত্তয়ে ভারতঞ্চৈব তথাস্যাদক্ষয়ং হবিরিতি দানধর্ম্মে বৃষোসর্গপ্রকরণীয়বচনাদক্ষয়হবিস্কামেন ভারতমুচ্চার্য্যং। অজ্ঞাতবাসো মোক্ষঞ্চ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাং বৃষোৎসর্গে পঠেয়স্ত সপুত্রং পুত্রএববেতিবচনাৎ বিরাটপর্ব্ব পাঠাচারঃ।' এতদ্দেশীয় লোক শাস্ত্রবিশ্বাসী ছিল, যুক্তি বিবেচনা করিত না। আত্মার সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ। শাস্ত্রের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই। উপনিষদাদির পাঠজন্য আত্মার উপকার, কার্য্য জন্য উপকার স্বীকার না করিলে শ্রাদ্ধাদিও কিছু না।'

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—

'শ্রাদ্ধকালে বিরাটপাঠ কতদিন প্রচলিত হইয়াছে ঠিক বলিতে পারি না। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় সেই সংহিতা পাঠের বিধি আছে। রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধতত্ত্ব ও বৃষোৎসর্গ তত্ত্বে

মহাভারত পাঠের মাহাত্ম্য কথিত আছে, এবং মহাভারতের যে কোন অংশ পাঠ করিলেই যেন হইবে এরূপ আভাস আছে। বিরাটপর্ব্ব মহাভারতের অংশ এবং সেই পর্ব্বে বর্ণিত ঘটনাগুলি বঙ্গদেশে ঘটিয়াছিল, কারণ বিরাট রাজ্য দিনাজপুরের নিকট ছিল (তবে এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে)। * এই জন্য মনে হয় বঙ্গে বিরাটপাঠ বঙ্গবাসীদের মনোনীত হইয়াছে। এবং এই জন্য বিরাটপাঠ বঙ্গে এত প্রচলিত।'

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, এম, এ,—'আমাদের দেশে আজকাল শ্রাদ্ধে গীতা ও বিরাট পঠিত হয়। বিরাট পড়া আমার নিজের কুলধর্ম্ম—প্রপিতামহ হইতে চলিতেছে তৎপূর্ব্বে (১৫০ বৎসর আগে) কঠোপনিষদ্ পাঠ হইত কিনা জানি না। ফলকথা গীতা মোক্ষোপদেশক শাস্ত্র, কঠোপনিষদ্‌ও তাই। উহার শ্রবণে শোকমোহগ্রস্ত শ্রাদ্ধকর্ত্তার হৃদয়ের তমোভাব বিদূরিত হইবার কথা। তাই বোধ হয় উহার প্রবর্ত্তন। বিরাটপর্ব্বে মহাভারতের যাহা প্রতিপাদ্য—ধর্ম্ম

---

* মধ্যপ্রদেশের 'সাডোল'কে (Sahdol) কেহ কেহ বিরাট-রাজার রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম বিরাটপুর ছিল এবং এখনও এখানে 'বাণগঙ্গা' দীঘি ও কীচক মন্দির পরিদৃষ্ট হয়। কথিত আছে এখানেই পাণ্ডবগণ এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের সময় অস্ত্রশস্ত্র রক্ষা করিয়াছিলেন। আজিও 'ডাকোরী' উৎসবের সময় এই বৃক্ষতলে পূজা দেওয়া হয়।

নিগৃহীত হইলেও পরিণামে জয়যুক্ত হয় এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভাই অজ্ঞাতবাসের লাঞ্ছনাভোগ শেষ করিয়া পরিশেষে দীপ্যমানভাবে প্রকাশিত হইলেন। ধর্ম্মক্রমের স্কন্ধস্বরূপ মহারথ অর্জ্জুন একাকী সমস্ত কৌরব সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া ধর্ম্মের জয় সূচনা করিলেন। বোধ হয় কর্ম্মকর্ত্তার ধর্ম্মভাব উদ্দীপনের জন্য এই বিরাটপর্ব্ব মহাভারতের অনুকল্পে পঠিত হয়।'

---

* বিরাট রাজ্যের অবস্থিতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ 'বিশ্বকোষ' সম্পাদক মহাশয় বলেন—'ভারতবর্ষের নানাস্থানে 'বিরাট' নামক দেশের অস্তিত্ব বিদ্যমান, তন্মধ্যে মহাভারতের 'বিরাট' বর্ত্তমান রাজপুতনায়, জয়পুরের নিকট ছিল।'

# বেদে পুনর্জ্জন্ম

অপরের জন্ম ও মৃত্যু দেখিয়া আমরা সকলেই নিজ নিজ জন্ম-মৃত্যু বুঝি ও বিশ্বাস করি। এই জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে, কারণ আমি আমার জন্ম দেখি নাই, এবং আমার মৃত্যুও দেখিতে পাইব না। কাজেই জন্ম ও মৃত্যু অনুমান সাপেক্ষ। পরলোক সম্বন্ধেও সেই কথা। পূর্ব্বলোক ইহ-লোক ও পরলোক এই তিনটির আদি ও অন্ত্যালোক অত্যন্ত জটিল ও দুর্জ্জেয়। কারণ সর্ব্বাত্মকতা-জ্ঞানশূন্য বদ্ধজীব পূর্ব্বলোক ও পরলোক সম্বন্ধে নিজ নিজ বিশ্বাস ও অনুমান ভিন্ন একটা নির্ব্বিবাদ মীমাংসায় এ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। তবে ইহা ঠিক যে, পূর্ব্ব-লোক বিশ্বাস না করিলে পরলোকতত্ত্ব অধিকতর জটিল বলিয়া মনে হইবে। এই বিষয়টি যিনি যে ভাবে বুঝিয়াছেন, তিনি সেই ভাবে সেইরূপই ব্যাখ্যা ও মীমাংসা করিয়াছেন, সেজন্যই বৈদিক যুগ হইতে পরলোক ও পুনর্জ্জন্ম লইয়া নানা মত, নানা তর্কবিতর্ক উত্থাপিত হইয়া আসিতেছে। বেদ-

সংহিতার অনেক স্থানে যে, পরলোকতত্ত্ব কথা আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

১

অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ
পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্।
জ্যোক্ পশ্যেম সূর্য্যমুচ্চরন্তমনুমতে
মৃড়য়া নঃ স্বস্তি॥ ঋক্। ৮।

অসুনীতে—হে সুখদায়ক পরমেশ্বর!

পুনরস্মাসু চক্ষুঃ—আপনি আমাদিগকে পুনর্জ্জন্মে নেত্রাদিরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা সংযুক্ত করুন।

পুনঃ প্রাণং—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, বল ও পরাক্রমাদিযুক্ত দেহ দান করুন।

ইহ নো ধেহি ভোগম্—ইহ সংসারে আমাদিগকে ভোগ প্রদান করুন।

জ্যোক্ পশ্যেম সূর্য্যমুচ্চরন্তং—হে ভগবন্, আমরা যেন সূর্য্যলোকে শ্বাস-প্রশ্বাসাত্মক প্রাণকে দেখিতে পাই।

অনুমতে মৃড়য়া নঃ স্বস্তি—হে অনুমন্ত পরমেশ্বর। আপনি আমাদিগকে সকল জন্মেই সুখী করুন।

২

পুনর্নো অস্থং পৃথিবী দদাতু
পুনৰ্দ্যৌর্দেবী পুনরন্তরিক্ষম্ ।
পুনর্নঃ সোমস্তন্বং দদাতু
পুনঃ পূষা পথ্যাং যা স্বস্তি ॥ ঋক্ । ৮ ।

পুনর্নো ...দদাতু—হে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবন্ ! আমরা যাহাতে পুনঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাণাদি প্রাপ্ত হই আপনি তাহার বিধান করুন।

পুনর্নঃ সোমস্তন্বং দদাতু—পুনর্জ্জন্ম সময়ে আমাদিগের পক্ষে যেন সোমরস উত্তম শরীর প্রদানে অনুকূল থাকে।

পুনঃ পূষা......স্বস্তি—হে পুষ্টিকর্ত্তা ভগবন্ আপনি পুনর্জ্জন্মকালে আমাকে ধর্ম্মমার্গী করুন এবং যাহাতে সর্ব্ববিধ দুঃখ নিবারিত হয় এইরূপ স্বস্তি প্রদান করুন।

পুনর্ম্মনঃ পুনরায়ুর্ম আগন্ পুনঃ
প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্ পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং
ম আগন্ ।

বৈশ্বানরো অদব্ধস্তনূপা অগ্নির্নঃ
পাতু দুরিতাদবদ্যাৎ ॥ যজু । ৪ ।১৫

পুনর্ম্মনঃ পুনরাত্মা—হে সর্ব্বজ্ঞ ভগবন্ ! আমি পুন-

র্জ্জন্মে যেন শুদ্ধমন, পূর্ণায়ুঃ, আরোগ্য, প্রাণ, জীবাত্মা, উত্তম চক্ষু, ও শ্রোত্র প্রাপ্ত হই।

বৈশ্বানরো অদব্ধঃ = হে বিরাট্! আপনি বিশ্বে বিরাজিত, আপনি আমার দেহকে জন্ম জন্ম পালন ও পোষণ করুন।

অগ্নির্নঃ—হে বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ পরমেশ্বর! পাতুদুরিতাদবদ্যাৎ—জন্ম জন্মান্তরে আপনি আমাকে সর্ব্ববিধ দুষ্ট কর্ম্ম হইতে পৃথক্ করিয়া রক্ষা করুন।

৪

পুনর্মৈত্বিন্দ্রিয়ং পুনরাত্মা দ্রবিণং ব্রাহ্মণং চ।
পুনরগ্নয়ো ধিষ্ণ্যা যথাস্থাম————॥

অথর্ব্ব।

পুনর্মৈত্বিন্দ্রিয়ম্—হে ভগবন্! আমি যেন পরজন্মে মনাদি একাদশ ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহ প্রাপ্ত হই।

পুনরাত্মা—প্রাণ ধারণের শক্তি যেন প্রাপ্ত হই।

দ্রবিণং—বিদ্যাদি শ্রেষ্ঠধন।

ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মনিষ্ঠা।

পুনরগ্নয়ঃ—জন্মান্তরে যেন অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারি।

ধিষ্ণ্যা যথাস্থাম—পূর্ব্বজন্মে যেমন শুভগুণ ধারণকারী

বুদ্ধি ও উত্তম দেহের সহিত সংযুক্ত ছিলাম, সেই প্রকার পুনর্জ্জন্মে সুবুদ্ধি সহ মানবদেহ প্রাপ্ত হই।

৫

আ যো ধর্ম্মাণি প্রথমঃ সসাদ
ততো বপূংষি কৃণুষে পুরূণি।
ধাস্যুর্যোনিং প্রথম আবিবেশা যো
বাচমনুদিতাং চিকেত॥ অথর্ব্ব। ৫। ১। ১১

আ যো ধর্ম্মাণি—জীব পূর্ব্বজন্মে যে প্রকার ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিল, সেই আচরণের ফলে পরজন্মে নিজ কর্ম্মফলানুযায়ী একটি দেহকে আশ্রয় করে।

ধাস্যুর্যোনি—পূর্ব্বজন্মের কৃত পাপপুণ্যের ফল ভোগ করিবার স্বভাবযুক্ত জীবাত্মা পূর্ব্বদেহত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহে সম্পরিষ্বক্ত হইয়া প্রথমে বায়ুতে প্রবেশ করিয়া তথায় কিছু কাল অবস্থিতি করেন। পরে বায়ু হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জল ওষধি ও প্রাণাদিতে প্রবেশ করিয়া বীর্য্য মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তৎপরে উত্তমাধম যোনিতে প্রবেশ করিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যো বাচমনুদিতাং চিকেত—যে জীব অনুদিত বেদবাণী মতে ধর্ম্মাচরণ করেন, তিনি মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া নানা-

বিধ সুখভোগ করিয়া থাকেন। অপরপক্ষে জীব বেদবাণীর বিরুদ্ধাচরণ করিলে তীর্য্যক্ শরীর প্রাপ্ত হইয়া দুঃখভোগ করিয়া থাকেন।

৬

গর্ভে নু সন্নন্বেষাম্ বেদমহং
দেবানাং জনিমানি বিশ্বা।
গর্ভে চৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ ॥

ঋক্ । ৩ ।

আমি গর্ভবাস সময়ে দেবতা প্রভৃতি সমুদয় প্রাণীর জন্ম-বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি, এই কথা বামদেব ঋষি বলিয়াছিলেন।

---

# বেদান্তে—পরলোকতত্ত্ব

পঞ্চকোষের আবরণে আবৃত জীবাত্মা কোথা হইতে স্থূল জগতে আসে এবং কোথায়ই বা চলিয়া যায় এ সম্বন্ধে সেই আদিযুগে মানব নানা চিন্তার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি একজন নন দুইজন, নতুবা এক স্থানে শুইয়া থাকিয়া নানাস্থানে তিনি বেড়াইলেন কি করিয়া? কখন অন্যায় কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে কে যেন তাঁহাকে শাসনের ইঙ্গিতে সে কার্য্য হইতে বিরত করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহা দেখিয়া জীবিতকালে যিনি শাসন করিতেন তাঁহারই প্রেতাত্মা এখনও শাসন করিতেছে, আদিযুগের মানবের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল। এইভাবে মানব মনে জড়দেহ ব্যতীত অপর একটি শক্তির সত্তা উপলব্ধি হইয়াছিল। 'বৈদান্তিক পর-লোকতত্ত্বের কথা বলিতে গিয়া অগ্রে বৈদিক সময়ের পর-লোকে বিশ্বাসের কথা বলা প্রয়োজন, কেন না সেই বিশ্বাসই প্রবাহক্রমে জনসমাজে প্রচলিত হইয়া বৈদান্তিক সময়ে সূক্ষ্মাকার ধারণ করিয়াছে। * * * আমাদের সম্মুখে বিশ্বরূপ বিস্তৃত প্রকৃতি-গ্রন্থ যেরূপ বিদ্যমান, তেমনি

মনুষ্য প্রকৃতিরূপ গ্রন্থও বিদ্যমান। যে ভাবে যেরূপে বাহিরের প্রকৃতির অধ্যয়ন করিতে হয় সেই ভাবে সেইরূপে আন্তরিক প্রকৃতির অধ্যয়ন করাও প্রয়োজন। সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বপদার্থে যে প্রজ্ঞা বিদ্যমান, সেই প্রজ্ঞা আমাদের ভিতরেও বিদ্যমান, সুতরাং অন্তর ও বাহির হইতে প্রজ্ঞার একত্ববশতঃ আমাদের নিকটে যে নব নব জ্ঞান প্রকাশ পায়, সেই জ্ঞান বাহ্য ও আন্তর বিজ্ঞানরূপে পরিণত হয়। বাহ্য ও আন্তর প্রকৃতির মধ্যে কোন বিরোধ নাই, বিরোধ মিথ্যা জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, মনকে বিশুদ্ধ রাখিয়া সংস্কার-দোষবর্জ্জিত করিয়া উভয় প্রকৃতির অধ্যয়ন আমাদের প্রতিজনের কর্ত্তব্য। একই প্রজ্ঞা যদি উভয় প্রকৃতি মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না থাকিতেন, তাহা হইল বিজ্ঞান বলিয়া কিছুই দাঁড়াইত না। * * * বেদ ও বেদান্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বর, জীব ও পরলোকতত্ত্ব নির্ণয়ে যত্ন করি কেন, জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর এই, চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী বৃক্ষলতা প্রভৃতির জন্মবৃদ্ধির ইতিহাস লইয়া যেমন বাহ্য প্রকৃতি, মানবজাতির জন্মবৃদ্ধি লইয়া তেমনি আন্তর প্রকৃতি। আন্তর প্রকৃতির তত্ত্ব জানিতে হইলে জনসমাজের ইতিহাসের মধ্যে এই জন্যই প্রবেশ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে।'

'স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে সূক্ষ্মতমে উত্থান জনসমাজের উন্নতির নিয়ম। * * * স্থূল শরীর—আমি, প্রথমাবস্থায় এ জ্ঞান সকলেরই স্বাভাবিক। কেবল এ সময় আমিকে স্থূল শরীর বলিয়া গ্রহণ করা হয় তাহা নহে, উপাস্যদেব পর্য্যন্ত স্থূলভাবে গৃহীত হইয়া থাকেন। প্রকৃতির যে অংশে দেবশক্তি প্রকাশ পায়, আদিমকালের লোকদিগের নিকটে সেই স্থূল অংশ দেবতা। ঋগ্বেদের সময়ে ইন্দ্র অগ্নি বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক দেবতার স্তোত্র-বন্দনা স্থূলেতে দেবশক্তিদর্শন দেখাইয়া দেয়। সে সময়ে ভস্মীভূত, মৃত্তিকায় প্রোথিত বা জলে নিক্ষিপ্ত মনুষ্যদেহ যে পরলোকে পুনরুত্থান করিবে, এ বিশ্বাস করা আর অসম্ভব কি? আজও সাধারণ লোকে পরলোকে স্থূলদেহ বিনা আত্মার স্থিতি কল্পনা করিতে পারে না। যাঁহারা জ্ঞানে কথঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছেন, তাঁহারা স্থূলদেহের স্থলে সূক্ষ্মদেহ কল্পনা করিয়া তবে আত্মার পরলোকে স্থিতি বিশ্বাস করেন। *

* * * * * * *

'বৈদিক সময়ে শব অগ্নিতে দগ্ধ করাই সাধারণ প্রণালী ছিল, কোথাও কোথাও মৃত্তিকাতে প্রোথিত করাও হইত। উভয় স্থলেই শবদেহের উপরে বন্ধুগণের অত্যধিক আদর প্রকাশ পায়, কেননা দহনযোগে বা মৃত্তিকার চাপে যাহাতে

শবের ক্লেশ না হয়, তজ্জন্য অগ্নি ও পৃথিবীর নিকটে কাতর প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নি যখন দেহকে দগ্ধ করে তখন কোন কোন অঙ্গ বাহিরে পড়িয়া যায়। যখন পরলোকে অগ্নি দেহের অঙ্গসকল দেহে সংযোজিত করিবেন, তখন সেই অদগ্ধ অঙ্গ দেহে বা সংযোজিত না হয়, এই ভয়ে উহাকে লইয়া গিয়া দেহে সংযোজিত করিবার জন্য অগ্নি সন্নিধানে ব্যাকুল প্রার্থনা দৃষ্ট হয়। পরলোকে পত্নী পুত্র প্রভৃতির মধ্যে মিলিত হইয়া মৃত ব্যক্তি পৃথিবীর ভোগের ন্যায় ভোগে রত হন, এ বিশ্বাস বৈদিক সময়ে সুস্পষ্ট। কেবল পত্নী প্রভৃতি নহে পালিত পশুপক্ষ্যাদি সকলই সেখানে গিয়া তাহার সুখ বৰ্দ্ধিত করে। ফলতঃ পৃথিবী ও পরলোক এ উভয়ের মধ্যে বৈদিক সময়ে কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদান্তিক সময়ে স্থূলের পরিহার ঘটিয়াছে। সুতরাং এখানে জ্ঞানানুরূপ দেহপ্রাপ্তি কামনারূপ লোকপ্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পিতৃলোকে স্বাপ্নিক শরীর, গন্ধর্ব্বলোকে সূক্ষ্মোপাধিযুক্ত শরীর, পরমাত্মায় জীবের চিন্মাত্রতা, ব্রহ্মলোকে ছায়া ও আতপের ন্যায় উহার স্থিতি বেদান্তে বর্ণিত হইয়াছে। বৈদিক সময়ে মৃতব্যক্তি লোক-লোকান্তরে ভ্রমণ করে এরূপ বিশ্বাস ছিল। এ সকল লোকলোকান্তর পৃথিবীর অনুরূপ, পৃথিবীলোক দিব্যলোক

নহে, সুতরাং বৈদিক অনুষ্ঠানে মনুষ্যলোক হইতে মনুষ্য-লোকান্তরে পুনরাবৃত্তি হয়, বেদান্ত এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, বেদান্ত যে পুনরাবৃত্তি বর্ণন করিয়াছেন উহা এই পৃথিবীতে পুনরাবৃত্তি। ব্রাহ্মণ-বিভাগে সূর্য্যের অধোভাগে স্থিত বহুলোক বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল লোক পৃথিবীধর্ম্মাক্রান্ত মনুষ্যলোক; সূর্য্যের উদয়াস্ত ঐ সকলে প্রতিনিয়ত হইতেছে, এ জন্যই তত্তল্লোকস্থ ব্যক্তি সকল এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না, এক লোক হইতে তাহাদিগকে অন্য লোকে যাইতে হয়। দিবারজনীর প্রত্যাবর্ত্তনে ঐ সকল লোক ক্ষয়িষ্ণু, সুতরাং উহাদের অধি-বাসিগণ এক অবস্থায় থাকিতে সমর্থ হয়। ব্রাহ্মণবিভাগের এই বিশ্বাস বেদান্ত যে গ্রহণ করিয়াছেন ছান্দোগ্য স্পষ্ট-বাক্যে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। * * * *
বৈদিক ক্রিয়াকলাপ যাহারা অনুষ্ঠান করে, বাপী তড়াগ কূপাদি খনন আরামাদি স্থাপন ইত্যাদি পুণ্য কার্য্য যাহারা করে, তাহাদের লোকলোকান্তরে ভ্রমণ হয়, ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক চিরদিনের জন্য সেখানে বাস হয় না, বেদান্ত একথা বলিয়া বেদের অবমাননা করেন নাই, কেননা স্বয়ং বেদ কর্ম্মানুষ্ঠায়ি-গণের এইরূপ গতিতেই বিশ্বাস করিতেন্। বেদান্তসিদ্ধ উপাসনা অবলম্বন করিয়া যে গতি হয় সে গতিতে আর

পুনরাবর্ত্তন নাই, দিব্যলোকে নিত্যকাল বসতি হয়। বৈদান্তিক পরলোকতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে এই মুখ্য অপুনরাবর্ত্তনী গতিরই উল্লেখ প্রয়োজন।’

‘অপুনরাবর্ত্তনী গতি দ্বিবিধ। প্রথমটীতে যদিও পৃথিবীলোকে পুনরাগমন হয় না, তথাপি ইচ্ছামত বিবিধ দিব্যলোকে ভ্রমণ হইয়া থাকে। সেই সেই লোকের ঐশ্বর্য্যসম্ভোগ ঈদৃশ গতির কৃতার্থতা। যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া গৃহীর ধর্ম্মাচরণ করেন, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্যানিরত, তাঁহারাই এইরূপ স্বেচ্ছামত দিব্যলোকসমূহে ভ্রমণ করিতে অধিকারী হন। এতন্মধ্যে যাঁহারা ছল-কপট মিথ্যাচরণশূন্য তাঁহারা অপুনরাবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মলোকে স্থিতি করেন। সত্যের যিনি পরমনিধান তাঁহাকে পাইবার জন্য এক সত্যই উপায়। সত্যের দ্বারা সমুদয় জয় করিয়া দেবভাব প্রাপ্তি হয়। রসস্বরূপ পরব্রহ্মে স্থিতিতে সম্যক্ অভয়লাভ হইয়া থাকে। এ অবস্থায় সাধক অনুমাত্রও বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারেন না। * * * * রসস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনায় সমগ্রজীব ও সমগ্র জগতের সহিত একাত্মতা উপস্থিত হয়। এই একাত্মতায় পরব্রহ্মে নিত্য আনন্দসম্ভোগ সাধকের কৃতার্থতা। ওঙ্কারাবলম্বনে আকাশস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনায় পর-পর-উৎকৃষ্ট

জীবনলাভ হয়, একথা বলিয়া বেদান্ত অনন্তজীবন প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং তিনি যে ক্ষুদ্র জীবের অনন্তত্ব প্রাপ্য বিষয় বলিয়াছেন তাহা কিরূপে সিদ্ধ হয় তাহা ইহাতেই দেখাইতেছেন। শোভাদাতা বলিয়া সর্ব্বপ্রকাশক বলিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিলে নিখিল শোভাও দীপ্তি প্রাপ্তি হয় এবং জীবনান্তে বৈদ্যুতিক-পুরুষ দেবপথে ব্রহ্মপথে উপাসককে ব্রহ্মসন্নিধানে উপনীত করেন, আর মনুষ্যলোকে পুনরাবৃত্তি হয় না। * * *
যে দিন কোন ব্যক্তির পরলোকগমন হয়, সেই দিনই কোন কোন বন্ধু তাহার প্রমুক্ত আত্মাকে পূর্ব্বানুরূপ দেখিতে পান। এ দিনের পর দর্শন-দানের দিন দূর দূর হইয়া পড়ে, সংবৎসর পরে দর্শনদান নিবৃত্ত হয়। দিন, পক্ষ, ছয়-মাস, সংবৎসর এ লোকের সহিত সম্বন্ধ থাকে, সংবৎসর পর আদিত্য চন্দ্র ও বৈদ্যুতিক লোকে তাহার প্রবেশ হয়, সেখান হইতে বৈদ্যুতিক-পুরুষ তাহাকে ব্রহ্মলোকে উপনীত করেন, আর ইহলোকের সহিত সম্বন্ধ থাকে না। * * * *'

পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা সাধনে যে প্রমুক্ত আত্মার বিশেষ গতি লাভ হয় এসম্বন্ধে উপনিষৎ বলেন,—'পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা গৃহস্থগণের সাধনের বিষয়। দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ এই পাঁচটীকে পঞ্চাগ্নি এবং আদিত্যাদিকে

সমিধাদি যজ্ঞের উপকরণ কল্পনা করা হইয়াছে। আকাশ হইতে বর্ষণ হয়, সেই বর্ষণে পৃথিবী শস্যশালিনী হয়, সেই শস্য জীব ভক্ষণ করিয়া সন্তানোৎপাদনে সামর্থ্যলাভ করে। এই সন্তানোৎপাদন ব্যাপার মধ্যে জীবের গতিচিন্তন পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার উদ্দেশ্য। যে সকল জীব জন্মগ্রহণ করে তাহাদের আকাশ হইতে বৃষ্টিতে, বৃষ্টি হইতে পৃথিবীতে অবতরণ হইয়া অন্নযোগে জীবদেহে প্রবেশ এবং সেই জীবদেহের উপাদান হইতে পুত্র-কন্যাকারে প্রকাশ, উপনিষদের এই মত। এ মত এই দেখাইয়া দেয় যে জীব নিত্য অবিনাশী, যতদিন পর্য্যন্ত না আবার ব্রহ্মে স্থিতি হইতেছে, ততদিন তাহাকে জন্ম মৃত্যুর অধীন থাকিতে হয়, পৃথিবীর সমধর্ম্মী লোকসকলেতে ভ্রমণ করিতে হয়। * * * * সৃষ্টি প্রক্রিয়া মধ্যে স্রষ্টাকে দর্শন অতি স্বাভাবিক। সন্তানজন্মমধ্যে এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া আমাদের বুদ্ধিগোচর হয়, সুতরাং তন্মধ্যে স্রষ্টাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দর্শন করিয়া বেদান্ত এই বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।'

গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের প্রতি বেদান্তের সবিশেষ অনুরাগ ছিল। মৃত্যুর সময় পিতা একটি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন। তখন পিতা পুত্রকে বলিতেন—'তুমি বেদ, তুমি যজ্ঞ, তুমি লোক। প্রত্যুত্তরে পুত্র বলিতেন—'আমি বেদ, আমি যজ্ঞ, আমি

লোক।' বেদান্তের মতে তিনটি লোক যথা,—মনুষ্যালোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। পুত্রোৎপাদন দ্বারা মনুষ্যলোক, সৎকর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক এবং বিদ্যাদ্বারা দেবলোক জয় করা হইত। উপরোক্ত উক্তি প্রত্যুক্তির মর্ম্মার্থ এই—পুত্রকে বেদ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রেতে যে নূতন বেদ অবতীর্ণ হইবে তাহার সহিত পিতার বেদের একতা করিয়া দেওয়া। পুরাতন যজ্ঞের সহিত পুত্র কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নূতন যজ্ঞের একত্ববিধান এবং পিতা যে সকল লোক জয় করিয়াছেন তাহার সহিত পুত্র যে সকল লোক জয় করিবেন সেইগুলির একত্ববিধান হইলেই গৃহীর কর্ত্তব্যের পূর্ণতা সাধন করা হইল। ক্রিয়া শেষে পিতা বলিতেন—'ইহলোক হইতে এই সকল আমার পৃষ্ঠবল হইয়া আমাকে রক্ষা করুক।' এই অনুষ্ঠান দ্বারা পিতা সর্ব্বেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া পুত্রে সম্প্রবেশ করেন ইহাই বুঝায়। নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া পিতা অনেক কর্ম্ম করিয়া উঠিতে পারেন নাই, এই অকরণ জনিত অপরাধ হইতে পুত্র পিতাকে পবিত্র করেন, এজন্য তাঁহার নাম পুত্র।

বেদান্ত মতে পাপস্পর্শবর্জ্জিত না হইলে আত্মার পরব্রহ্মের সহিত একত্ব বিধান হয় না। বেদান্ত হইতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে "সমুদয় জগতের সহিত সাধ-

কের একাত্মতা উপস্থিত হওয়াই বেদান্তের মুখ্য গতি। সকল প্রাণের সহিত একপ্রাণ হওয়াই ঈদৃশ একাত্মতার কারণ। প্রকৃতি শক্তি ও জীবশক্তি এই দুই সর্ব্বদা মিশিয়া আছে। জীবশক্তিকে বেদান্তবিদ্‌গণ প্রাণধারণশক্তি বলেন। আত্ম-সদৃশ সর্ব্বভূতের উপরে সমাদরকেই আমরা সমগ্র জগতের সহিত একপ্রাণ হওয়া মনে করি। এ অবস্থায় কেবল হিংসাদি নিবৃত্ত হয় তাহা নহে সর্ব্বত্র মৈত্রী উপস্থিত হয়।"

এই প্রসঙ্গে তিনি বেদান্তসিদ্ধ "দহরবিদ্যার" বিষয়ে বলিয়াছেন 'ক্ষুদ্র হৃদয়াকাশে ব্রহ্মদর্শন করিয়া সেই ক্ষুদ্রাকাশকে অনন্তাকাশের সঙ্গে মিশাইয়া অনন্ত ব্রহ্মকে হৃদ্‌গোচর করা এই উৎকৃষ্ট বিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্য। এখানে পরব্রহ্মের সত্য-কাম সত্যকল্পত্বাদি কল্যাণগুণ অনুভব করিয়া সাধক তদ্ভাবাপন্ন হন। এই তদ্ভাবাপন্নতায় পরলোকগত ব্যক্তি ইচ্ছামাত্র পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী সখা প্রভৃতির সহিত কেবল মিলিত হন তাহা নহে, অভিলাষমাত্র সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবিষয় প্রাপ্ত হন। এস্থলে বেদান্ত একটি অতি গূঢ় তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। আমরা যে কোন ব্যক্তি বা পদার্থের সহিত সম্বদ্ধ হই, উহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কোন কালে বিচ্ছিন্ন হয় না, উহারা আমাদের হৃদয়ে নিত্যকালের জন্য স্থিতি করে। যদি ইহাই হইল তাহা হইলে এ জীবনে

কেন আমরা তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করি না। প্রত্যক্ষ করি না এই জন্য যে উহারা অনৃত দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। *

*　　　*　　　*　　　*

যাঁহারা দহরবিদ্যার উপাসক তাঁহারা পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া পরলোকগত হন, এবং তাঁহারাই এই প্রচ্ছন্ন বিষয় সকল যথেচ্ছ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ।”

মুক্তি সম্বন্ধে বেদান্ত বলেন মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যায়, তাহার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। সৃষ্টির আদিতে সকলই ব্রহ্মের সহিত অবিভক্ত ভাবে মিশিয়া ছিল, সৃষ্টির সময় বিভক্তাবস্থায় প্রকাশ পাইল। যদিও বিভক্তাবস্থায় জগৎ প্রকাশ পাইল, তথাপি তখনও পর-ব্রহ্মের সহিত অবিভক্ততা দূর হইল না। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে এই তত্ত্বটী বিশদভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরম্ যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেব ত আত্মান্ত-র্যাম্যমৃতঃ॥ ইত্যাদি। অর্থাৎ 'সমগ্র প্রাকৃতিক ও আধ্যা-ত্মিক ব্যাপারের পশ্চাতে অন্তর্যামীরূপে ব্রহ্মচৈতন্য বিদ্যমান, তাঁহারই মহাশক্তিতে জগৎ শক্তিমান্, তাঁহারই প্রাণনে

জগৎ ক্রিয়াবান্ এবং তাঁহারই সংযমনে জগৎ ব্যাপারবান্।'
এই ব্রহ্ম-শক্তি-প্রসূত প্রাণ-শক্তি, আমাদের অন্তরেও বাহিরে বিদ্যমান থাকিয়া আমাদিগকে সেই মহাশক্তির সঙ্গে অবিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই তত্ত্ব অর্থাৎ জগৎ জীব ও নিয়ন্তা বিরোধ পরিহার করিয়া এক হইলে ব্রহ্মেতে এই তিনের বিরোধ ভাব দূর হইয়া যায়, বৃহদারণ্যকের মধুবিদ্যায় ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। সেখানে এই অন্তর্যামী শক্তিকে 'তেজোময় অমৃতময় পুরুষ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ
পৃথিব্যৈ সর্ব্বানি ভূতানি মধু,
যশ্চায়মস্যাং অস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষো
যশ্চায়ম্ অধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ
অয়মেব স যোঽয়মাত্মা ইদমমৃতম্ ইদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥'

এই বিরোধশূন্যতা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মভাবে 'স্থিতি' বলিয়া অভিহিত হয়। এই স্থিতিকে বেদান্তে 'ব্রহ্মলোক' বলিয়া থাকে। সাধক যখন পাপের অতীত হন, চিত্ত অভিমানশূন্য হয়, হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়, মোহসংশয় ছিন্ন হয়, তখনই তিনি ব্রহ্মলোকে অবস্থিত হইয়া সিদ্ধ হন। এই অবস্থায় সাধক বিবিধ ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করেন।

জীবের কৈবল্যাবস্থা উপস্থিত হইলে সৃষ্টির বিলয় হয়, সুতরাং যতদিন সৃষ্টির বিলয় না হইতেছে, ততদিন কৈবল্য কেবল সম্ভাবনা মাত্র মধ্যে গণ্য। সৃষ্টির বিলয় ঈশ্বরেচ্ছাধীন, জীবের ইচ্ছাধীন নহে। যতদিন মুক্তি না হইতেছে ততদিন দেহান্তে জীবের কিরূপে স্থিতি হয় সে সম্বন্ধে বেদান্ত বলেন, —'জীব যখন ইহলোক হইতে লোকান্তরে চলিয়া যায় তখন পরমাত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া প্রস্থান করে। * যখন সে দেহবিমুক্ত হইল তখন সে বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়, জলময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্ম্মময়, অধর্ম্মময়, সর্ব্বময় হইয়া এরূপ ওরূপ সকলই হইল। ফলতঃ যে যেরূপ কর্ম্ম করে যেরূপ আচরণ করে সে সেইরূপ হয়। সাধুকার্য্যকারী সাধু হয়, পাপকার্য্যকারী পাপী হয়। পুণ্য কর্ম্মে পুণ্য, পাপ কর্ম্মে পাপ হইয়া থাকে। এই সকল কথায় এই দেখাইতেছে, প্রত্যেক আত্মা স্ব স্ব আচরণানুসারে মৃত্যুর পরও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া স্থিতি করে, প্রাকৃতিক সূক্ষ্ম উপাদানগুলিও তাহার সঙ্গে থাকিয়া যায়। যতদিন আত্মা সকল কামনা হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মকাম

---

* সংহৃতি সম্পরিষক্তঃ।

না হইতেছে, ততদিন তাহার লোকলোকান্তরে ভ্রমণ নিবৃত্ত হয় না, অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম হইলে আর তাহার এখানে ওখানে গমন হয় না, ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মেতেই তাহার স্থিতি হয়।' †

---

† এই প্রবন্ধটী মূলতঃ নববিধান সমাজের ভক্ত উপাধ্যায় ৺গৌরগোবিন্দ রায় কর্তৃক সপ্তসপ্ততিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে গৃহীত।

# মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কিনা?

বেদাংশরূপে উপনিষৎ সমগ্র হিন্দুজাতির ভক্তি ও শ্রদ্ধার আস্পদ, ইহার আলোচনা ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব ও উচ্চ আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিবার সম্ভাবনা নাই। জীবের মনোবৃত্তির ক্রমোন্নতির সঙ্গে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার জন্ম প্রবৃত্তি জন্মে। এই আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার আলোচনাই উপনিষৎ গ্রন্থের বিষয়। বিভিন্ন উপনিষদে আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন প্রশ্ন তুলিয়া তাহার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কঠোপনিষদে আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ, মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কিনা, ইহারই আলোচনা আছে। এখানে ঋষিকুমার নচিকেতা প্রশ্ন করিতে-ছেন এবং পরলোকের অধীশ্বর যম উত্তর দিতেছেন। যম নচিকেতাকে তিনটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। প্রথম দুইটি বরে যথাক্রমে পিতার মানসিক উদ্বেগের নিবৃত্তি ও ক্রোধশূন্যতা এবং অগ্নিতত্ত্ব লাভ করিয়া তৃতীয় বরের জন্য নচিকেতা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—

'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং,
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥'

মৃতব্যক্তি সম্বন্ধে এই যে এক সন্দেহ ( বিচিকিৎসা ) আছে—

'কেহ বলে, আত্মা
রহে মৃত্যু-পরে,
কেহ বলে, নাহি রয়।'

আমি তোমার উপদেশে এই তত্ত্ব জানিতে চাই।

পরলোকতত্ত্বের এই প্রশ্ন শুনিয়া যম বলিলেন—

'দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা,
নহি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ।'

পূর্ব্বে দেবতারাও এই সূক্ষ্মতত্ত্ব বিষয়ে সংশয়যুক্ত ছিলেন ; যেহেতু—

'অতি সূক্ষ্ম ইহা,
সুবিজ্ঞেয় কভু নয়।'

হে নচিকেতঃ, তুমি এই বর ত্যাগ করিয়া অন্য বর প্রার্থনা কর।' যমের মুখে এই কথা শুনিয়া নির্ভীক ও সত্যসন্ধ বীরবালক নচিকেতা 'মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা বলিয়া কিছু

থাকে কি না' এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের মীমাংসার জন্য অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—

'দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল,
ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ।'

কারণ

এ তত্ত্ব বুঝাতে
বক্তা তব সম
নাহি আর অন্য জন।'

পরলোকতত্ত্ব প্রেতাধিপতি যম ভিন্ন আর কে বুঝাইবেন।

এইবার যম জ্ঞানপিপাসুর নিকট সর্ব্ববিধ পার্থিব প্রলোভন ও ভোগ্যবস্তুর বিষয় উপস্থাপিত করিয়া কহিলেন,—

'লও এই স্বর্ণ
গজ, বাজী পশুচয়;
লহ সুবিস্তৃত
ধরণীর অংশ,
ইচ্ছা তব যদি হয়।
শতবর্ষজীবী
পুত্র, পৌত্র লহ,

কিম্বা যদি চাহে মন,
নিজ ইচ্ছামত,
লহ পরমায়ু
ভোগহেতু ধন, জন।’

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

শুধু কি পার্থিব ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন, তাহা নয়, যম রমণীর কমনীয় সৌন্দর্য্যে নচিকেতাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন,—

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকে,
সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব,
নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ॥

*　　*　　*　　*

‘এই রথারূঢ়া
বাদিত্র-বাদিনী
লহ চারু রামা-দল,
এ সবার সমা

মিলিবে না কভু
অন্বেষিলে ভূমণ্ডল।
এই রামাদলে
করিলাম দান,
লহ সেবা এ সবার
মরণের প্রশ্ন,
শুন, নচিকেতঃ!
জিজ্ঞাসা ক'র না আর।'

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ইন্দ্রিয়জনিত সুখ-সম্ভোগ, দীর্ঘ আয়ুঃ, অর্থলাভ এবং প্রভুত্ব প্রভৃতির নিষ্ফলতা প্রমাণ করিয়া শ্রেয়ঃকে গ্রহণ এবং প্রেয়ঃকে বর্জ্জন করিবার জন্য দৃঢ়চিত্ত বালক বলিলেন,—

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে॥

'যে মহা সংশয়
করিবারে দূর
চাহে সদা বহুজন,
যে তত্ত্ব জানিলে

পরলোক-কথা
নাহি রহে সংগোপন,
তোমার নিকট
চাহি তা' শিখিতে
শুন, প্রেত অধীশ্বর!
এই বর বিনা
নচিকেতা আর
না চাহে অপর বর।'

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

নচিকেতার দৃঢ়তা দেখিয়া যম অত্যন্ত খুসী হইলেন। এইবার তিনি ঋষি বালকের প্রার্থিত তৃতীয় বর পূর্ণ করিবার উদ্দেশে আত্মার অবস্থিতি-স্থান, ইন্দ্রিয় হইতে মন, বুদ্ধি, আত্মা, পরমাত্মা পর্যান্ত ক্রমোচ্চ ভাব বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ বলিলেন,—

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং,
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥

চিন্তাহীন এবং বিষয়-মোহে আচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট পরলোক পরিস্ফুট হয় না ; ইহলোক আছে পরলোক নাই এই বিশ্বাসে কেবলমাত্র ঐহিক সুখে মত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ আমার অর্থাৎ মৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে। তারপর যম নচিকেতাকে আত্মার স্বরূপ বলিতে লাগিলেন,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

জ্ঞানময় আত্মার জন্মমৃত্যু নাই। ইনি কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হন নাই, অথবা ইহা হইতেও কোন পদার্থ উৎপন্ন নহে। শরীর ধ্বংস হইলেও ইনি ধ্বংস হন না ; ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতু-প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥

সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, মহৎ হইতে মহৎ আত্মা প্রাণিসমূহের হৃদয় গুহায় অবস্থিত। কামনাশূন্য ও বিগতশোক ব্যক্তি

শরীরধারক মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নাবস্থা হইলে আত্মার মহিমা দর্শন করেন।

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥

আত্মা স্থির হইয়াও দূরে গমন করেন, অচল হইয়াও সর্ব্বত্র যান। সেই হর্ষাহর্ষ অর্থাৎ আপাত বিপরীত ধর্ম্ম-যুক্ত দেবতাকে আমি ভিন্ন আর কে জানিতে পারে?

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

এই আত্মাকে বেদপাঠ বা মেধা বা বহু শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না। যাঁহাকে পরমাত্মা আত্মদর্শনের জন্য বরণ করেন, তাঁহা দ্বারাই ইনি লভ্য। তাঁহার নিকটে তিনি স্বরূপ প্রকাশ করেন।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই জাতি সর্ব্বজীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কিন্তু ইহাঁরাও সেই পরমাত্মার অধীন। এমন কি মৃত্যুকেও তিনি গ্রাস করেন। তাই যম বলিলেন—,

যস্য ব্রহ্ম চ, ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং, ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥

জীব ও পরমাত্মার স্বরূপগত ভেদ বুঝাইয়া যম কহিলেন—,

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে,
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি,
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥

এ জগতে ব্রহ্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানরূপ হৃদয়-গহ্বরে প্রবিষ্ট থাকিয়া জীব ও ব্রহ্ম আপনার অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ ছায়াতপের ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন বলেন, ত্রিণাচিকেতা পঞ্চাগ্নিগণও এইরূপ বলেন।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥

আত্মাকে রথী, দেহকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে লাগাম বলিয়া জানিবে।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥

মনীষীরা ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব; শব্দাদি বিষয়সমূহকে সেই ইন্দ্রিয়গণের বিচরণ স্থান বলিয়া থাকেন এবং ইন্দ্রিয়মনোযুক্ত আত্মাকে রথী বা ভোক্তা বলিয়া কহেন।

ইন্দ্রিয় হইতে মন, বুদ্ধি, আত্মা, পরমাত্মা পর্য্যন্ত ক্রমোচ্চ-ভাবের অপূর্ব্ব বর্ণনা ইহাতেই আমরা দেখিতে পাই—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ। মহৎ হইতে জগতের আদি কারণ স্বরূপ অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই—

'সেই শেষ, সেই গতি,
নাহি তদুপর।'

*   *   *   *
*   *   *   *

সর্ব্বজ্ঞানের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি কখনও শোকে কাতর হন না—

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥

*   *   *   *

জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ বুঝাইয়া কল্যাণময়ী শ্রুতি বলিলেন—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।
এতদ্বৈ তৎ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ।
এতদ্বৈ তৎ॥

অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ অতি সূক্ষ্ম পুরুষ দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছেন—

'তাঁহার শাসন বলে
চরাচরে সবে চলে
ভূত, ভাবী, বর্ত্তমানে ব্রহ্মাণ্ডের মাঝ।
তাঁহার সত্তার জ্ঞান
লভে যেই মতিমান্
আত্ম-সংগোপনে তার বাসনা না হয়,
এই তার হয় মনে
অভিন্ন ত দুই জনে ;
কারে লুকাইব, আর কারেই বা ভয় !

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

পরমাত্মার যে সর্ব্বশরীরে তুল্যরূপ সম্বন্ধ আছে তাহাই বুঝাইবার জন্য প্রেতাধিপ কহিলেন,—

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্-
হোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমস-
দব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥

সেই আত্মা সর্ব্বত্র গমন করেন বলিয়া 'হংস' পদবাচ্য; দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে আছেন বলিয়া 'শুচিষৎ'; সর্ব্বভূতে অবস্থান করেন বলিয়া 'বসু'; অন্তরিক্ষে বায়ুরূপে আছেন বলিয়া 'অন্তরিক্ষসৎ'; স্বয়ং অগ্নিস্বরূপ বলিয়া 'হোতা'; পৃথিবীরূপ বেদিতে বাস করেন বলিয়া 'বেদিষৎ'; সোম-রসরূপে দুরোণে (কলসী) বাস করেন বলিয়া 'অতিথি' ও 'দুরোণসৎ'। *　*　* তিনি সর্ব্বজগতের কারণ বলিয়া মহৎ।

এই আত্মা দেহ হইতে বিমুক্ত হইলে, দেহেতে আর কি অবশিষ্ট থাকে? ইনিই সেই আত্মা।

মৃত্যুর পর আত্মার গতি সম্বন্ধে যম কহিলেন,—

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥

হে গৌতম, এখন আমি তোমাকে সনাতন ব্রহ্মের বিষয় এবং মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায় তাহা বলিতেছি।

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥

'নিজ নিজ কর্ম্ম
আর জ্ঞান অনুসারে
জন্ম লভে জীব
কর্ম্মফল ভুঞ্জিবারে ;
কেহ হয় পশু, পক্ষী,
কেহ হয় নর ;
কেহ বা উদ্ভিদ হয়,
কেহ বা স্থাবর।' †

* * * *

* * * *

† কবিতানুবাদ অংশগুলি শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'কঠোপনিষদ্' হইতে গৃহীত।

যিনি ভগবানের মহিমা বুঝিতে চান, যিনি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ বুঝিতে চান, যিনি পরলোকতত্ত্ব জানিতে চান তাঁহাকেই বিষয়-মোহ পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বের অন্বেষণে যাইতে হইবে, তাই মাতার ন্যায় শ্রুতি বলিলেন—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

*  *  *  *

*  *  *  *

---

# গীতায় জন্মান্তরবাদ ও পরলোকতত্ত্ব

গীতাকার জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জ্জন্ম এবং পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে যেখানে যেখানে বলিয়াছেন, সেইখানেই তাহা কেবলমাত্র প্রসঙ্গক্রমে উত্থিত হইয়াছে। নিম্নে সেই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করা গেল।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ২।১৩

* * * *

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২।২২

* * * *

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরং।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৮।৫-৬

*　　*　　*　　*

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতোযোগধারণাং॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং॥ ৮।১২-১৩

*　　*　　*

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ৮।২৩
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাসা উত্তরায়ণং।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ॥ ৮।২৪
ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসা দক্ষিণায়নং।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ৮।২৫
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥ ৮।২৬
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তোভবার্জ্জুন॥ ৮।২৭

*　　*　　*

*　　*　　*

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।

এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ৯।২১

*　　*　　*

*　　*　　*

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথাপ্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৪।১৪-১৫

*　　*　　*

*　　*　　*

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ১৫।৮

*　　*　　*

*　　*　　*

# পরাবিদ্যায় শ্রাদ্ধতত্ত্ব †

জীবদেহ প্রধানতঃ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিনভাগে বিভক্ত। এই দেহ আবার বিভিন্ন কোষের দ্বারা গঠিত। আহারাদির দ্বারা পুষ্ট হয় বলিয়া স্থূলশরীরকে "অন্নময় কোষ" বলে। প্রাণময় বা পিণ্ডদেহ, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের দ্বারা সূক্ষ্মশরীর গঠিত হইয়াছে। মনোময় কোষ সূক্ষ্মশরীরকে ভুবর্লোক ও স্বর্লোকের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মহর্লোকের ( Higher mental Plane ) উপাদান দ্বারা বিজ্ঞানময় কোষ গঠিত। কারণ-শরীরের অপর নাম আনন্দময় কোষ। মৃত্যুকালে সর্ব্ব-প্রথমে প্রাণময় কোষ অন্নময় কোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখন অন্নময় কোষ বা ভাণ্ডদেহ পড়িয়া থাকে। এই দেহ যত শীঘ্র পুড়িয়া ফেলা যায় তত শীঘ্র জীব ভব-

† প্রসিদ্ধ পরাবিদ্যানুশীলনকারী ( Theosophists ) শ্রীমতী এনি বেসান্ট, মিঃ লেডবিটার প্রভৃতি মনীষীগণের 'In defence of Hinduism', 'Other side of Death' গ্রন্থের ভাব লইয়া এই বিষয়টীর অনুসূচনা করা হইয়াছে।

যাতনা হইতে মুক্তিলাভ করে। দেহ ভস্মীভূতের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণময় কোষ খণ্ড খণ্ড হইয়া সূক্ষ্মশরীর হইতে বিচ্যুত হয় এবং অবশেষে প্রেতলোকে গমন করে।

ভুবর্লোকের ( Astral Plane ) অংশ বিশেষকেই প্রেতলোক কহে। জীব যদি সংসারে কুকর্ম্ম করিয়া থাকে তাহা হইলে মনোময় কোষের স্থূল উপকরণ সংযোগে যাতনা শরীর গঠিত হয় এবং ঐ দেহে থাকিয়া সে ফলভোগ করে। সৎকর্ম্মী হইলে মনোময় কোষের স্থূল উপকরণ ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং তখন জীব শুদ্ধ মনোময় কোষ সহ পিতৃলোকে যাইয়া উপস্থিত হয়। কিছুকাল পর যখন মনোময় কোষ কামনা হইতে একেবারে পরিশুদ্ধ হয় তখন জীব স্বর্গলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। এখানে আসিয়া পৌঁছিলেই শ্রাদ্ধাদির কোন প্রয়োজন নাই।

মৃত্যুর পর আত্মার কোষ বা স্থূল শরীরকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। এই সময় শ্মশানবন্ধুগণ 'হরিবোল' 'রাম রাম' 'সীতারাম' ধ্বনি করিয়া থাকেন। এরূপ করিলে শব্দ শক্তির স্পন্দন অন্নময় কোষের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। যাহাতে জীব তাড়াতাড়ি অন্নময় কোষ হইতে বিচ্যুত হইয়া গন্তব্যপথে চলিয়া যাইতে পারে এজন্য শ্মশানে মন্ত্রোচ্চারণের বিধি। মন্ত্রের উচ্চারণের দ্বারা এক

প্রকার স্পন্দন উৎপন্ন হয়, উহা প্রাণময় কোষ বা পিণ্ডদেহে আঘাত করিয়া থাকে এবং অধিক মাত্রায় স্পন্দন হয় বলিয়া উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া প্রেতলোকে গমন করে। প্রেত-লোকে জীবকে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিতে হয়, তাই অনেক সময় জীবের প্রেতলৌকিক দেহ তাহাকে রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত যাতনা দিয়া থাকে। এইবার শ্রাদ্ধের কথা। পরলোকগত আত্মাকে ইহলোকের আত্মীয় স্বজন ভক্তিভাবে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান দ্বারা সাহায্য করিতে সক্ষম। মৃতাত্মা প্রেতলোকে যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, পিণ্ডদাতা তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গলকামনায় ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবেন। শ্রাদ্ধের মন্ত্রশক্তি প্রেতাত্মাগণের প্রেতদেহবর্জ্জন ও দিব্যলোকগমনে সাহায্য করে। *

---

* The Vibrations of the mantras in the subtle matter that surrounds us are like waves that wash up against the body of the Preta, washing away the coarser matter, and quickening the disintegration of the Preta form. The water poured out with mantras and magnetised by them, imparts its helpful magnetism to the Preta form, and so, again, helps forwards the desired disintegration. The Preta comes amid his relatives who thus seek to aid him, and is streng-

এই ক্রিয়া মৃত্যুর পর এক বৎসর ব্যাপিয়া অনুষ্ঠান করিতে হয় এবং বর্ষশেষে সপিণ্ডকরণ হইলেই প্রেত মনোময় কোষ লইয়া পিতৃলোকে বিরাজ করেন। এখানেও তাঁহার আত্মীয়স্বজন ক্রিয়া দ্বারা মনোময় কোষ পরিশুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে স্বর্গলোকে গমনের সাহায্য করিয়া থাকে। এইরূপ সুচিন্তা ও মন্ত্রশক্তি প্রভাবে আত্মার সদ্গতি হয় বলিয়া প্রাচীন ঋষিগণ শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু ভিন্ন অপরাপর জাতিরাও মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মুসলমানদের 'জানাজা' এবং খ্রীষ্টীয়ানদের Mass এবং Prayers আত্মার সদ্গতির জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। *

---

thened, comforted, helped by the work and their loving thoughts, and by their will directed to his freeing.
'*In defence of Hinduism.*' *p. p. 37.*

* 'All civilised peoples fulfil the duty * * * by suitable ceremonies and prayers accompanied by Mantras, Words of Power.'

'Among the Zoroastrians, services for the dead are always performed, but the offerings of food, clothes, etc. have become diverted from their earlier purpose; these should be distributed among the people who are still embodied, as they are useless to the disembodied;

শ্রাদ্ধে মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজন এবং তাঁহাকে উৎসর্গীকৃত দ্রব্যাদি দান করিবার বিধি আছে। শাস্ত্র বলেন—

'শোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্য কব্যানি দাতৃভিঃ।
অর্হত্তমায় বিপ্রায় তস্মৈ দত্তং মহাফলং ॥'

---

the old custom is to give alms of food, clothing, usefu articles of all sorts, at the service for the disembodied, in loving memory of him, and for the purpose of associating with those who love him many grateful hearts, whose rosy wishes of gratitude and good will may form round him a peaceful and happy atmosphere on the other Side.'

'Among the Buddhists there are ceremonies embodying active help to those passing onwards, and quite lately, among the Shinto-Buddhists of Japan, at a service held for those who died in the war just closed (Russo-Japanese war), Admiral Togo addressed the departed ones with love and gratitude, sure that the warm wave of grateful affection would encircle them on the other side of death.'

'Among the Christians, all but the extreme 'Protestants' hold definite services on behalf of the disembodied. In the Greek and Roman churches, representing Christianity in its oldest and fullest form, 'masses for the dead'—in their main principles identical with the principle underlying the Sraddha ceremonies

দাতৃগণ হব্য কব্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দিবেন। বেদজ্ঞ সুশীল ব্রাহ্মণকে যত্নপূর্ব্বক যাহা দেওয়া, তাহাতে মহাফল লাভ হয়। কিন্তু মূর্খকে শ্রাদ্ধান্ন দিবে না, মূর্খকে দান করিলে কোনই ফললাভ হয় না। এই বিষয়টির দুইদিক্ অর্থাৎ কাহাকে দিবে এবং কাহাকে দিবে না মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন— 'ব্রাহ্মণগণ কৃতবিদ্য হইয়াও যদি পতিত, জড়, উন্মত্ত, কুষ্ঠী, ক্লীব, যক্ষ্মরোগী, অপস্মাররোগগ্রস্ত, অন্ধ, চিকিৎসক, দেবল; বৃথা নিয়মধারী, সোমবিক্রয়ী, ক্রীড়াপরায়ণ, গায়ক, নর্ত্তক, বাদক, বৃথাভাষী, যোদ্ধা, শূদ্রযাজী, শূদ্রাধ্যাপক, শূদ্রদাস, শূদ্রাপতি, বেতনভুক্ অধ্যাপক ও শিষ্য, স্মৃতি ও বেদোক্ত-কর্ম্ম বিবর্জ্জিত, মৃতনির্য্যাতক, তস্কর, অজ্ঞাতকুলশীল, গ্রামণী পুত্রিকা পুত্র, ঋণকর্ত্তা, কুসীদজীবী, প্রাণিজীবী, স্ত্রীজীবী, অস্ত্রজীবী ও সন্ধ্যাবন্দনাদিবিহীন হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা কদাপি বিধেয় নহে।'

*    *    *    *

*    *    *    *

—are regularly performed Words and Signs of Power are employed, and bread, water and wine are the things used.' In Defence of Hinduism p. p. 31, 32.

'যাহাদিগের পত্নীগণ সুবৃষ্টি প্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবির ন্যায় স্বামীর ভোজনপাত্রাবশিষ্ট দ্রব্যের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ভোজন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সমুদয় সচ্চরিত্র দুর্ব্বল ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ যাচকভাবে গৃহে উপস্থিত হন, যাঁহারা ভক্তিপরায়ণ ও আশ্রিত হইয়া থাকেন এবং কেবল আবশ্যকের সময় অর্থ প্রার্থনা করেন, যাঁহারা তস্কর ও শত্রু হইতে ভীত হইয়া আগমনপূর্ব্বক ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা নিতান্ত দরিদ্রতা নিবন্ধন আগ্রহপূর্ব্বক দরিদ্র ব্রাহ্মণেরও করস্থিত অন্ন প্রার্থনা করেন, যাঁহারা দেশবিপ্লব নিবন্ধন হৃতদার ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অর্থলাভের নিমিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন, যে সমুদয় ব্রতনিয়মপরায়ণ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ব্রতাদি সমাধানার্থ ধনার্থী হইয়া উপস্থিত হন, যাঁহারা পাষণ্ডদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের শরীর দুর্ব্বল ও ধন কিছুমাত্র নাই, যাঁহারা পরাক্রান্ত দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অন্ন প্রার্থনা করেন এবং যাঁহারা তপস্বী-দিগের নিকট ভিক্ষার্থ গমন করেন, তাহাদিগকেই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি সাধনোদ্দেশে দান করিয়া মহাফল লাভ হইয়া থাকে।' *

* ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত।

ইহাই হইল শ্রাদ্ধের প্রকৃত তত্ত্ব। বিশ্বাসীমাত্রেরই এই ক্রিয়ার শক্তিতে শ্রদ্ধা আছে। আমাদের সুচিন্তা পরলোকে মৃতব্যক্তির রক্ষাকর্ত্রী দেবীস্বরূপা হন এবং তাঁহাকে তাড়াতাড়ি দিব্যলোকে লইয়া যাইতে সাহায্য করে। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণানন্দ স্বামী 'শ্রাদ্ধতত্ত্বে' লিখিয়াছেন—'মানব যখন পার্থিব দেহ ত্যাগ করে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার পার্থিব প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়া যায়। দূষিত পার্থিব ভাব বর্জ্জিত জীব যদি শুদ্ধসদাচারপূত উপাচারে আহুত, পূজিত বা সংকৃত ও শুদ্ধ সঙ্কল্পোদ্‌গীরিত শব্দরূপ মহামন্ত্রে তর্পিত হয়, তবে সেই আত্মা—সেই সূক্ষ্মভাব সূক্ষ্ম অবস্থা সূক্ষ্ম গতি ও অপরিমেয় শক্তি বিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরাবৃত আত্মা যে উন্নত ও পূত হইয়া স্বর্গ হইতে উচ্চ স্বর্গে, সুখ হইতে মহাসুখে, আনন্দ হইতে মহানন্দ-ধামে গমন করিবে, তাহার আর সন্দেহ কি!'

ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই যে জীব ইহলোকে অবস্থানের সময় আত্মীয়স্বজনের সুচিন্তা ও মুখোচ্চারিত মন্ত্রাদি তাঁহাকে পরলোকে সাহায্য করিবে এই যে তাঁহার ধারণা ছিল, পরলোকে গমনের পর তিনি যদি দেখিতে পান যে ইহলোকের আত্মীয়গণ তাঁহার সাহায্যের জন্য সংক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছেন না,—আমাদের সান্ত্বনা ও

কল্যাণের চিন্তা সকল প্রেরণের অভাবে তিনি তখন অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং নিরানন্দে ও দুঃখে কালযাপন করেন। যখন আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের প্রিয়জনের মৃত্যুর পরও আমরা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পারি, তখন আমাদের কর্ত্তব্য আমরা তাঁহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করি। এই জন্য কখনও 'নৈব শ্রাদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ।'

---

# প্রেতত্ব ও কর্ম্মানুসারে জীবের গতি।

যাহাদের দেহ লয় হইয়াছে বা যাহারা চলিয়া গিয়াছে—এই পৃথিবী সম্বন্ধে যাহারা আর বর্ত্তমান নাই—সেই আতিবাহিক দেহধারী আত্মাদেরই প্রেত বা ভূত বলে। দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইবার পর সংসারে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য

'কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।'

কামনাতেই কৃতার্থতা মনে করিয়া যে ব্যক্তি বিবিধ কামনা করে, সে ব্যক্তি কামনা সহকারে সেই সেই লোকে জন্মগ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা

'সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষোহব্যয়াত্মা।'

বিরজ হইয়া সূর্য্যদ্বার দিয়া সেই লোকে গমন করেন, যেখানে সেই নিত্যকালস্থায়ী অমৃত পুরুষ আছেন। জড়দেহে

নাভির উর্দ্ধে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত অষ্টছিদ্র বা বহির্গমনের দ্বার বিদ্যমান। কর্ম্ম অনুসারে জীব এই পথ দিয়া মৃত্যুকালে বাহির হইয়া যায়। গরুড়ের প্রশ্নমতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রাণিগণের গতি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—'মৃত্যুর পর জীবের প্রাণবায়ু সূক্ষ্মীভূত হইয়া তাহার গলদেশ দিয়া বাহির হয়, কাহারও বা কর্ণ, নাসিকা, রোমকূপ বা ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়াও বহির্গত হইয়া থাকে। বায়ুর সহিতই প্রাণ দেহ হইতে বাহির হয়। যাহারা পাপী, তাহাদের প্রাণ 'অপান' (মলদ্বারের বায়ু) বায়ুর সহিত উৎক্রান্ত হয়। যাহারা মায়াপাশে আবদ্ধ, বিষয়-তৃষ্ণায় নিয়ত কাতর, তাহারা নরক প্রাপ্ত হয়। বিষয়-তৃষ্ণা ও উৎকট মোহই পরলোক-গত আত্মার প্রেতত্বের প্রধান কারণ। এই তৃষ্ণা ও মোহ হইতে মুক্ত হইবার জন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

'সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥'

সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের জয় হয় না। সত্যের দ্বারাই দেবযান পন্থা বিস্তৃত হইয়াছে। আপ্তকাম ঋষি-

গণ যে পথে বিচরণ করিয়া সেই স্থান অধিকার করেন যে স্থানে সেই সত্যের পরম নিধান পরব্রহ্ম নিত্য স্থিতি করেন।

এই হইল সত্য দ্বারা সাধকদের মায়া-মোহ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া দেবভাব প্রাপ্তির কথা। কিন্তু যাহারা সাধারণ মনুষ্য, সারা জীবন পাপের ভিতর ডুবিয়া ছিল, তাহারা মৃত্যুর পর অশরীরী প্রেতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সময় সময় তাহারা বিষয়-তৃষ্ণার প্রবল আকর্ষণে সংসারে আগমন করে। তখন তাহারা প্রেতত্ব হইতে মুক্তি কামনায় নিজ পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজন দ্বারা শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। যদি ইহাতে ফল না পায় তাহা হইলে যমলোকে ফিরিয়া যাইয়া সেখানে কালসহকারে কর্ম্মফলের ভোগ শেষ হইলে প্রেতত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়।

পুরাণ মতে প্রেত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা, প্রেত, মহাপ্রেত ও পিশাচ। মহাপ্রেত প্রেতের রাজা, ইহার সঙ্গে অসংখ্য আজ্ঞাবহ প্রেত ভ্রমণ করে। স্মৃতির মতে অশৌচান্তের পর দ্বিতীয় দিবসে প্রেতের প্রেতলোক হইতে বিমুক্তি ও স্বর্গগমন জন্য বৃষোৎসর্গ করিতে হয়। যদি ইহার অন্যথা হয় তাহা হইলে শত শত শ্রাদ্ধ করিলেও প্রেতের পিশাচত্বলাভ হয়। প্রেতের মধ্যে যাহারা মহা-

পাপী, যাহাদের মনে ষড়্‌রিপুর প্রভাব অত্যন্ত বেশী, যাহারা সংসারে থাকিয়া সতত কুকর্ম্ম করিয়াছে, এই সকল আত্মা সাধারণতঃ পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয়। কূর্ম্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতির মতে প্রেতত্ব মৃত্যুর পর হইতে এক বৎসরকাল থাকে। ষোড়শ শ্রাদ্ধের (ঊনবিংশতি পিণ্ডদান) পর সপিণ্ডীকরণ হইলেই প্রেতদেহের অবসানে জীব ভোগদেহ ধারণ করে। এ সম্বন্ধে স্মৃতি বলেন—

'কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরং।
প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥'

মৃত্যুর পর পূরক-পিণ্ডদানে মৃত ব্যক্তির আতিবাহিক দেহ নিবৃত্তিপূর্ব্বক প্রেতদেহ প্রাপ্তি হয়। পূরকপিণ্ডে দশপিণ্ড দিতে হয়, সেইজন্য উহাকে 'দশপিণ্ডও' বলে। দশাহ অশৌচ হইলে প্রত্যহ একটি করিয়া পিণ্ড দিতে হয়। সমস্ত পিণ্ডদান হইয়া গেলে 'ঊর্ণাতন্তুময়ং বাসঃ' মন্ত্রে মেষাদিলোম-নির্ম্মিত বস্ত্র তদাভাবে মেষলোম প্রদান করিতে হয়। এই দশপিণ্ডের সংযোগে প্রথম দিনে মূর্দ্ধা, দ্বিতীয় দিনে গ্রীবা ও স্কন্ধ, তৃতীয় দিনে হৃদয়, চতুর্থ দিনে হস্ত, পঞ্চম দিনে নাভি, ষষ্ঠ দিনে কটিদেশ, সপ্তম দিনে গুহ্য, অষ্টম দিনে উরুদ্বয় এবং নবম দিনে জানু ও চরণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই পূরকপিণ্ড দ্বারা সৃষ্ট প্রেতদেহের

শান্তির জন্য শাস্ত্রকার 'প্রেতাত্র স্নাহিপিব চেদং ক্ষীরম্।' মন্ত্রে নীর-ক্ষীর দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অপর পক্ষে পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড প্রভৃতি পুরাণের মতে জীবের প্রেতত্ব পাপহেতু ঘটিয়া থাকে। বৈদিক মতে যাহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, অথবা যাহারা সততই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান করে, এক বৎসর পর তাহাদের প্রেতদেহের অবসান হইয়া ভোগদেহের বিকাশ হয়। এই ভোগদেহ অনেক কাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পুনরায় প্রেতদেহ লাভ করিয়া থাকে।

'কর্ম্মের অনুসারে জীবের গতি' প্রবন্ধে কামলোক ও কামদেহ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—'মৃত্যুর পূর্ব্বে মানব যতই জগতে পাপাচরণে নিযুক্ত থাকে, ততই তাহাদের মৃত্যুর পর প্রেতত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশী থাকে। * * মৃত্যুর পর জীবকে যে লোকে যাইতে হয় তাহাকে কামলোক কহে। * * * এখানকার চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থই এক সূক্ষ্ম পদার্থে গঠিত। মর্ত্ত্যলোকে সূক্ষ্মতার তারতম্য অনুসারে কঠিন, তরল, বাষ্পীয়, ইথিরিয় প্রভৃতি সাত বিভাগ আছে। এক এক স্তরের পদার্থ অন্য স্তরের পদার্থ অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম। আমরা আমাদের কামনা

বা বাসনাকে বস্তু মধ্যে গণ্য করি না, কিন্তু ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বস্তু হইতেছে। আমাদের মর্ত্ত্যলোকের সর্ব্বোপরি বিভাগের অতি সূক্ষ্ম বস্তুর অপেক্ষাও এই বাসনার নির্ম্মাপক উপাদান অতি সূক্ষ্ম হওয়ায়, আমরা আমাদের বাসনাকে বস্তু বলিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি বিশেষভাবে উন্নত হইয়াছে,—যাঁহারা কামলোকের পদার্থ দেখিতে পাইয়া থাকেন, তাঁহারা দেখেন যে কামলোকের যাবতীয় পদার্থ যে বস্তু লইয়া গঠিত, বাসনাও সেই বস্তু দ্বারা সেইরূপে গঠিত। এবং অন্যান্য বস্তুর ন্যায় বাসনার আকার, বর্ণ প্রভৃতি আছে। তাঁহারা আরও দেখেন যে বাসনা যে পরিমাণে ভাল, সেই পরিমাণে বেশী সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। সুবাসনা অতি সূক্ষ্ম-কণায় নির্ম্মিত, কুবাসনা কাম-লোকের সর্ব্বোপরি স্থূল ( যাহা অবশ্য পৃথিবীর বস্তু অপেক্ষা অনেকাংশে সূক্ষ্ম ) কণা সকলে গঠিত হয়। রাগ, দ্বেষ, হিংসা, ব্যভিচার, পরাপকার, হত্যা করিবার ইচ্ছা প্রভৃতির উপাদান অতি স্থূল। কামলোকে যে সাতটি স্তর আছে, তন্মধ্যে প্রথম স্তর অপর ছয় স্তর অপেক্ষা স্থূল হয়, কাজেই কুবাসনা সকল এই স্তরেরই অন্তর্গত হইতেছে। কাজেই যে সকল মৃত ব্যক্তির মনে কুবাসনা প্রবল রহিয়াছে, তাহাদের কামদেহ এইরূপ স্থূলকণাবহুল হওয়ায় তাহাদের

এই সর্ব্বনিম্ন প্রথম স্তরে বাস ব্যতীত উর্দ্ধস্থ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অপর ছয়টি স্তরে যাইবার অধিকার থাকে না।'

'মৃত্যুর পর মানবের ক্ষিতি, অপ্ তেজ ঘটিত, অর্থাৎ কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় বস্তু ঘটিত ভাণ্ড দেহ পড়িয়া থাকে ও এই দেহ আমরা নষ্ট করিয়া ফেলি। এই ভাণ্ড দেহই আমাদের জড়দেহ, ইহা আমরা সকলেই দেখিতে পাইয়া থাকি। এই দেহ ব্যতীত মানবের আর একটি দেহ এই মর্ত্তালোকে বাসকালে থাকে, তাহাকে পিণ্ডদেহ কহে। এই দেহকে আমরা দেখিতে পাই না। * *

* * * এই পিণ্ডদেহ ভাণ্ডদেহ দাহকালে সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই দাহপ্রথা আজকাল অনেকে ভাল বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। অবশ্য অন্যান্য কারণও আছে। মুসলমান খৃষ্টিয়ান্ প্রভৃতিদের মধ্যে দাহপ্রথা না থাকায় উহাদের পিণ্ডদেহ কবর স্থানের উপরেই বর্ত্তমান থাকে এবং মৃত্তিকার মধ্যে ভাণ্ডদেহ যেরূপ ধীরে ধীরে ধ্বংস হইতে থাকে, ইহাও সেইরূপ ধীরে ধীরে ধ্বংস হইতে থাকে। মৃত্যুকালে কোন মানব স্বীয় আত্মীয়কে দেখিবার জন্য বা তাহাকে আপনার অবস্থা জানাইবার জন্য তীব্র ইচ্ছা করিয়া থাকিলে এই

পিণ্ডদেহ সেই আত্মীয়কে দেখা দিয়া থাকে ও তাহার নিকট যাইয়া থাকে।

*　　*　　*　　*　　*

মর্ত্তালোকে মানবদেহের বহিরাবরণ এই ভাণ্ডদেহ থাকে। মৃত্যুর পর কামলোকে তাহার বহিরাবরণ কামদেহ হইয়া থাকে। এই কামদেহ মর্ত্ত্যলোকের মানবদের জীবিত থাকা কালেও সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে,—কিন্তু মৃত্যুর পর তাহা বিশেষ ভাবে প্রকাশ হইয়া থাকে, এবং আমাদের সকল কার্য্যই এই দেহ সাহায্যে তখন করিতে হয়। জীবিত থাকা কালে মানব পৃথিবীতে এই দেহ-সাহায্যে সুখ দুঃখ বোধ, বাসনা, তৃষ্ণা, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি ভোগ করিয়া আসিয়াছে, কাজেই কামলোকেও মানব ঐ দেহ-সাহায্যে ঐরূপ ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগে সমর্থ থাকে। ইন্দ্রিয়গুলি তাহার পার্থিব দেহে ছিল, কিন্তু ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলি এই কামদেহে থাকায় ইন্দ্রিয়সুখবোধ এই কামদেহ-সাহায্যেই মর্ত্তালোকে মানবের হইয়া থাকে। এই কামদেহ পূর্ব্ব হইতে মানবের সহিত থাকিলেই, মৃত্যুর পর ইহাই বহিরাবরণ হইয়া পড়ায়, এই দেহের কণা ( tissue ) সকল ক্রমশঃ ওলট পালট হইয়া নূতন ভাবে সজ্জিত হইতে থাকে। যে সকল কণা ( cells of tissue ) সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল তাহার দ্বারা সর্ব্ববহিরাবরণ হয়, তাহার

পরের আবরণ তাহার অপেক্ষা একটু সূক্ষ্ম কণায়, তদপেক্ষা একটু বেশী সূক্ষ্ম কণায় তাহার ভিতরের তৃতীয় আবরণ; এইরূপ সূক্ষ্মতার আধিক্য অনুসারে এক এক স্তর অন্য অন্য স্তরের ভিতরে যাইতে থাকিবে। এইরূপ অসংখ্য স্তর লইয়া একটি কামদেহ হইয়া থাকে। আমাদের পার্থিব-দেহের যেমন কণার ক্ষয় হইয়া ভোজন জন্য নূতন কণা জন্মাইতে থাকে, কামদেহের সেরূপ হয় না। * * * ভূলোকে যেমন জড়দেহ ত্যাগ হইলে তাহা নষ্ট করা হয়, কামলোকে জীবের যে ক্ষয়প্রাপ্ত কামদেহ জীব ছাড়িয়া স্বর্গলোকে যায়, তাহা কেহ নষ্ট করে না, কামলোকেই থাকিয়া যায়। এই পরিত্যক্ত অসংখ্য কামদেহ কামলোকে রহিয়াছে। সদ্যমৃতলোকে ঐ সকল পরিত্যক্ত কামদেহ দেখিয়া ভীত হয়। * * * কামদেহ এইরূপে গঠিত ও সজ্জিত হইবার কাল বোধ হয় মৃত্যুর পর দশ দিন। বোধ হয় সেই জন্যই শাস্ত্রে এই দশ দিনে দশপিণ্ড দিবার বিধান আছে। * * এইরূপে কামদেহ সজ্জিত হইলে চৈতন্যশক্তি ঐ কামদেহ মধ্যে থাকিয়া, বাসনা হইতে মনকে পৃথক্ করিতে পারেন। কামদেহের ঐরূপে এক প্রকার দুর্ভেদ্য অবস্থা হওয়ায়, পার্থিবলোকের বাসনা প্রভৃতি যাইয়া আবরণ মধ্যস্থিত চৈতন্যশক্তিকে বড় একটা

আন্দোলিত করিতে পারে না। যতই মানব কামলোকে বাসনা, তৃষ্ণা, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তিগুলির উত্তেজনা বদ্ধ করিয়া থাকিতে পারে, ততই তাহার কামলোকবাসের সময় কমিয়া আসিতে থাকে। * - * যে সকল মানব প্রবল বাসনা বশতঃ পৃথিবীর আত্মীয় স্বজনের জন্য কামলোকেও চিন্তিত থাকে, বা রাগ, দ্বেষ, হিংসা, লাম্পট্য, পানাসক্তি প্রভৃতি বশতঃ পৃথিবীতে ফিরিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের এই কামলোকীয় কামদেহ ক্রিয়াশীল থাকে। জীব কামদেহ-সাহায্যে ক্রিয়া করিতে থাকা হেতু, এই কামদেহ হইতে তাহার মনোময় দেহের পৃথক্ জ্ঞান শীঘ্র হইতে পারে না। সে কামদেহকেই 'আমি' জ্ঞান করিয়া তাহার মন ও চিন্তার সহিত ঐ সকল কামদেহজনিত প্রবৃত্তির কার্য্য সকলকে তাহার নিজের কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই হেতু জীবকে কামলোকে আবদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া যাইতে হয়। * * * যতদিন না মনের সহিত বাসনার মেশামিশিভাব কাটিয়া যায়, ততদিন জীবকে কামলোক ছাড়িয়া মনোময় লোকস্বর্গে যাইতে হয় না। আত্মীয়-স্বজন মৃত মানবের জন্য শোক করিয়া মৃতের কামদেহকে ক্রিয়াশীল করিয়া দেয়, অর্থাৎ তাহার কামদেহে বাসনা জাগাইয়া দেয়। * * * *

মৃতের জন্য শোক করিলে এই শোক যাইয়া কামদেহকে আঘাত করিয়া তাহাকে শোকাভিভূত করিয়া ফেলে। এইরূপে মানবের শোক বশতঃ কামলোকীয় দেহে যে চৈতন্য শক্তি অন্তর্মুখী ছিল তাহা বহির্মুখী হইয়া পড়ে ও কামদেহ সাহায্যে বাহিরে ক্রিয়াশীল হয়, অর্থাৎ ঐ মৃত মানবের কামদেহে পার্থিব আত্মীয়দের জন্য শোক ও তাহাদের দর্শন ইচ্ছা প্রকাশ পায়। * * * প্রবল বাসনাসক্ত মানব নিজ বাসনা কামলোকে যাইয়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া, সেই সকল বাসনা পূরণের জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। মদ খাইবার ইচ্ছা যাহার বেশী, সে মদ খাইবার জন্য অধীর হইয়া পড়ে; মুখ নাই, পানের ইচ্ছা প্রবল, মদও সম্মুখে দেখিতে পায়, কামদেহে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয় ও কষ্ট বোধ হয়, এইরূপে কামদেহের অবিরত ক্রিয়া হইতে থাকায়, সে কামদেহকেই 'আমি' বলিয়া জ্ঞান আর ছাড়িতে পারে না। তাহার চৈতন্য অন্তর্মুখী না হইয়া বহির্মুখী থাকিয়া যায় ও তাহাকে দীর্ঘকাল কামলোকে থাকিয়া যাইতে হয়। মৃত মানব এইরূপে নিজ নিজ প্রবল বাসনা হেতু কামলোকে, বদ্ধ অবস্থায় থাকে * * * * *'

* অলৌকিক রহস্য, কার্ত্তিক ১৩২০। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বি এ, কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধ।

# গয়াধামে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

'প্রেম-অবতার নিমাই যেথায়
হোমী ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে,
পিণ্ড দিলেন পূর্ব্বপুরুষে বসিয়া
যাহার ধূলার অঙ্গে—'

সেই পুণ্য গয়াক্ষেত্রে প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এক-বিংশতি বর্ষবয়সে পিতৃঋণ শোধ করিতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে গয়ার স্থানীয় প্রকৃতি পবিত্র, সেখানকার আকাশমণ্ডল দিব্যতেজে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার সোণার অঙ্গের বাতাস লাগিয়া আশু জীবের হৃদয় তরুর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সন্ধিতে সন্ধিতে প্রেম ও ভক্তির নবনধর কুসুমরাশি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।

স্নেহময়ী জননী শচীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া মাতৃ-স্বস্পতি চন্দ্রশেখর ও কতিপয় শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া ১৪৩০ শকের আশ্বিন মাসে শ্রীগৌরাঙ্গ পদব্রজে গয়ার অভিমুখে চলিলেন—

'গয়াতীর্থ রাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া।
নমস্করিলেন প্রভু শ্রীকর যুড়িয়া॥'

তথন তাঁহার বালস্বভাব-সুলভ চাঞ্চল্য নাই, দ্রুত গমন নাই, হাস্য-কৌতুক নাই। তিনি ধীরে ধীরে গমন করিয়া—

'ব্রহ্মকুণ্ডে আসি প্রভু করিলেন স্নান।
যথোচিত কৈলা পিতৃদেবের সম্মান॥
তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে।
পাদপদ্ম দেখিবারে চলিলা সত্বরে
বিপ্রগণে বেড়িয়াছে শ্রীচরণ স্থান।
শ্রীচরণে মালা যেন দেউল প্রমাণ॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ বস্ত্র অলঙ্কার।
কত পড়িয়াছে লেখা জোখা নাহি তার
চতুর্দ্দিকে দিব্যরূপ ধরি বিপ্রগণ।
করিতেছে পাদপদ্ম প্রভাব বর্ণন॥
কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে চরণ;
যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন॥
বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন;
তিলার্দ্ধেক যে চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র।
যম তার না হয়েন অধিকার পাত্র॥
যোগেশ্বর সবার দুর্ল্লভ যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন।
যে চরণে ভাগীরথী হইলা প্রকাশ।'
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস॥

অনন্ত শয্যায় অতি প্রিয় যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন ॥' *

ভক্তির উজ্জ্বল দেবমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গয়ালীর মুখে শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী বিষ্ণুর পদচিহ্নের প্রভাব শুনিয়া তাঁহার হৃদয় ভাবাবেশে বিভোর হইয়া উঠিল

'অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম নয়নে।
লোমহর্ষ কম্প হৈল চরণ দর্শনে ॥'

শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রেমাঞ্জলি দিতে দাড়াইয়াছেন। যে চরণ হইতে ভাগীরথী সমুদ্ভূতা, যে চরণ অনন্ত শয্যায় লক্ষ্মীর অতি প্রিয়, যে চরণ বলিকে দণ্ড করিয়াছিল, যে চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিবার জন্য যোগেশ্বর মহাদেব তপোরত, সেই বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত দুর্লভ শ্রীপদ দেখিতে দেখিতে প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মূর্চ্ছিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। বিষ্ণুপাদ-মন্দিরে অনলঙ্কৃত নিভৃত অস্ফুটতার মধ্যে একখানি প্রস্তরের গায়ে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তির মন্ত্র খোদিত দেখিয়া—

'আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দ সুখে।'

'নিমাই একদৃষ্টে সেই পদপানে স্পন্দহীন হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ঠোট দুইটি কাঁপিতে লাগিল। যেন নিমাইয়ের নয়নে জল আসিতেছে, আর তিনি নিবারণ

* শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত।

করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। শেষে নিমাইয়ের বড় বড় দুটী নয়ন-তারা জল ডুবিয়া গেল। নয়ন-জল নয়নে স্থান পাইল না—না পাইয়া বাহিয়া বদনে পড়িল। আবার নূতন জলের সৃষ্টি হইল। উহা আবার নয়নে স্থান না পাইয়া বদনে আসিল। অতএব পূর্ব্বকার নয়ন-জল আর বদনে থাকিতে পারিল না, বাহিয়া বুকে আসিতে লাগিল। তখন প্রশস্ত বুকেও জলের স্থান হইল না, মৃত্তিকায় ত্রিধারা হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমেই আঁখিবারির বেগবৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অগ্রে অপাঙ্গ হইতে একটি ধারা পড়িতেছিল, পরে নাসিকার কোণ হইতে আর একটি ধারার সৃষ্টি হইল। সে ধারা স্বতন্ত্র পথ ধরিয়া মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আসিল। আর সেই পথ দিয়া জল বাহিয়া পড়িতে লাগিল। নয়ন জলের বেগ আরো বাড়িয়া উঠিল, তখন নয়নের মধ্যস্থান দিয়া আর এক ধারার সৃষ্টি হইল। পরে সমুদায় ধারা মিশিয়া গেল, তখন সমস্ত নয়ন বাহিয়া বদন জুড়িয়া একটী মাত্র ধারা পড়িতে লাগিল। নিমাইয়ের উপবীত ভিজিয়া গেল, উত্তরীয় ভিজিয়া গেল, বসন ভিজিয়া তাঁহার নয়ন জলে সে স্থান জলময় হইল।' * এইভাবাবেশে নিমাই দেখিলেন

* শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত।

জীব তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত ভোগ বিষ্ণুপাদপদ্মের প্রস্তর-পটে এক করিয়া সাজাইয়াছে—সমগ্রভাবে এক হইয়া আপনার মাঝখানে দেবতাত্মা দ্বারা সমষ্টিরূপে একাত্ম হইয়া সংযুক্ত। দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষ লীলা দেখিতে দেখিতে

'দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে।
আইলেন ঈশ্বর ইচ্ছায় সেই স্থানে॥
ঈশ্বরপুরীরে দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
নমস্করিলেন প্রভু করিয়া আদর॥
ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্রেরে দেখিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন মহা হর্ষ হৈয়া॥
দোঁহার বিগ্রহ দোঁহাকার প্রেমজলে।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমানন্দ কুতূহলে॥'

শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সেই সময় ভাগবতাগ্রগণ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের মিলন হইল। ভক্তিময় ঈশ্বরপুরীর দেবমূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যাকুল-হৃদয়ে কহিলেন—

'কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃত-রস-পান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥'

গুরু-শিষ্যের মিলনের পর তাঁহাদের পরস্পরের হৃদয় ভরা বসন্তের মলয়-মারুত-হিল্লোলে প্রেমোল্লাসের ভাব জাগিয়া উঠিল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ গুরুর অনুমতি লইয়া—

'তীর্থ-শ্রাদ্ধ করিবারে বসিলা আসিয়া ॥
ফল্গুতীর্থে করি বালুকায় পিণ্ডদান।
তবে গেলা গিরিশৃঙ্গে প্রেত-গয়া স্থান ॥
প্রেত-গয়া-শ্রাদ্ধ করি শ্রীশচীনন্দন।
দক্ষিণায় বাক্যে তুষিলেন বিপ্রগণ ॥
তবে উদ্ধারিয়া পিতৃগণ সম্ভাষিয়া।
দক্ষিণ-মানসে চলিলেন দ্রুত হৈয়া ॥
তবে চলিলেন প্রভু শ্রীরাম গয়ায়।
রাম অবতারে শ্রাদ্ধ করিলা যথায় ॥
এহো অবতারে সেই স্থানে শ্রাদ্ধ করি।
তবে যুধিষ্ঠির-গয়া গেলা গৌরহরি ॥
পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির পিণ্ড দিলেন তথায়।
সেই প্রীতে তথা শ্রাদ্ধ কৈলা গৌররায় ॥
চতুর্দ্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া বিপ্রগণ।
শ্রাদ্ধ করায়েন সবে পড়ায়ে বচন ॥
শ্রাদ্ধ করি প্রভু পিণ্ড ফেলে যেই জলে।
গয়ালী ব্রাহ্মণ সব ধরি খায় গিলে ॥
দেখিয়া হাসেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
সে সব বিপ্রেরো যত খণ্ডিল বন্ধন ॥
উত্তর মানসে প্রভু পিণ্ডদান করি।
ভীম গয়া করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥

শিব-গয়া ব্রহ্ম-গয়া আদি যত আছে।
সব করি ষোড়শ গয়ায় গেলেন পাছে॥
ষোড়শ গয়ায় প্রভু ষোড়শী করিয়া।
সভারে দিলেন পিণ্ড শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া॥
তবে মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে করি স্নান।
গয়াশিরে আসি করিলেন পিণ্ডদান॥
দিব্যমালা চন্দন শ্রীহস্তে প্রভু লৈয়া।
বিষ্ণুপদ-চিহ্ন পূজিলেন হর্ষ হৈয়া॥'

এইভাবে শ্রাদ্ধাদি পিণ্ডদান ও দেবতা দর্শনে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। তিনি একদিন শুভক্ষণে নির্জ্জনে শিক্ষা-গুরু ঈশ্বরপুরীর নিকট দশাক্ষরীমন্ত্র 'গোপীজন বল্লভের' গ্রহণ করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে কহিলেন,—

'——দেহ আমি দিলাও তোমারে।
হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে॥'

এই মন্ত্র গ্রহণ প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

'জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণ প্রেমপূর।
ভক্তি কল্পতরুর তিঁহ প্রথম অঙ্কুর।
ঈশ্বরপুরী রূপে সে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল;
আপনি চৈতন্য মালী স্কন্ধ উপজিল।'

'মাধবেন্দ্র যে অঙ্কুর রোপন করিয়াছিলেন, তাহার বৃক্ষ গৌরাঙ্গ ঠাকুর হইলেন।'

গয়ার সর্ব্বত্র প্রেমের রাজ্য স্থাপন করিয়া—হরিনাম-ধ্বনিতে পাষাণ ভেদ করিয়া, অমৃতের নির্ঝর খুলিয়া দিয়া—হরিনামের মধুর গীতিতে পাষণ্ডকে ভুলাইয়া—আপনি মাতিয়া জগতকে মাতাইয়া জীবের শূন্য জীবন-কমণ্ডলু প্রেম ও ভক্তির বন্যায় পূর্ণ করিয়া দিলেন। গয়াবাসী সকলেই মহাপ্রভুর এই বিশুদ্ধ ভাব দেখিয়া তাঁহার ভাব-বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গেলেন। তখন—

'একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে।
নিজ ইষ্টমন্ত্র ধ্যান লাগিল করিতে।
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া॥
কৃষ্ণরে বাপরে! মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিকে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা?
শ্লোক পড়ি পড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥
প্রেম-ভক্তি-রসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূসর॥
আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
'কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ! ছাড়িয়া মোহারে?'

এইরূপে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে কি এক প্রবল ভাব-তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিল, তিনি আর নিজকে সামলাইয়া উঠিতে পারিলেন না, নিমাই আর তখন নিমাই নাই—তখন

'রাধার কি হইল অন্তরের ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহারও কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরক্তি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা।' *

সঙ্গিগণ নিমাইর ভক্তি-উচ্ছ্বসিত পূর্ব্বরাগের বন্যার গতি রোধ করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন,—

'——তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে॥
মথুরা দেখিতে মুঞি চলিব সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাও যথা॥'

* চণ্ডীদাস।

বলিয়া গৌরহরি মথুরার পথে চলিলেন। তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সহসা দৈববাণী তাঁহার বিরাট্ হৃদয়ে একটা ভাবান্দোলনে উদ্বোধিত করিয়া তুলিল—

'এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি!
যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে।
নবদ্বীপে নিজ-গৃহে চলহ এখনে॥
তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে।
অবতীর্ণ হইয়াছ সভার সহিতে॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় করিয়া কীর্ত্তন।
জগতেরে বিলাইবা প্রেম-ভক্তি-ধন॥

* * * *

* * * *

* * * *

অতএব মহাপ্রভু! চল তুমি ঘর।
বিলম্বে দেখিবা তুমি মথুরা-নগর।'

শুনিয়া মহাপ্রভু ভাবের উচ্ছ্বাসে

'বাসায় আসিয়া সর্ব্ব শিষ্যের সহিতে।
নিজগৃহে চলিলেন ভাব প্রকাশিতে।
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়।
দিনে দিনে বাড়ে প্রেম-ভক্তির উদয়॥'

সকলে নিমাইকে সঙ্গে করিয়া পৌষমাসের শেষে

নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গদাধরের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাবসাধনার শক্তি ভূমা ঐক্যের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে জগতের নিকট মহীয়ান্ করিয়া তুলিল।

---

# গয়াতীর্থে একদিন।

( ১৩২০ )

বিজয়াদিন রাত্রি ১১টার সময় পুণ্যভূমি কাশী ছাড়িয়া গয়া রওনা হই। ১২টায় কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে গাড়ী ধরি। ষ্টেশনে দু'টি বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। বারটা বাজিবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে অতি দ্রুতবেগে আউড-রোহিলখণ্ড-রেলওয়ের মেল ট্রেন প্লাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। গাড়ী ছুটিয়া চলিল; জানালার পাশে মুখ করিয়া বসিয়াছিলাম, দেখি জ্যোৎস্না-স্নাত শ্যামল বৃক্ষরাজির মাথার উপর দিয়া কাশীর দুই একটী মন্দিরের চূড়া ও অট্টালিকা উঁকি দিয়া দেখিতে দেখিতে আমাদের নেত্র-পথ হইতে কোথায় মিশিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর গাড়ী আসিয়া কাশী ষ্টেশনে থামিল। আবার ছুটিল, এই বার 'ডফরিন ব্রিজের' উপর দিয়া গাড়ীখানি মন্থর গতিতে যাইতে লাগিল, আমি যুক্তকরে বিশ্বেশ্বরের নিকট বিদায় লইলাম। দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়া মোগলসরাই পৌঁছিল। এখানে গাড়ী বদল করিতে হয়। কতক্ষণ বসিয়া থাকিতেই 'বোম্বে মেল' আসিয়া পৌঁছিল। আমরা তাড়াতাড়ি এক খানা গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। এইবার গাড়ীতে ততটা

ভিড় ছিল না। বেশ করিয়া এক খানা বেঞ্চে শুইয়া পড়িলাম। প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, আধ ম্লান আধ আলোর মাঝখানে আমরা আসিয়া গয়া সহরের নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে পৌঁছিলাম। কতক-গুলি মাঠ অতিক্রম করিয়া বোম্বে মেল আমাদিগকে ৬টার সময় গয়া ষ্টেশনে ছাড়িয়া দিল। আমরা তিনবন্ধু একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া সাহেবগঞ্জ ও পুরাতন গয়ার মাঝখানে কৈড়ী বাড়ী মহল্লায় বাবু দেবেন্দ্রনাথ গুপ্তের বাসায় গিয়া উঠিলাম। তাঁহার আদর অভ্যর্থনা ও সদয় ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বিদেশে এরূপ খাঁটি বন্ধু পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। আমার সুখ-স্বচ্ছন্দতা এবং দেবদর্শনের সুবিধার জন্য তাঁহার আত্মীয় বাবু যোগেন্দ্র কুমার সেন যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ন্যায় কর্ম্মশীল সদয় হৃদয় ব্যক্তির উপযুক্ত বটে, তাঁহার নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতা জানাইব এমন ক্ষমতা আমার নাই।

বেলা ৮টার সময় যোগেন্ বাবুর সহিত টমটমে পুরাতন গয়া ও মন্দিরাদি দেখিতে বাহির হইলাম। অনেক রাস্তা ও গলি ঘুরিয়া তিনি আমাকে 'সূর্য্যকুণ্ডের' নিকট লইয়া গেলেন। কুণ্ডের জলের সবুজ রং দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। যোগেন্ বাবুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে বলিলেন—'যাত্রিগণ শ্রাদ্ধাদি শেষে এখানে পিণ্ড নিক্ষেপ করেন বলিয়া পুকুরের জল খারাপ হইয়া গিয়াছে। মিউনিসিপালিটী হইতে গত বৎসর এই কুণ্ডের সংস্কার করা হয়। প্রতিদিন এত পিণ্ড কুণ্ডে ঢালিয়া দেওয়া হয় যে কুণ্ডের জল ভাল রাখা অসম্ভব। তবে আমরা সত্বরই ইহার একটা

ব্যবস্থা করিতেছি।' এই কথা বলিয়া তিনি আমার সঙ্গে একজন পাণ্ডা দিয়া মিউনিসিপালিটীর কার্য্য পরিদর্শনের জন্য স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

আমি সীঁড়ি দিয়া সূর্য্যকুণ্ডে নামিলাম। সম্মুখেই জলের মধ্যে একটি বেদী এবং ইহার চতুর্দ্দিকে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি দেখিলাম। গয়ার চতুর্দ্দিকে—মাঠে ও দেবালয়ে—শত শত বুদ্ধমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিয়া মনে হইল সম্ভবতঃ বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধপ্রাধান্য স্থাপনের জন্যই হিন্দু মন্দিরের সঙ্গে মিলাইয়া মিশাইয়া বুদ্ধদেবের ধ্যানিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কুণ্ডের বামদিকের রাস্তা দিয়া ফল্গুনদীর পুণ্যজল স্পর্শ করিতে যাই। ফল্গু অন্তঃসলিলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। নদীগর্ভে নামিয়া দেখি চারিদিকে কেবলই বালু, এক ফোঁটা জল কোথায়ও নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত খুঁড়িয়া পাণ্ডারা যাত্রীর জন্য জল সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ফল্গুর বালিভরা বুকে তখন একটি মৃতদেহ দগ্ধ হইতেছিল। কিছুকাল ফল্গুর তীরে ঘুরিয়া দেউচড়া গলির ভিতর বিষ্ণুপাদ মন্দিরের দিকে অগ্রসর হই। বামদিকে গুরু নানকের আখড়া ও ফল্গুশ্বর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত মন্দিরের ভিতর বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত। এখানে লিঙ্গমূর্ত্তিও আছেন। বিষ্ণুপাদ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের ডানদিকে গয়াকুমারী দেবীর মূর্ত্তি। চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত গয়েশ্বরী, অহল্যাবাই, রাধাকৃষ্ণ, গয়াগজ স্তম্ভ প্রভৃতি বহু মন্দির ও মূর্ত্তি দেখিলাম। গদাধর মন্দিরে কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত গদাধরের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ভিতরের দিক্ অত্যন্ত অন্ধকারপূর্ণ। দুইটি রমণীকে গদাধর মূর্ত্তি পূজায়

নিরত দেখিলাম। এখানে গদাধর দর্শন ও ঠাকুরকে পঞ্চামৃত স্নান করাইতে হয়। এই মন্দির বহু প্রাচীন। কাঁহারও মতে ইহাই হিন্দুগয়ার প্রথম মন্দির। সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও ইহা যে বহু প্রাচীন ইহাতে কোন-ই সন্দেহ নাই। ললিতাদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখি এই পুণ্যস্থান যত্নের অভাবে অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রিতে সবৎসা গাভী এখানে শুইয়া থাকে। আমি কোথায়ও এত আবর্জ্জনাপূর্ণ মন্দির দেখি নাই। দেবীর চতুর্দ্দিকে বহু ভগ্ন মূর্ত্তি পড়িয়া আছে।

এইবার আমি উভয় দিকের ক্ষুদ্র কটক দিয়া বিষ্ণুপাদ মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। এখানে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদানের জন্য বহু যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে। মন্দিরের সম্মুখেই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পিতৃছায়া মহাদেব মন্দির। বিষ্ণুপাদ মন্দির অতি সুন্দর, সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা গঠিত, উপরের চূড়া সোণার পাতে মণ্ডিত। স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব সুপ্রশস্ত নাট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। বর্ত্তমান মন্দির রাণী অহল্যা বাইয়ের অর্থে নির্ম্মিত। মন্দির মধ্যে বিস্তৃত একখানা প্রস্তর ফলকের উপর রৌপ্য নির্ম্মিত ষোড়শ কোণ বিশিষ্ট একটি কুণ্ড মধ্যে বিষ্ণুপাদপদ্ম অবস্থিত। এই পাদপদ্মে তীর্থ যাত্রিগণ ভক্তিভরে পিণ্ড, মহানদীর জল, দুগ্ধ ও পুষ্প অবিরত ঢালিয়া দিতেছে। এখানে পিণ্ডদান করিয়া 'মাতৃষোড়শী' মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। অনেক লোককে এই কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া পিণ্ডদান করিতে দেখিলাম। এই পাদপদ্মের রূপার ঘের ভাঙ্গিয়া গেলে গয়ালী শ্রীবালগোবিন্দ সিংহ পুনঃ

সংস্কার করাইয়া দেন। এখানে তিনটি সুবৃহৎ ঘণ্টা আছে। একটি বাহিরে এবং অপর দুইটি ভিতরে। বাহিরেরটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। মন্দিরের সম্মুখভাগে হনুমানজীর মূর্ত্তি দেখিবার জিনিষ বটে। বিষ্ণুপাদ মন্দির দর্শন করিয়া আমি ষোড়শ বেদী মন্দিরে যাই। তথায় বিভিন্ন পদে পিণ্ডদান করিতে হয়। বিষ্ণুপাদ মন্দিরের পূর্ব্ব-দিকে নরসিংহ মূর্ত্তির মন্দির অবস্থিত। কথিত আছে এই মন্দির ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখানেও বহু বুদ্ধ মূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে এক জায়গায় রামচন্দ্রের মূর্ত্তি আছে। ইহার প্রাচীর গাত্রে একখানি শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অন্য স্থান হইতে আনিয়া এখানে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। শিলালিপির উপরিভাগে শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

বিষ্ণুপাদ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে মন্দির ও বিগ্রহ দর্শন করিয়া আমি রায় বাহাদুর ৺ বিহারী লাল বারিয়া পাণ্ডার গৃহে যাই। এই গৃহের বর্ত্তমান মালিক মৃত রায় বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইহার নাম শ্রীযুক্ত-বলদেব লাল বারিয়া। ইনি অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট্। ফটক পার হইয়া বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া থাকি। তখন বলদেব লাল চা পান করিতেছিলেন। চা পানের পর তিনি আমাকে একখানি চেয়ারে বসিতে দিয়া নিজে আর একখানি চেয়ারে বসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার গয়া সম্বন্ধে অনেক আলাপ হইল। প্রায় এক ঘণ্টা আলাপের পর সেখান হইতে উঠিয়া আমি বিখ্যাত গয়ালী ৺ ছোট্টু লাল সিজুয়া,

সি, আই, ইর গৃহে গমন করি। শ্রীযুত গোবিন্দ লাল সি, আই, ইর দত্তক-পুত্র। আমি ইহার বহির্বাটী সংলগ্ন গৃহে প্রবেশ করিতেই দেখি একটি কুঠুরিতে গোবিন্দ লাল সিজুয়ার কনিষ্ঠ ভাই গদির উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার নিকট একজন সরকার তীর্থযাত্রিগণকে মন্ত্র পাঠ করাইতেছেন। 'অহং বন্দে' মন্ত্রে শত শত অশিক্ষিত যাত্রী বালক-গয়ালীর শ্রীচরণে গয়াকৃত্যের 'সুফলের' জন্য কাতর নয়নে চাহিয়া আছে। হিন্দুর বিশ্বাস এই 'সুফল' লাভ করিতে না পারিলে পিতৃলোকের সদ্গতি হয় না। একটি দরিদ্র চাষা 'সুফল' প্রাপ্তির জন্য কিছু পয়সা দিয়াছিল, তাম্রখণ্ড দেখিয়া সরকারজীত চটিয়া লাল। একটি রৌপ্য মুদ্রা দিলে পর চাষার ভাগ্যে 'সুফল' লাভ হইয়াছিল। এই ব্যাপার কিছুক্ষণ দেখিয়া গোবিন্দ লাল সিজুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অন্য কক্ষে যাই। সেখানে দেখি একখানি সোফায় গয়ালী-ঠাকুর আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমার গয়ায় আগমনের উদ্দেশ্য বলিলে তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইনি আমাকে সি, আই, ইর একখানা ফটো বাসায় পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। ইহার সহিত 'সুফল' দান সম্বন্ধে আমার কিছু আলাপ হয়। গয়ালীরা কোনই অত্যাচার করেন না সে কথাটি তিনি আমাকে বেশ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গয়ার প্রসিদ্ধ গয়ালীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আমি ১২টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসি।

* * * *

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

অপরাহ্নে বোধিগয়া হইতে ফিরিবার পথে ব্রহ্মযোনি পাহাড় দেখিতে গিয়াছিলাম। পাহাড়ের নীচে গাড়ী রাখিয়া আমরা সীঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠি। এই সীঁড়ি মহারাষ্ট্র দেবরাও ভাও সাহেব নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই পাহাড়ের উচ্চতা ৪৫০ ফিট্; ইহার উপরিভাগে ব্রহ্মযোনি, মাতৃযোনি গুহা আছে। দেড়শত ধাপ উঠিতেই একটি সুগঠিত বিরাম-মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ক্লান্ত যাত্রিগণ এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। আমরা পাঁচ মিনিট কাল এখানে বসিয়া চারিদিকের গয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিলাম। উত্তরে রামশিলা, পশ্চিমে প্রেতশিলা, মধ্যস্থলে পুরাতন গয়া ও সাহেবগঞ্জের নিবিড় পাদপরাজি পরিপূর্ণ রমণীয় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে এমন একটা গুরু গম্ভীর ভাবের উদয় হয় যে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমরা পুনরায় চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে উপরে উঠিতে লাগিলাম। এই বার বড় ক্লান্তি বোধ হইল। প্রায় ২০ মিনিটে আমরা ডানদিকে কুণ্ডের নিকট আসি। কুণ্ডের জল স্পর্শ করিবার জন্য একটি অতি সংকীর্ণ সীঁড়ি আছে। কুণ্ড হইতে শীর্ষদেশে অবস্থিত মন্দিরে উঠিতে প্রায় ৫ মিনিট লাগিয়াছিল। এই মন্দিরে সাবিত্রী, গায়ত্রী ও সরস্বতী এই তিন মূর্ত্তি আছেন। এখানে ব্রহ্মার মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তির পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, ১৬৩৩

খৃষ্টাব্দে এই মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এখানকার দৃশ্য পরম রমণীয়। মৃদু পবনান্দোলিত বৃক্ষপত্রের সর্ সর্ শব্দ চতুর্দ্দিকের নীরবতায় মাধুর্য্য মাখাইয়া প্রাণের ভিতর কেমন একটা উদাস ভাবের অবতারণা করে তাহা লেখনীতে বুঝান একরূপ অসম্ভব। আমি এই গাম্ভীর্য্যময় নীরব সৌন্দর্য্যের ভিতর কিছুক্ষণ ডুবিয়া রহিয়াছিলাম। মন্দির হইতে বাহির হইয়া আমরা পাণ্ডা ঠাকুরের সহিত ব্রহ্মযোনি গুহা দেখিতে যাই। আমাদের সঙ্গে তিনটি স্ত্রীলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একটি গাছের নীচে বড় দুই খানি পাথর, মধ্যস্থলটা ফাঁক। পাণ্ডাঠাকুর আমাদিগকে ঐ গুহার ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। আমাদের সাহস হইল না, যদি কোন কারণে উপরের বিশাল প্রস্তর খানা নীচে ধসিয়া পড়ে, তবেত সেই মুহূর্ত্তেই পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি। আমাদের দ্বিধা দেখিয়া পাণ্ডাজী নিজেই মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই গুহার ভিতর প্রবেশ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। কথিত আছে যে, ঐ গুহা হইতে একবার বাহির হইয়া আসিতে পারিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ইহা ভিন্ন এই পাহাড়ে আরও দুইটি দেখিবার স্থান আছে। তাহার একস্থানে বসিয়া ব্রহ্মা গো-দান করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পাহাড়ের গায়ে গো-পদ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অপর স্থানে ভীমসেন বাম জানু পাতিয়া পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। সেই জানুর চিহ্ন আজিও পাণ্ডাগণ দেখাইয়া থাকেন।,

ক্রমে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া চারিদিক ছাইয়া ফেলিতেছিল দেখিয়া

আমরা তাড়াতাড়ি পাহাড় হইতে নামিয়া আসি। পাহাড়ের অনতি-দূরেই অক্ষয়বট। আমি গাড়ী হইতে পুনরায় অবতরণ করিয়া অক্ষয়বট দেখিবার জন্য সেই প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। এখানে তিনটি পিপুল গাছ দেখিলাম। গাছের ডালগুলি রক্ষা করিবার জন্য তিনটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অক্ষয়বটের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র শিব মন্দির আছে। এই প্রসিদ্ধ অক্ষয়বট মূলেই পিণ্ডদান করিয়া তীর্থগুরু গয়ালীর নিকট 'সুফল' গ্রহণ করিতে হয়। অক্ষয়বটের নিকট প্রাপ্ত দশম শতাব্দের একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে, ঐ সময়ে এই বৃক্ষমূল বেদী বা পুণ্যতীর্থ বলিয়া যাত্রিগণ এখানে আসিয়া 'সুফল' গ্রহণ করিতেন। গয়াকার্য্য শেষ করিয়া সকলেই এই পুণ্য বেদীতে আসিয়া পিণ্ডদান করেন; গয়ালী পিণ্ডদাতার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া 'সুফল' উচ্চারণ করিলেই গয়াকার্য্য সফল হয়। গয়ালীকে যথাশক্তি দক্ষিণা-দান এবং তাঁহার নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ গলদেশে পুষ্পমাল্য, কপালে তিলক ও কিছু প্রসাদী মিষ্টান্ন গ্রহণ করিয়া যাত্রী গয়া পরিত্যাগ করেন।

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

পুণ্যনগরী গয়ার দ্রষ্টব্য স্থান, মন্দির ও বিগ্রহাদি দর্শন শেষ করিয়া রাত্রি ৮টায় হাবড়া এক্সপ্রেস গাড়ীতে রাঁচি অভিমুখে রওনা হই।

---

# বুদ্ধগয়া।

গয়া হইতে সাত মাইল দক্ষিণে বোধগয়া বা উরুবেল গ্রামে অবস্থিত স্তূপ বহু পুরাতন। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই পুণ্যস্থানে পুণ্যশ্লোক ভগবান্ শাক্যসিংহ বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আজিও গয়ার চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত বুদ্ধগয়া, কুক্কুটপাদ, রাজগৃহ, নালন্দ প্রভৃতি স্থানগুলি মহাতীর্থ রূপে পরিণত হইয়া সমগ্র মানবজাতির এক তৃতীয়াংশের পূজা ও ভক্তি গ্রহণ করিতেছে।

এই পুণ্যতীর্থ দর্শনের জন্য ১৯১২ খৃঃ ১০ই অক্টোবর শুক্রবার দ্বিপ্রহর ১টা ৫ মিনিটের সময় দুই টাকায় এক খানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া রওনা হই। দুইটি বালক আমার সঙ্গী জুটিয়াছিল। গয়া মিউনিসিপাল পুকুরের নিকটবর্ত্তী দীঘিরোড্ দিয়া দক্ষিণ দিকে আমাদের গাড়ী খানা দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিল। বামপার্শ্বে যাত্রিগণের সুবিধার জন্য সূর্য্যমল প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা দেখিতে পাইলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইলেই রামসাগর দীঘি। এখানে গাড়োয়ান ঘোড়া বদল করিয়া লইল। গাড়ী পুনরায় ছুটিল। রাস্তার বামপার্শ্বে ছোট ও বড় বৈতরণী পুকুর, এখানে যাত্রিগণ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। ডানদিকে কেবলি ধানক্ষেত, অদূরে সুউচ্চ ব্রহ্ম-যোনি পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে সোপান শ্রেণী। আমাদের গাড়ী

কখনও ধানক্ষেতের ধার দিয়া, কখনও বা বালুকাপূর্ণ ফল্গু নদীর তীর দিয়া ছুটিয়া চলিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য তাল, আম ও খেজুর গাছের সারি। একস্থানে ডানদিকে বাবু উগ্রসিংহের প্রতিষ্ঠিত মন্দির দেখিতে পাইলাম। নূতন জলের কলের কারখানা বামদিকে রাখিয়া আমরা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এইবার সহর ছাড়িয়া আমাদের গাড়ী ফল্গু নদীর তীর দিয়া চলিতে লাগিল। ফল্গুর অপর পারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গাছ পালা শূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় দৃষ্ট হয়। গাড়ীখানা সহসা একটা বাঁক ঘুরিবার পরই গাছের আড়াল দিয়া বোধিগয়া মন্দিরের চূড়া দৃষ্টি গোচর হইল। ক্রমে আমরা দুইটা পনর মিনিটের সময় মহান্তজীর মঠের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে গাড়ী হইতে নামিয়া আমরা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পুরাতত্ত্ব-সংগ্রহ-গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এখানে অনেকগুলি ভগ্ন মূর্ত্তি ও পুরাতন ইষ্টক সংগৃহীত হইয়াছে। জাপান হইতে প্রেরিত শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিটি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম।

মন্দির দেখিবার জন্য আমরা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। মন্দিরের সম্মুখেই কয়েকটী বৃহদাকারের ঘণ্টা। দুইজন চৌকিদার আমাদের সঙ্গে আসিয়া বিভিন্ন স্থান দেখাইতে লাগিল। তখন মহাযোগীর নীরব সাধনার উপযোগী বিরাট্ মন্দিরের ধ্যানিভাব এবং চতুর্দ্দিকের শান্ত ও স্নিগ্ধ মাধুর্য্য আমার বিস্ময়-বিমূঢ় চিত্তকে এক প্রগাঢ় আকর্ষণে কোথায় টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল।

বোধিগয়া

বোধিগয়া গ্রামের মধ্যস্থলে একটি পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালুতে এই বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্থানেই বোধিবৃক্ষমূলে শাক্যসিংহ সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। চীন দেশীয় পরিব্রাজক হুয়েনস্তাঙ্‌ তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই স্থানের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দে সর্ব্বপ্রথমে সম্রাট্‌ অশোক তাঁহার মন্ত্রী উপগুপ্তের সহায়তায় এইস্থানে বিহারের প্রতিষ্ঠা ও ১লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে একটি অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরটি উর্দ্ধে ১৬০ ফিট্‌ এবং প্রস্থে ৬০ ফিট্‌। এই মন্দিরে ভূমিস্পর্শ মুদ্রাবিশিষ্ট একটি ধ্যানি বুদ্ধের মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল।

মন্দির।

বোধিগয়ার বর্ত্তমান মন্দির কোন্‌ সময়ে যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক অবগত হইবার কোন উপায় নাই। কানিংহাম সাহেবের মতে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে কুশানরাজ হুবিষ্কের সময় ইহা নির্ম্মিত এবং ৪র্থ শতাব্দে সম্রাট্‌ সমুদ্রগুপ্তের আদেশে ইহার সংস্কার হয়। ফাগুসন প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার গঠন প্রণালী ও স্থাপত্য হইতে ইহার নির্ম্মাণ-কাল ষষ্ঠ শতাব্দে বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু ইহার যথার্থ প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। মূল মন্দির ইষ্টক নির্ম্মিত, প্রায় ৫০ ফিট্‌ বিস্তৃত বেদীর উপর ইহা স্থাপিত এবং এক সময়ে ইহা ত্রিতল ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম দেশের রাজা মিণ্ডুন মিন এই মন্দির সংস্কারের জন্য তিনজন কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সংস্কার কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য

হন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আদেশে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে উহা শেষ হয়। মিঃ জে, ডি, বেগলার সংস্কার কার্য্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণ খননের সময় মন্দিরের প্রস্তরের একটি ক্ষুদ্র মডেল আবিষ্কৃত হয়। ইহা হইতেই বর্ত্তমান মন্দিরের বহির্ভাগের ডিজাইন বা পরিকল্পনা অঙ্কিত হইয়াছিল। এই সময় ত্রিতলের প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সংস্কারের পর বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট মন্দির-গাত্রে যে একখানি খোদিত লিপি স্থাপন করিয়াছেন এখানে তাহা উদ্ধৃত করা গেল:—

'This ancient temple of Mohabodhi erected on the holy spot where Prince Sakya Singha became Buddha was repaired by the British Government under the order of Sir Ashley Eden, Lieutenant Governor of Bengal in A. D. 1880

মন্দিরে একটি মাত্র প্রবেশ-পথ আছে। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মুখের হলের উত্তর পার্শ্বে দ্বিতলে উঠিবার দুইটি সিঁড়ি আছে। গর্ভ-গৃহটী অত্যন্ত অন্ধকারপূর্ণ, সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত বেদী এবং বেদীর উপরে সিংহাসনে উপবিষ্ট ধ্যানি বুদ্ধ মূর্ত্তি। এক খানা রেশমের পরদা দিয়া মূর্ত্তিটি ঢাকিয়া রাখা হয়। আমরা গৃহে প্রবেশ করিতেই একজন পুরোহিত বেদীর উপর উঠিয়া পরদা খানা সরাইয়া দিলেন। সিংহাসনে খোদিত তিন ছত্র লিপি হইতে জানা যায় যে, এই মূর্ত্তি ও সিংহাসন ছিন্দ বংশীয় কোন রাজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দ্বিতলে উঠিবার যে দুইটি সিঁড়ি আছে

তাহার মধ্যস্থলে এক একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ দিকের বুদ্ধ মূর্ত্তিটি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে বীরেন্দ্র ভদ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তির পার্শ্বে 'অনেন শুভ-মার্গেণ প্রবিষ্টো লোকনায়কঃ মোক্ষমার্গ প্রকাশকঃ' শ্লোকটি উৎকীর্ণ দেখিলাম। আমরা চতুর্দ্দিকের বারান্দা ঘুরিয়া নানাস্থানে বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে দ্বিতল গৃহের এক পার্শ্বে একটী মন্দিরে সিদ্ধার্থ-জননী মায়াদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। মায়াদেবী দণ্ডায়মানা, তাঁহার সুন্দর শান্ত নয়ন যুগলে স্নেহ ও করুণা অঙ্কিত। দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম, আশেপাশে সুন্দর বাগান, বাঁধান চত্বর, চত্বর মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু ভগ্ন, অভগ্ন, খোদিত ইষ্টক। *

---

* 'The discoveries made during the restoration show that this temple was built over Asoka's temple, and some remains of the latter were, in fact, found in the course of the excavations. A throne of polished sandstone was discovered with four short pilasters in front, just as in the Bharhut bas-relief ; two Perse-politan pillar bases of Asoka's age were found flank-ing it ; and the remains of old walls were laid bare under the basement of the present temple. When this restoration was undertaken, the temple court was covered with the accumulated debris of ages and with deposits of sand left by the floods of the river Nilajan. The courtyard was cleared, the temple completely

মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে বৌদ্ধগণের পরম আদরের বস্তু বোধিদ্রুম বা জ্ঞানবৃক্ষ অবস্থিত। এখন যে গাছটি দেখিলাম উহার বয়স ত্রিশ চল্লিশের বেশী নয়। কথিত আছে এই অশ্বত্থ বা পিপুল গাছের নীচেই শাক্যসিংহ সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। এইজন্য বোধিদ্রুম। এই বৃক্ষকে বৌদ্ধগণ ভক্তির সহিত পূজা করিয়া থাকেন। এই সুপ্রাচীন বৃক্ষের ইতিহাস বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। বৌদ্ধ ভিন্ন অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের হস্তে এই বৃক্ষকে বিভিন্ন যুগে অশেষ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে সম্রাট্ অশোক কর্ত্তৃক ইহা বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দীক্ষার পরে তিনি এই বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে

---

restored, the portico over the eastern door and the four pavilions flanking the pyramid were rebuilt, and the great granite Toran gateway to the east, which dates back to the 4th or 5th century, was again set up. The model used in restoring the temple was a small stone model of the temple as it existed in mediaeval times, from which the design ( In his "Lhasa and its Mysteries" Lt.-Colonel Waddell gives an interesting comparison between the temple as it was before restoration and the great pagoda by the side of the temple at Gyantse in Tibet, which is locally known as the Gandhola, the old Indian title of the Bodh Gaya temple, and which is said to be a model of that temple transplanted to Tibet. ) of the building as it then existed could be traced with some certainty. The

পূজা ভক্তি করিতেন। বৃক্ষের প্রতি রাজার অত্যধিক ভক্তিশ্রদ্ধা দর্শনে ঈর্ষান্বিতা হইয়া রাণী তির্য্যরক্ষিতা গোপনে উহা কাটিয়া ফেলেন, কিন্তু অলৌকিক শক্তি প্রভাবে উহা পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। তৃতীয়বার ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত এই বৃক্ষের মুলোৎপাটন করিয়াছিলেন, কিন্তু মগধেশ্বর পূর্ণবর্ম্মণ উহা পুনঃ সংস্থাপন করেন। এ সম্বন্ধে একটি প্রচলিত গল্প এই যে, কোন এক অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে এক রাত্রিতে এই গাছটি দশ ফিট্ উচ্চ হইয়া উঠে। রাজা পূর্ণবর্ম্মণ শত্রু হস্ত হইতে ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য ইহার চতুর্দ্দিকে ২৪ ফিট্ উচ্চ এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

---

work has been subjected to much adverse criticism, from which it might be presumed that visitors would find a temple robbed of its age and beauty, with a scene of havoc around it. The reverse is the case ; the temple has been repaired as effectively and successfully as funds would permit, and the site has been excavated in a manner which will bear comparison with the best modern work elsewhere. Rising from the sunken courtyard, the temple still rears its lofty head, a monument worthy of the ancient religion it represents ; the Vajrasan throne is in its old place ; and the shrine is still surrounded by the memorials erected by Buddhist pilgrims of different countries and different ages.' Gaya Gazetteer P. p. 52.

সম্রাট্ অশোকের সময় বৌদ্ধগণ বোধিবৃক্ষকে কিরূপ ভক্তির চক্ষে দেখিতেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। একটি সুবর্ণ কৌটার মধ্যে পুরিয়া ইহার এক খণ্ড শাখা সিংহলে প্রেরিত হয়। সেই সময়ে পাটলিপুত্র হইতে বুদ্ধগয়া পর্য্যন্ত সমগ্র পথটি পরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সম্রাট্ অশোক স্বয়ং কৌটাটি লইয়া বুদ্ধগয়ায় আগমন করেন। তখন এক বিরাট্ শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। নানাবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠানের পর গাছ হইতে একটি ডাল কাটিয়া উহা সুবর্ণ নির্ম্মিত আধারে সুরক্ষিত করিয়া অতি জাকজমকের সহিত সমুদ্রতীরে প্রেরিত হইয়াছিল। সাঞ্চি স্তূপের পূর্ব্বদিকের প্রবেশ দ্বারে স্থাপিত একখানি ফলকে এই ঘটনাটি সুন্দরভাবে সুচিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে বুকানন হামিলটন্ সাহেব বোধিগয়ায় আসিয়া এই গাছটিকে খুব সজীব ও সতেজ দেখিতে পান। তাঁহার মতে তখন ইহার বয়স শতবর্ষের কম ছিল না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রায় নষ্ট হইয়া যায় এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল ঝড়ে উহা মাটিতে পড়িয়া যায়। বর্ত্তমান বৃক্ষটির বয়স ত্রিশ চল্লিশের বেশী হইবে না। সম্ভবতঃ ইহা মূল বৃক্ষের বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বরাহুট গ্রামে ২য় শতাব্দের একটি স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্তূপের বেষ্টনীর স্তম্ভগাত্রে নানাবিধ ক্ষোদিত চিত্র আছে। বোধিবৃক্ষ যে সেই সময়ে তীর্থযাত্রিগণের আরাধ্য ছিল তাহা এই চিত্র হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। *

* 'One of the bas-reliefs of the Bharhut stupa

বোধিবৃক্ষ এবং মূল মন্দিরের মধ্যস্থলে বজ্রাসন বা হীরক সিংহাসন দেখিলাম। এই আসন অক্ষয়, ইহা কখনও নষ্ট হইবে না বলিয়া বৌদ্ধদের বিশ্বাস এবং তাঁহারা মনে করেন ইহা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত। ইহা প্রায় দুই হস্ত পরিমিত উচ্চ চত্বরের উপরে স্থাপিত, ঐ চত্বরের গাত্রে সিংহ ও মনুষ্যের মূর্ত্তি অঙ্কিত। ইহার উপরিভাগ এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহা অশোকের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল। বজ্রাসনের মধ্যস্থলে একটি মণ্ডল অঙ্কিত এবং তাহার চতুর্দ্দিকে ও মধ্যে জ্যামিতির ন্যায় বিবিধ চতুষ্কোণ ও ত্রিকোণ চিত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে শাক্যসিংহ সিদ্ধিলাভের পর এই আসনের উপর উপবেশন করিয়াছিলেন। বজ্রাসনের উপরে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে। ইহার উপরিস্থিত প্রস্তর খণ্ডে ১ম ও ২য় শতাব্দের অক্ষরে লিখিত একটি ক্ষোদিত লিপির কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়। বজ্রাসনের সহিত পটোলা রাজপ্রাসাদের সিংহাসনের তুলনা করিয়া লেফটানেণ্ট কার্ণেল ওয়াডেল বলেন,—

বজ্রাসন।

---

(2nd Century B. C.) gives a representation of the tree and its surroundings as they then were. It shows a Pipal-tree, with a stone platform in front, adorned with umbrellas and garlands and surrounded by a building with arched windows resting on pillars, while close to it stood a single pillar with a Persepolitan capital crowned with the figure of an elephant. Gaya Gazetter. pp. 46

'The plinth of the throne of the Grand Lama in the Potala at Lhasa is ornamented with the same simple diaper-worked flowers like marguerites.'

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার 'Buddha Gaya' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'খাঁটি বজ্রাসন সুবৃহৎ ক্লোরাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহা বহুকাল বোধিমন্দিরের পূর্ব্বাংশে ভাগেশ্বরী দেবীর মন্দিরে ছিল। তিনি আরও বলেন,—

'This stone is a circular blue slab streaked with whitish veins, the surface of which is coverd with concentric circles of various minute ornaments, the second circle being composed of conventional thunder-bolts ( Vajra ), and the third being a wavy scroll filled with figures of men and animals.'

জেনারেল কানিংহামের মতে এই বজ্রাসন হুয়েনস্থাঙ্ বর্ণিত 'অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট নীল প্রস্তর'। *

কথিত আছে যে, বজ্রাসনের উপর সাতটি বহুমূল্য মণি ছিল এবং ইহা ইন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কুশন বংশীয় রাজা হবিষ্ক খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে এই বজ্রাসন সংস্কার করিয়াছিলেন। বজ্রাসনের সন্নিকট মৃত্তিকা গর্ভ হইতে বৌদ্ধ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দের মধ্যভাগে ইহা নৈরঞ্জনের বালুকা রাশিতে আচ্ছাদিত

* 'A blue stone, with wonderful marks upon it and strangely figured.'

হইয়া যায় এবং বহু পরিশ্রমে মগধেশ্বর পূর্ণবর্ম্মণ ৭ম খৃষ্টাব্দে বালুকা-স্তূপ খনন করিয়া ইহার উদ্ধার সাধন করেন।

পূর্ব্ব তোরণের বামপার্শ্বে একটি মন্দিরে একখানি প্রস্তরে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন দেখিলাম। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই পদচিহ্ন ৯ম শতাব্দের অনুমান করেন। বোধিবৃক্ষ মূলে এইরূপ প্রস্তরে দুইখানি পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবের পদ-চিহ্ন।

অশোক নির্ম্মিত মূল মন্দিরের চতুর্দ্দিকে এক সময়ে স্তম্ভ-শ্রেণী-যুক্ত বেষ্টনী ( Railing ) নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বেষ্টনীর অধিকাংশ স্তম্ভ ভগ্ন হইয়াছে। ইহার অনেকগুলিতে উৎকীর্ণ-লিপি আছে। ইহা অশোকের আদেশে খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের ধারণা। প্রত্যেক রেলিংগাত্রে শিল্পের আশ্চর্য্য নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়। স্তম্ভগাত্রে নানা প্রকারের জীবজন্তু হাতী, পদ্মপুষ্প অঙ্কিত। কোনটিতে বৃষ লাঙ্গল টানিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছে, কোথায়ও বা পদ্মপুষ্পের ভিতর দিয়া নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে, কোথায়ও বোধিদ্রুমের চিত্র, কোথাও যক্ষিণী যক্ষের বাহুতে পা রাখিয়া গাছে উঠিতেছে, কোথায়ও গমনোন্মুখ নারীর পশ্চাতে পুরুষ আসিয়া তাহার কেশাকর্ষণ করিতেছে, এই ভাবের সুন্দর সুন্দর চিত্র দেখিলাম। অধিকাংশ উৎকীর্ণ লিপিতে 'আর্য্য কুরঙ্গ দাবম্' অর্থাৎ আর্য্য কুরনির দান খোদিত আছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত একটি মাত্র স্তম্ভগাত্রে একটি যক্ষীর সম্পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে

অশোক রেলিং।

পাওয়া যায়। কলিকাতা মিউজিয়মে সুরক্ষিত একটি রেলিং-গাত্রে "বোধিরখিতসতবপনকস দানং' ( সিংহলবাসী বোধিরক্ষিতর দান ) ক্ষোদিত আছে। একস্থানে একটি সূর্য্য মূর্ত্তি দেখিলাম। ভাস্করদেব রথের উপর দাঁড়াইয়া আছেন, চারিটি অশ্ব উহা টানিতেছে এবং উভয় পার্শ্বে দুইটি ব্যক্তি তীর ছুঁড়িতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই চিত্রকে গ্রীসের 'এপোলোর' সহিত তুলনা করিয়াছেন।*

বোধপোখর। বোধিমন্দির প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে 'বোধপোখর' দেখিতে পাইলাম। ঘাট এবং ছত্রী ধ্বংসাবশেষ হইতে নির্ম্মিত। এই পুষ্করিণীর পরিধি ১৭৫০ ফিট্। কথিত আছে, শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের মন্ত্রী এই পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে মতভেদও আছে।

বুদ্ধদেবের পাদ-চারণ। বোধপুকুর ও চতুর্দ্দিকের দর্শনযোগ্য স্থান ও মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা মন্দিরের উত্তরদিকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে একটি দীর্ঘাকার অপ্রশস্ত বেদী আছে। ইহার উপর প্রায় বিংশতিখানি প্রস্তরনির্ম্মিত পদ আছে। কথিত আছে শাক্যসিংহ সম্বুদ্ধ হইবার পর দ্বিতীয় সপ্তাহে এইস্থানে চিন্তামগ্নভাবে পাদচারণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই তখন মহাপুরুষের পদতলে অদ্ভুত রকমের আঠারটি পুষ্প ফুটিয়াছিল। হুয়েন

* 'Is clearly an adoption of similar types of the Greek Apollo.'

স্যাণ্ড্ বলেন যে 'তথাগতের এই বিচরণ স্থান উত্তরকালে দুই হস্ত পরিমিত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিল। বেদীর উভয় দিকে কয়েকটি ঘটের মত স্তম্ভপাদ আছে। যে স্তম্ভ-পাদগুলি কালের কঠোর শাসন উপেক্ষা করিয়া আজিও বিদ্যমান, সে গুলিতে অশোকের সমসাময়িক বর্ণমালার এক একটি অক্ষর উৎকীর্ণ আছে।' মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া আমরা নিকটবর্ত্তী বৌদ্ধতীর্থ যাত্রিগণের জন্য নির্ম্মিত বিশ্রাম-গৃহে যাইয়া উপস্থিত হই। এখানে হলের ভিতর চিত্রগুলি দেখিয়া পূর্ত্তবিভাগের সব ডিভিসনেল অফিসার বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত শিবদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আফিস গৃহে যাই। এই মিষ্টভাষী বৃদ্ধের সঙ্গে মন্দির সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলাপ হইল। তিনি ইংরেজীতে বুদ্ধগয়া সম্বন্ধে একখানি Archeological Report লিখিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উহা ছাপিবার অবসর পান নাই। আমি প্রায় ২০ মিনিট কাল তাঁহার পাণ্ডুলিপি খানা পড়িলাম। সেখান হইতে বাহির হইয়া আমরা মহান্তজীর উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ তুল্য মঠের সিংহদ্বারে আসিয়া পৌঁছি। এখানে মহান্তজীর একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। সপ্তদশ শতাব্দে বুদ্ধগয়ার নীরব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ধমন্তি নাথ গিরি একদল সন্ন্যাসীর সহিত এখানে আসিয়া মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারা শঙ্করাচার্য্য প্রচলিত 'গিরি' শ্রেণীভুক্ত। মহান্ত-জীর সর্ব্ববিষয়ে অসীম ক্ষমতা। বর্ত্তমান মঠ ৩১৫ বৎসরের উপর এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহান্তজী বোধিমন্দিরের

মালিক। ১১২৪ ফসলিতে (১৭২৭ খৃঃ) সম্রাট্ মহম্মদ ফরোক-সিয়ার এই মন্দির সহ চতুর্দ্দিকের তারাদিয়া পল্লী (বিশ হাজার বিঘা জমি) তদানীন্তন মহান্তজীকে উপহারস্বরূপ দান করিয়াছিলেন।

বোধিগয়া মন্দিরের বর্ত্তমান রক্ষক মহান্তজী কৃষ্ণ দয়ালু গিরি বড়ই সরল ও উদারচেতা। ইনি দেখিতে যেমন সুপুরুষ, ইহাঁর নৈতিক ও ধর্ম্মবলও যথেষ্ট আছে। ইনি নেপাল দেশীয় ব্রাহ্মণ। ইনি নিজে বিহার সংক্রান্ত সমস্ত কাজই পরিদর্শন করেন। জমিদারী হইতে ইহাঁর আয় বার্ষিক একলক্ষ টাকা। এতদ্ভিন্ন মহাবোধি মন্দির ও যাত্রিগণের প্রদত্ত উপহার প্রভৃতি হইতেও বেশ আয় হইয়া থাকে। ধর্ম্মানুষ্ঠান, অতিথিশালা, বিদ্যালয়, কাঙ্গালী ও সন্ন্যাসী ভোজন প্রভৃতি ব্যাপারে ইনি বহু অর্থ ব্যয় করেন।

পূর্ব্বদিকের দ্বিতল তোরণের ভিতর দিয়া আমরা প্রাচীর বেষ্টিত মঠে প্রবেশ লাভ করি। ভিতরে বড় একটি রাস্তা বিস্তৃত দেখিলাম। বাড়ীগুলি ত্রিতল। স্থানে স্থানে চারিতল বাড়ীও দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের ডানদিকে মহান্তজীর অনেকগুলি বড় বড় গরু, উট, হাতী ও ঘোড়া দেখিতে পাইলাম। আমরা মহান্তজীকে দেখিতে চাহিলাম। তখন তিনি সন্ন্যাসী ভোজনে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দেখি বহু ভিখারী আহারে বসিয়াছে। এখানে একটি বহু প্রাচীন পাত্রে দরিদ্রদিগকে চাউল বিতরণ করা হয়। কথিত আছে ভগবতী অন্নপূর্ণা মহান্তদের দান, ধ্যান ও সদনুষ্ঠানে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই 'অফুরন্ত পাত্রটি' মহাদেব গিরিকে

দান করিয়াছিলেন। ইনি ১৬৪০ হইতে ১৬৮২ অব্দে গদিতে ছিলেন। ভগবতীর আদেশ ছিল যে এই পাত্র হইতে দরিদ্রকে চাউল বিতরণ করিলে কখনও মঠে অন্নের অভাব হইবে না।

মহান্তজীর গৃহ প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া আমরা গাড়ীতে উঠি। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা ব্রাহ্মযোনি ও অক্ষয়বট দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া আসি।

---

# ডাক্তার সপুনারের নূতন আবিষ্কার। *

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত দানবীর শ্রীযুক্ত রতন তাতা পাটলিপুত্র খননের ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হওয়ায় বিগত ১৯১২ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী স্যর্ জন মার্শাল পাটলিপুত্রে আগমন করেন এবং ডাক্তার ডি, বি, সপুনারের সহিত পরামর্শ করিয়া কুমরাহার ও বুলন্দিবাগ নামক দুইটি স্থান খনন করিতে উপদেশ দেন। ১৯১৩ খৃঃ ৬ই জানুয়ারী ডাঃ সপুনারের তত্ত্বাবধানে প্রথম খনন কার্য্যারম্ভ হয়। এই খননে পাটলিপুত্র, অশোক ও বৌদ্ধ ইতিহাসের অনেক নূতন উপাদান সংগৃহীত হইতেছে। বিগত বর্ষে (১৯১৪ খৃঃ) ডাক্তার সপুনার কুমরাহারে (site no III) মৃত্তিকা নির্ম্মিত একখানি 'প্লাক' (Plaque measures 41'8" by 35/8" অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে ২৭ হাত ১৪ ইঞ্চি ও প্রস্থে ২৩ হাত ১৪ ইঞ্চি) এক ফিট্ ৬ ইঞ্চি মৃত্তিকা গর্ভ হইতে বাহির করিয়া বোধগয়া মন্দিরের প্রচলিত ইতিহাসকে একটু নাড়াচাড়া দিয়াছেন। মানুষ বহুদিন হইতে যে কথাটী সত্য

---

* বিহার ও উড়িষ্যার অনুসন্ধান সমিতির ত্রৈমাসিক জর্নালের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'The Bodh Gaya Plaque' প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

বোধগয়া ফলক
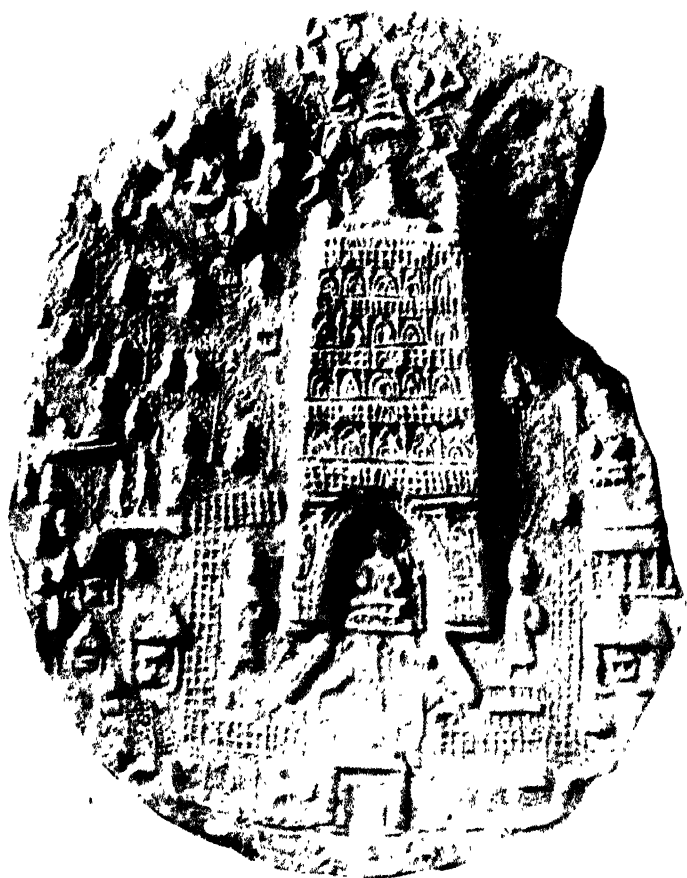
বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে আজ হঠাৎ সেই সত্যের মূলে কেহ ধাক্কা দিলে তাহা সমাজের অধিকাংশ লোকই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে চায় না। তবে বড় একটা শক্তি আসিয়া যখন নূতন সত্য প্রচার করে তখন তাহা আজ হউক কাল হউক সকলকেই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে। একখানি মৃণ্ময় মূর্ত্তি ( Plaque ) প্রাচীন বোধগয়া মন্দিরের আকার ও অবয়বের যে অনাবিষ্কৃত তত্ত্ব বাহির করিয়াছে তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। জীর্ণ সংস্কারে বর্ত্তমান মন্দিরটীকে যে ভাবে ও আকারে দেখিতে পাই পাটলিপুত্রে আবিষ্কৃত 'প্লাকের' সঙ্গে তাহার বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ডাঃ সপুনার বলেন কানিংহাম সাহেব ১৮৮০ অব্দে বোধিমন্দিরের সংস্কারের সময় এই 'প্লাক' খানি পাইলে বোধ হয় মন্দিরের মৌলিক গঠন কিরূপ ছিল তাহা ঠিক ঠিক রূপে বুঝিতে পারিতেন। কেবল কানিংহামের সময়ই নয় পূর্ব্ববর্ত্তী কালে যখনই এই মন্দিরের কোনরূপ সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, সেই সঙ্গে ইহার স্থাপত্যেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হুয়েনস্তাঙ্ ইহার গঠন প্রণালীর যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে এক্ষণে মন্দিরের বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দে ব্রহ্মদেশবাসিগণের দ্বারা এই মন্দির সংস্কারের সময় ব্রহ্মদেশীয় স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্য কতক পরিমাণে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মোটকথা বিভিন্ন যুগের সংস্কারে ইহার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের মৌলিকতা অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়া এক্ষণে উহা এক নূতন মন্দিরে পরিণত হইয়াছে।

প্লাক খানি বিশেষভাবে পরীক্ষার পর ডাঃ সপুনার স্থির করিয়াছেন 'যেখানে ইহা পাওয়া গিয়াছে সেই স্থান একটি গোরস্থানের উত্তরে অবস্থিত। এই সমাধিস্তূপ পারস্যের প্রাচীন রাজধানী পর্সিপলিস্ নগরের সম্রাট্ ডরাউস্-নির্ম্মিত হর্ম্ম্যাবলীর অনুরূপ।' এইস্থানে মৃত্তিকাস্তরের এত উর্দ্ধে কি করিয়া প্লাক খানি আসিল সে সম্বন্ধে ডাঃ সপুনার বলেন,—'it must be due to some disturbance of the soil' ভূকম্প অথবা অন্য কোন কারণে উৎক্ষিপ্ত ভূস্তরের সহিত প্লাক খানি উর্দ্ধে আসিয়া পড়িয়াছে। উক্ত ভূমির সন্নিকট ৬ ফিট্ মাটীর নীচে কুশান যুগের বহু তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে ডাঃ সপুনার অনুমান করেন 'প্লাক খানা সম্ভবতঃ কুশান যুগের, অন্ততঃ ২য় অথবা ৩য় শতাব্দের হইবে।' * * * * 'প্লাকের সম্মুখভাগ অতি অল্প মাত্রায় সংবৃত-মধ্য (concave), পশ্চাদ্ভাগ কুব্জপৃষ্ঠ। পশ্চাদ্ভাগে ধরিবার জন্য দুইটি (সম্ভবতঃ চারিটি ছিল) বাঁট দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ প্রয়োজন ছিল না বলিয়া এই পশ্চাদ্ভাগ অত্যন্ত সাদাসিদে রকমের প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু সম্মুখভাগ উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত। ইহার মাঝখানে বোধগয়া মন্দিরের অতি উৎকৃষ্ট প্রাচীনতম চিত্র অঙ্কিত।' * এই মন্দিরের বাহ্যদৃশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন,—'We see a tall tower-like

* 'Unquestionably the oldest drawing of this building in existence.'

structure, with four stories or tiers with niches above the main cella, the whole being surmounted by a complete stupa with five-fold *hti*'

ডাঃ সপুনার বলেন, 'বর্ত্তমান প্লাক দেখিয়া বুঝা যায় যে মন্দিরের চূড়ার গঠনপ্রণালী ঐতিহাসিক সূত্রে ভুল। প্রধান অংশটী আংশিক ভাবে অনাবৃত ; সুবৃহৎ খিলানের মধ্যপথে সোজাসুজি মন্দিরের দিকে তাকাইলে বুদ্ধদেবের আসীন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূল মন্দিরের বাহিরে, প্রধান মন্দিরাংশের দক্ষিণে ও বামদিকে আরও দুইটি দণ্ডায়মান মূর্ত্তি আছে ; ইহাদের দেবভাব চতুর্দ্দিকের মহিমামণ্ডিত জ্যোতির্মণ্ডল হইতে প্রতিপন্ন হয়। সম্ভবতঃ এই মূর্ত্তিই চৈন পরিব্রাজকের বর্ণিত বোধিসত্ত্বের রৌপ্যমূর্ত্তি, কিন্তু ইহার কোনও চিহ্ন এখন আর নাই। বহুমূল্য ধাতুসংযোগে পবিত্র মূর্ত্তিগঠন করা ভুল বলিতে হইবে। আরও দূরে এবং উভয় মন্দিরের চতুর্দ্দিকে এবং এই সকল বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি ঘিরিয়া বিখ্যাত রেলিং বা বেষ্টনী আছে। ইহা সাধারণতঃ অশোকরেলিং বলিয়া কথিত হয় এবং বহু গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা মৌর্য্যদের সময়ের নয়, বরং তৎপরবর্ত্তী সুঙ্গরাজাদের সময়ের, কিম্বা আরও পরবর্ত্তী যুগের। এই রেলিং কেবল মন্দিরের পবিত্র অংশটুকু ও আঙ্গিনা ঘিরিয়া আছে। প্রশস্ত প্রাচীর ও সুউচ্চ প্রবেশদ্বার হইতেই ইহার বাহিরের সীমা বুঝিতে পারা যায়। এই প্রাচীর ও প্রবেশদ্বার প্লাকের নিম্নভাগে অতি সংক্ষেপে অল্প স্থানের উপর চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু সামান্য দুই

চারিটি রেখাপাত থাকিলেও প্রাচীর যে মন্দির ও তৎসংলগ্ন সমস্ত জমিটার বেষ্টনীস্বরূপ তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে।'

প্লাকের আর একটু বিশেষত্ব এই যে, মধ্যবেষ্টনীর প্রবেশ পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভের শীর্ষদেশে একটি হস্তী মূর্ত্তি; ইহার স্থাপত্য বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে অশোকের অন্যান্য বহু স্তম্ভের সহিত ইহার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় এবং ইহা যে রাজা অশোকেরই নির্ম্মিত তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শুধু ইহা হইতেই প্লাকের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। চৈন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যখন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের প্রারম্ভে বোধিগয়ায় আসিয়াছিলেন, তখন তিনি মৌর্য্যস্তম্ভের কোন চিহ্ন দেখিতে পান নাই, এমন কি তিনি সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখও করেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই উক্ত স্তম্ভটী পড়িয়া গিয়াছিল এবং ইহা হইতেই বুঝা যায় যে বর্ত্তমান প্লাকখানি ন্যূনপক্ষে চতুর্থ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে।

প্লাকে অতি অস্পষ্টভাবে খোদিত অক্ষর হইতেও উপরোক্ত মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হয়। অক্ষরগুলি এতই অস্পষ্ট যে উহা আলোক চিত্রে একেবারেই ফুটিয়া উঠে না। সুঙ্গন রেলিংএর মধ্যে প্রবেশ পথের বামপার্শ্বে অক্ষরগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ডাঃ সপুনার উহা পড়িতে পারেন নাই। তবে তিনি অনুমান করেন যে 'it is certain even so that the characters are those of the kharoshthi alphabet. This is indeed an unexpected feature, and one which is most suggestive.

It is the first epigraph in this Indian form of Perso-Aramaic to be found in eastern India.'

প্লাকের খোদিত মন্দির-প্রাঙ্গণ নিবিড় জঙ্গলে আবৃত, মাঝে মাঝে মন্দির, স্তূপ ও দেবমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। দুই একটি পূজারত ব্যক্তি এবং দুই একটি জীব জন্তুর (সম্ভবতঃ হস্তী) চিত্রও অঙ্কিত আছে। মূল মন্দিরের সর্ব্বোপরি আকাশে উড্ডীয়মান চারিটি দেবমূর্ত্তি এই পূণ্যভূমিকে পূজা করিতেছে এইভাবে চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রকার নানা মূর্ত্তি অথবা পৃথক্ পৃথক্ মন্দিরের চিত্র হইতে কোন্‌টি যে কি তাহা ঠিক করিয়া বুঝিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ প্লাকের শিল্পী চিত্রে ব্যক্তিত্ব অথবা বস্তু নির্দ্দেশের জন্য প্রয়াস পান নাই। পাটলিপুত্র খননে বোধগয়ার প্লাক কি করিয়া যে আবিষ্কৃত হইল সে সম্বন্ধে ডাঃ সপুনার প্রবন্ধের উপসংহারে বলিয়াছেন—'ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। অসংখ্য বৌদ্ধযাত্রী পুণ্যক্ষেত্র বোধগয়ায় আসিয়া মন্দিরের 'প্লাক' খরিদ করিয়া দেশে লইয়া যাইতেন।' † সম্ভবতঃ তীর্থযাত্রীরা বোধগয়া হইতে ইহা গৃহে আনিয়া থাকিবেন। ইহা নিশ্চয় যে আমাদের খনন ভূমির সন্নিকটে খৃষ্টশতাব্দের

† 'Such plaques as these, although this is an unusually elaborate one, were seemingly manufactured at the various sacred sites and sold to pilgrims, who then brought them to their several homes as souvenirs or mementoes of their pilgrimage.'

আদিযুগে কোন বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং সম্ভবতঃ বিহারের কোন ভিক্ষু বোধগয়া হইতে এই প্লাকখানি আনিয়া থাকিবেন *' ইহাই প্লাকের আদ্যোপান্ত ইতিহাস।

---

* বর্ত্তমান যুগেও আমরা বহু পুণ্যস্থানের মন্দির ও দেবতার প্লাক বা মৃণ্ময়মূর্ত্তি খরিদ করিয়া থাকি। পূর্ব্ববঙ্গে ধামরাই মাধবের মৃণ্ময়মূর্ত্তি ধনী-দরিদ্র সকল হিন্দুর গৃহেই দেখিতে পাওয়া যায়।

# গয়ার প্রাচীনত্ব।

বর্ত্তমানে হিন্দুগয়ার প্রাচীনত্বের মৌলিক অনুসন্ধান বড়ই জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ এদিকে অগ্রসর হইতে হইলেই একটা নূতন ভাবপ্রবাহকে ঠেলিয়া যাইতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা বোধগয়ার তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত ছিলেন, অবসর সময়ে হিন্দুগয়ার ইতিহাসের অতি সামান্যই আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনাও বৌদ্ধভাবপ্রসূত, কারণ উহাতে দেখা যায়—'বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয় ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করাই গয়া-মাহাত্ম্যের উদ্দেশ্য, গয়াসুর বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণের পরিকল্পনা ভিন্ন কিছুই নয়' এইরূপে হিন্দুগয়াকে বৌদ্ধভাবের সহিত মিশাইয়া তাঁহারা মৌলিক অনুসন্ধানের পথ অধিকতর দুর্গম করিয়া রাখিয়াছেন। শাস্ত্রের দিকে একটু লক্ষ্য থাকিলে তাঁহাদের ন্যায় প্রতিভাশালী পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের ভিতর হইতেই হিন্দুগয়ার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিয়া হিন্দু-সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারিতেন।

হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট নানাদিক্ দিয়া ঋণী, কেবল হিন্দুধর্ম্মে নয়, তুর্কী, পারস্য, এমন কি রোমান কাথলিকদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, পূজা-পদ্ধতিতেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। এই প্রয়াণের অনেক

নূতন কথা যে আজ চারিদিকে আমরা শুনিতে পাই ইহা তাঁহাদেরই অনুসন্ধানের ফল বলিতে হইবে।

আমার কোনও বন্ধু একটি দীর্ঘিকায় প্রাপ্ত ২।৪ খানা ইট-কাঠ আনিয়া আমাকে সে দিন বলিয়াছিলেন—'দেখুন, এ সবই বৌদ্ধ-যুগের। হিন্দুর পরে বৌদ্ধদের শুভাগমন হয়, তাঁহাদের নিকটেই পরবর্ত্তী কালে হিন্দুরা দেবমূর্ত্তি ও মন্দির গঠন প্রণালী শিখিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষের যে তীর্থে যাবেন সেখানেই বৌদ্ধকীর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। কাশী বলুন, গয়া বলুন সব তীর্থই বৌদ্ধদের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।' মোটকথা আজকাল একদল শিক্ষিত ভারতবাসী মাটী খুড়িয়া যাহা কিছু ইট-কাঠ ও শিলা-লিপি পাইবেন তাহাতেই বৌদ্ধচিহ্ন দেখিতে পান। তাঁহারা মৃত্তিকাগর্ভ ও দীর্ঘিকা হইতে কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলেই প্রথমে 'ইহা অশোক যুগের কি কুশান যুগের' এই প্রণালীতে তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া লইয়াছেন, হিন্দুদের এসব ছিল কিনা না সন্দেহ, তাঁহারা অরণ্যে বসিয়া নিয়ত উপনিষদের ধ্যানে বিভোর থাকিতেন। কিন্তু যখন বিরাট্ বৌদ্ধধর্ম্মের ধাক্কা আসিয়া সনাতন ধর্ম্মের গায়ে লাগিল, তখন তাঁহারা উপনিষদের 'ঘুমঘোর' হইতে জাগিয়া উঠিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। এই জাগরণের ফলে নাকি আমরা হিন্দু ও বৌদ্ধের সংঘর্ষ, পুরী ও গয়ায় বৌদ্ধমূর্ত্তির উপর হিন্দু-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। এই যে দেশীয় ও বিদেশীয় কতিপয় পণ্ডিত হিন্দুর ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্ম ও সভ্যতার প্রভাবে বিজড়িত

করিতেছেন এই চেষ্টা তাঁহাদের জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক বটে, কিন্তু ইহাতে যে একটা খাঁটি সত্যকে বৃথা চাপা দেওয়া হইতেছে তাহার প্রমাণ তাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্রেই দেখিতে পাইবেন। যাহা হউক এসব বিরোধ মীমাংসার প্রকৃত অধিকারী বলিয়া আমি নিজকে মনে করি না। আমি শুধু জানি ও বিশ্বাস করি এবং সনাতন ধর্ম্মের ভাবসাধনার ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায় শাস্ত্রের বিধানমত যখন যুগের উপযোগী করিয়া হৃদয়স্থ দেবতাকে বহিঃস্থ দেবতায় পূজা করা হইয়াছিল তখনই ভারতে সাধু-সজ্জনের সম্মিলনস্থলে মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগত সেদিনকার কথা, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে গয়াতীর্থ হিন্দু নরনারীর নিকট পরিচিত ছিল। পিতৃপূজা হইতেই গয়াতীর্থের উৎপত্তি। এই পিতৃপূজা কত যুগযুগান্তর হইতে যে আর্য্যজাতির ভিতর প্রচলিত তাহার গণনা কতকগুলি সীমাবদ্ধ বি, সি ( B. C. ) অথবা এ, ডিতে ( A. D. ) হইতে পারে না। বি সি ও এডির প্রতিষ্ঠাতৃগণ ত সেদিনকার জাতি। জাতিবিশেষের বয়োবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সহিত দূরদৃষ্টি জন্মিলে তখন পূর্ব্বের ভ্রান্ত সংস্কার দূরীভূত হয়। অষ্টম অথবা নবম শতাব্দের বহু পূর্ব্বে যে গয়া সর্ব্বত্র তীর্থ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, বৌদ্ধভাব-মুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর হিন্দুগয়ার প্রাচীনত্বের গবেষণায় এমন কিছু প্রামাণিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই যাহাতে হিন্দুসমাজ তাঁহাদের পূর্ব্ব সংস্কার ভ্রান্ত

বলিয়া ছাড়িতে বাধ্য হইবেন। হইতে পারে বর্ত্তমান বিষ্ণুপদ মন্দির বেশী দিনের নয়, ইহা বিভিন্নযুগে সংস্কারের সময় নানা শিল্পীর হাতে পড়িয়া নূতন একটি মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্দিরের স্থাপত্য দেখিয়াই গয়াতীর্থের প্রাচীনত্বে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। সম্প্রতি পাটলিপুত্র খননে ডাঃ স্পুনার একখানা 'প্লাক' আবিষ্কার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বোধগয়া মন্দিরের সহিত প্রাচীন মূল মন্দিরের অনেক বিষয়ে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। তাহা বলিয়া বোধগয়া মন্দির ১৮৮০ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল অথবা ১৮৮০ অব্দের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে প্রচারিত হয় নাই একথা বোধ হয় দুই হাজার বৎসর পর ভাবী প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলিবেন না। স্থূলকথা গয়া অথবা পুরীর প্রাচীনত্ব মীমাংসার জন্য আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা শাস্ত্রে যে তত্ত্ব আলোচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাই আমাদের সন্দেহ নিরাকরণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। আমার বিশ্বাস বর্ত্তমান যুগে হিন্দু সমাজের অনেকেই ঋষিকথিত তত্ত্বে অধিকতর আস্থা স্থাপন করিয়া থাকেন।

গয়ার প্রাচীনত্ব মীমাংসায় কবিসম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় এই গ্রন্থের প্রারম্ভে ভূমিকায় শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য সহজ ও সরল মীমাংসায় পরিপূর্ণ। ইহা গয়ার প্রাচীনত্ব নিরূপণে কতদূর প্রামাণিক তাহা হিন্দুসমাজের সুধীমণ্ডলী বিচার করিয়া দেখিবেন।

---

# গয়াজিলা ও গয়া সহরের সেন্সস্

বা

## আদম সুমারির বিবরণ।

### ক

বর্ত্তমান অধিবাসী সংখ্যা, গ্রাম ও সহরের সংখ্যা :—

| | |
|---|---|
| সহর | ৭ |
| গ্রাম | ৬১৮৭ |
| সহরে জন সংখ্যা | ২০,২৮৬ |
| গ্রামে ,, | ৪,০১,৮৩৪ |
| মোট জনসংখ্যা | ২১,৫৯,৪৯৮ |

### খ

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে জন সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি :—

| | |
|---|---|
| ১৯১১ | ২১,৫৯,৪৯৮ |
| ১৯০১ | ২০,৫৯,৯৩৩ |
| ১৮৯১ | ২১,৩৪,৩৩১ |
| ১৮৮১ | ২১,২৪,৬৪২ |
| ১৮৭২ | ১৯,৪৭,৪২৪ |

১৮৭২ খৃঃ হইতে স্ত্রী-পুরুষ হিসাবে জনসংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধিঃ—

| | পুরুষ | | স্ত্রী |
|---|---|---|---|
| ১৯১১ | ১০,৬১,২৯১ | : | ১০,৯৮,২০৭ |
| ১৯০১ | ১০,১১,২৭১ | : | ১০,৪৮,৬৬২ |
| ১৮৯১ | ১০,৪৫,০১১ | : | ১০,৯৩,৩২০ |
| ১৮৮১ | ১০,৪৩,৪৪১ | : | ১০,৮১,২৪১ |
| ১৮৭২ | ৯,৫৩,২০৫ | : | ৯,৯৪,৬১৯ |

| | | |
|---|---|---|
| ১৯০১—১৯১১ | বৃদ্ধি + | ৯৯,৫৬৫ |
| ১৮৯১—১৯০১ | হ্রাস − | ৭৮,৩৯৮ |
| ১৮৮১—১৮৯১ | বৃদ্ধি + | ১৩,৬৪৯ |
| ১৮৭২—১৮৮১ | ,, + | ১,৭৬,৮৫৮ |

বিগত ৪০ বৎসরের মোট ফল বৃদ্ধি + ২,১১,৬৭৪ জন।

## গ

লোক সংখ্যানুসারে গ্রাম ও সহরের শ্রেণী বিভাগ :—

| | |
|---|---|
| বাসযোগ্য গ্রাম ও সহরের সংখ্যা | ৬১৯৪ |
| মোট লোক সংখ্যা | ২১,৫৯,৪৯৮ |
| ৫ শত লোকের কম অধিবাসী | |
| গ্রামের সংখ্যা | ৪,৯৯৬ |
| লোক সংখ্যা | ৯,০৬,৬৬০ |
| দেড় হাজার লোক অধিবাসী | |
| গ্রামের সংখ্যা | ৮৪৫ |

লোক সংখ্যা ৫,৮২,৫৪২

দেড় হাজার—দুই হাজার অধিবাসী

গ্রামের সংখ্যা ২৯৫

লোক সংখ্যা ৩,৯৪,৭১৯

২ হাজার—৫ হাজার অধিবাসী

গ্রামের সাংখ্যা ৫০

লোক সংখ্যা ১,৩৯,২৯৫

৫ হাজার—১০ হাজার অধিবাসী

গ্রামের সংখ্যা ৬

লোক সংখ্যা ৩৯,৩৯৪

১০ হাজার—২০ হাজার অধিবাসী

গ্রামের সংখ্যা ১

লোক সংখ্যা ১৪,৬০৮

২০ হাজার—৫০ হাজার অধিবাসী

গ্রামের সংখ্যা ১

লোক সংখ্যা ৪৯,৫৯৬

## গয়া

১৮৭২ খৃঃ হইতে লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে গয়া সহরের শ্রেণী বিভাগ :—

১৯১১ ৪৯,৯২১

১৯০১ ৭১,২৮৮

| | |
|---|---|
| ১৮৯১ | ৮০,৩৮৩ |
| ১৮৮১ | ৭৬,৪১৫ |
| ১৮৭২ | ৬৬,৮৪৩ |

| | পুরুষ | স্ত্রী |
|---|---|---|
| ১৯১১ | ২৬,৩১০ | ২৩,৬১১ |
| ১৯০১ | ৩৬,৫৫৩ | ৩৪,৭৩৫ |
| ১৮৯১ | ৪০,৮৯৩ | ৩৯,৪৯০ |

হ্রাস-বৃদ্ধি

| | |
|---|---|
| ১৯০১—১৯১১ | হ্রাস — ২১,৩৬৭ |
| ১৮৯১—১৯০১ | ,, — ৯,০৯৫ |
| ১৮৮১ — ১৮৯১ | বৃদ্ধি + ৩৯৬৮ |
| ১৮৭২—১৮৮১ | ,, + ৯৫৭২ |
| মোট ফল | হ্রাস — ১৬,৯২২ |

## ও

ধর্ম্মানুসারে গয়া সহরের জনসংখ্যা :—

| | | |
|---|---|---|
| হিন্দু | পুং | ১৯,৮৪৬ |
| | স্ত্রী | ১৭,৫৭৪ |
| | | মোট ৩৭,৪২০ |
| ব্রাহ্ম | পুং | ২ |

শিখ পুং ৩
স্ত্রী ১
মোট ৪

জৈন পুং— ৫৮
স্ত্রী— ৩৯
মোট—৯৭

মুসলমান পুং— ৬২৩৬
স্ত্রী— ৫৮৬২
মোট—১২,০৯৮

খৃষ্টান পুং— ১৫৯
স্ত্রী— ১৩১
মোট—২৯০

বৌদ্ধ পুং— ৬
স্ত্রী— ৪
মোট—১০

হিন্দু
অবিবাহিত পুং— ৬,১৬৯
স্ত্রী— ৪,০৫৫
বিবাহিত পুং—১১,৫৮২
স্ত্রী— ৮,৬৬৯
বিপত্নীক ২,০৯৫

| | |
|---|---|
| বিধবা | ৪,৮৫০ |

মুসলমান

| | |
|---|---|
| অবিবাহিত | পুং—২৩২৫ |
| | স্ত্রী—১৫৮২ |
| বিবাহিত | পুং—৩৪৭৬ |
| | স্ত্রী—২৮৬৩ |
| বিপত্নীক | ৪৩৫ |
| বিধবা | ১৪১৭ |

চ

ধর্ম্মানুসারে গয়া জিলার লোক সংখ্যা :—

| | |
|---|---|
| হিন্দু | ১৯,৩৬,৮৩৬ |
| মুসলমান | ২,২১,৯৪৩ |

হিন্দু

| | |
|---|---|
| অবিবাহিত | পুং—৩,৯৪,৪৬০ |
| | স্ত্রী—২,৮৯,২৬১ |
| বিবাহিত | পুং—৪,৯৫,৬৫৯ |
| | স্ত্রী—৫,১২,৭৫৬ |
| বিপত্নীক | ৭১,৯২৮ |
| বিধবা | ১,৭২,৭৭০ |

মুসলমান

| | |
|---|---|
| অবিবাহিত | পুং—৪৬,৬৪৩ |

স্ত্রী—৩৭,০৪৬

বিবাহিত পুং—৪৬,৩৩৬

স্ত্রী—৬১,১৪৩

বিপত্নীক ৫,৮৫৩

বিধবা ২৪,৯২২

## ২

গয়া জিলার শিক্ষিত অশিক্ষিতের সংখ্যা :—

হিন্দু শিক্ষিত পুং—৭৮,৪৪৯

স্ত্রী— ৩,৩৫০

অশিক্ষিত পুং—৮,৮৩,৫৯৩

স্ত্রী—৯,৭১,৪৩৭

ইংরেজী অভিজ্ঞ পুং—২৫৫১

স্ত্রী— ৩০

মুসলমান শিক্ষিত পুং—১০,৮৭৫

স্ত্রী— ৬০৮

অশিক্ষিত পুং—৮৭,৯৫৭

স্ত্রী—১,২২,৫০৩

ইংরেজী অভিজ্ঞ পুং— ৭৩৪

স্ত্রী— ১

## ঞ

গয়া সহরের শিক্ষিত অশিক্ষিতের সংখ্যা :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| হিন্দু | শিক্ষিত | পুং— | ৪৬৮২ |
| | | স্ত্রী— | ৩৭৩ |
| | অশিক্ষিত | পুং— | ১৫,১৬৪ |
| | | স্ত্রী— | ১৭,২০১ |
| | ইংরেজী অভিজ্ঞ | পুং— | ৯৭০ |
| | | স্ত্রী— | ১৬ |
| মুসলমান | শিক্ষিত | পুং— | ১৪২৩ |
| | | স্ত্রী— | ১১৪ |
| | অশিক্ষিত | পুং— | ৪৮১৩ |
| | | স্ত্রী— | ৫৭৪৮ |
| | ইংরেজী অভিজ্ঞ | পুং— | ৩০০ |
| | | স্ত্রী— | ১ |

## ঝ

ভাষার হিসাবে গয়া জিলার জন সংখ্যা :—

| | |
|---|---|
| হিন্দি | ২০,৬৬,৯৪৪ |
| উর্দ্দু | ৯০,১৭৩ |
| বাঙ্গালা | ১,৩৬৬ |
| গুজরাটী | ৭৮ |

| | |
|---|---|
| কাকচি | ২ |
| মহারাষ্ট্রী | ১৫০ |
| মারওয়ারী | ২৯২ |
| নৈপালী | ২ |
| পাঞ্জাবী | ২১ |
| পাস্টো | ১২ |
| সাঁওতালি | ১১১ |
| ওরাং | ৮ |
| তামিল | ১৩ |
| টেলেগু | ১৪ |
| ভুটিয়া | ৬ |
| অন্যান্য | ৪৯ |
| চীনা | ১ |
| ইংরেজ | ২৫২ |
| জর্ম্মান | ২ |

এও

গয়া জিলার রোগীর সংখ্যা :—

| | |
|---|---|
| মোট | পুং—৩৫৭১ |
| | স্ত্রী—২৪৫৬ |
| | ৬০২৭ |
| উন্মাদ | পুং—১৩৫ |

| | |
|---|---|
| | স্ত্রী—১০২ |
| | ২৩৭ |
| মূক ও বধির | পুং—৬০৬ |
| | স্ত্রী—৪১১ |
| | ১,০১৭ |
| অন্ধ | পুং—১৭২৭ |
| | স্ত্রী—১৭৪১ |
| | ৩৪৬৮ |
| কুষ্ঠরোগী | পুং—১১১৩ |
| | স্ত্রী—২০৯ |
| | ১৩২২ |

## ট

| | |
|---|---|
| গয়া সহরের পরিমাণ ফল | ৮ বর্গ মাইল |
| বাসযোগ্য গৃহ | ১১, ৯৫২ |
| জনসংখ্যা—১৯১১ | পুং—২৬৩১০ |
| | স্ত্রী—২৩৬১১ |
| | মোট ৪৯,৯২১ |
| | ১৯০১ খৃঃ—মোট ৭১,২৮৮ |

Percentage of Variation ( শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধি )

| | |
|---|---|
| ১৯০১—১৯১১ | —২৯,০৯৭ |
| ১৮৯১—১৯০১ | —১১,০৩১ |

প্রতিবর্গ মাইলে জনসংখ্যা :—

১৯১১ ৬২৪০

১৯০১ ৮৯১১

১৮৯১ ১০,০৪৮

ঠ

বুদ্ধগয়ার জনসংখ্যা :—

পুং—১৭,৮৮৬

স্ত্রী—১৮,৬৭০

মোট ৩৬,৫৫৬

হিন্দু পুং—১৬,৩৫১

স্ত্রী—১৬,৪৭১

মুসলমান পুং—১৫২৬

স্ত্রী—১৭৯৯

অন্যান্য ধর্মাবলম্বী পুং— ৯

ড

টিকারীর জনসংখ্যা :—

পুং—৮২,৩১৭

স্ত্রী—৮৩,২৯৩

মোট ১,৬৫,৬১০

হিন্দু পুং—৭৫,০৫২

স্ত্রী—৭৪,১৭৭

| | |
|---|---|
| মুসলমান | পুং—৭,২৫৪ |
| | স্ত্রী—৯,১০৫ |
| খৃষ্টান | পুং—১ |
| অন্যান্য | ২১ |

ড

মহল্লা হিসাবে গয়ালীদের গৃহসংখ্যা :—

| মহল্লা | সংখ্যা |
|---|---|
| সিসোরিয়া চৌরা | ৫ ঘর |
| কৃষ্ণ-দ্বারিকা | ৭ ,, |
| চানচৌরা | ৪ ,, |
| শুকমনা মহাদেব | ৭ ,, |
| মুরচা ও কাটগাছী | ৩২ ,, |
| হনুমান গাছী | ৫ ,, |
| দেওনাপুর | ৩ ,, |
| নেওয়া গাড়হী ও বছয়ার বোড়া ব্রাহ্মণীঘাট | ২৬ ,, |
| কারসিল্লি | ৭ ,, |
| উপডিড | ২৪ ,, |
| দেওচৌড়া | ৬ ,, |
| | মোট ১২৬ ঘর |

# THE BODH GAYA PLAQUE.

By Dr. D. B. Spooner, B. A., Ph. D.

The original of the terracotta plaque * * * * * was found in Mr. Ratan Tata's excavations at Pataliputra in the year 1914, and is published * by the kind permission of Mr. Tata and of Sir John Marshall. The plaque measures $4\frac{1}{8}$" by $3\frac{5}{8}$", and was recovered at Site No. III on the terrace of Kumrahar, only one foot six inches below the surface. The spot in question is the north side of the big graveyard mound which corresponds in so many details with the palace of Darius at Persepolis, but the site appears to have been built over at successive periods, and the present plaque of course appertains to one of these later strata. The depth at which it was found is not significant of its age. It must be due to some disturbance of the soil, some digging in fairly recent times, which brought this ancient terracotta to the surface. Closely in the same neighbourhood, but at a depth of six feet, was found a considerable hoard of copper coins of the Kushana period, and it is probable that the plaque dates from about the same epoch, say second or third century A. D. Originally. I dare say, it lay itself on about the same level as these coins.

The obverse or face of the original is very slightly concave. The reverse is equally convex, and shows, in addition to two rude bosses or projections, like diminutive legs, (there must have been four originally) a low flat handle by which it can be held. The reverse is of course very roughly finished, and was not intended for inspection. The obverse, on the other hand, is, as the reproduction shows, most elaborate. It bears the impress of a large die or seal whose central and principal device is a detailed representation of the

famous temple at Bodh Gaya, unquestionably the oldest drawing of this building in existence. We see a tall tower-like structure, with four stories or tiers with niches above the main cella, the whole being surmounted by a complete stupa with fivefold *hti*. This is the most unexpected feature of the whole, and would doubtless have been of special interest and value to General Cunningham, if he could have had our plaque at the time when the restoration of the temple was undertaken. As it was, Cunningham restored what would now seem to have been itself a Burmese restoration made at some intermediate date in ignorance of the original form. The finial which crowns the temple now is thus historically incorrect, so far as the evidence of our present terracotta is concerned. The cella is represented as partly open. We look through a large central archway directly into the sanctum, where we can behold the seated figure of the Buddha as it has doubtless been for many ages past. Outside this temple proper, to right and left of the cella, two further figures stand, whose divine nature is indicated by the haloes which they wear. These appear to be the two silver images of the Bodhisattvas which the Chinese pilgrim mentions, but of which, naturally enough, no traces now remain. It is a mistake to fashion sacred forms in precious substances. Further afield, and surrounding both the main temple and these nimbate Bodhisattvas, we see the famous railing of which portions are preserved even to our day. This is generally supposed to be an "Asokan" railing, and is so described in quite a number of books of reference and travel. In reality it is not of Mauryan date at all, but is to be assigned rather to the period immediately following, namely that of the Sunga kings, say second century B. C. or somewhat later still. This railing surrounds only the most sacred portion of the territory, and stands itself well within

the limits of the temple courtyard as a whole, whose outer limits are indicated by a massive wall with lofty entrance gate. This latter and outer wall appears only over a brief stretch at the bottom, or in the foreground, of our plaque, but it is apparently conceived of as surrounding the whole field of the terracotta, so that all that is shown in the very complex composition is to be understood as existing in reality within the main or outer wall. In other words, the plaque depicts the temple precincts as a whole.

Another unexpected feature is the tall column depicted as rising at the right side of the entrance of the inner rail. The pillar is crowned or surmounted by the figure of an elephant, and the style of the whole monument is so like that of all the known Asokan columns that it is impossible to doubt but what it was erected by this monarch. This alone shows the antiquity of the plaque, because when Fa Hien visited Bodh Gaya, at the beginning of the fifth century A. D., there seems to have been no Mauryan pillar in existence ; at least he mentions none. The column had presumably been overthrown before his time, which means that the present terracotta must date from before 400 A. D. at least.

The same conclusion is borne out by the faint traces of writing preserved to us upon its surface. The lettering is so very faint that I doubt if it will be apparent in the reproduction. It occurs just above, i.e., within the Sungan railing, being most visible on the left side of the entrance. Unfortunately I cannot decipher it ; but it is certain even so that the characters are those of the Kharoshthi alphabet. This is indeed an unexpected feature, and one which is most suggestive. It is the first epigraph in this Indian form of Perso-Aramaic to be found in eastern India.

The remainder of the plaque largely defies description. The temple compound, if I may use the

word, is shown as thickly wooded, with shrines and sacred images dotted here and there at intervals. One word, is shown as thickly wooded, with shrines and sacred images dotted here and there at intervals. One or two worshippers are shown, and two or more animals, apparently elephants. Above the finial of the main monument, moreover, four heavenly spirit or *devas* float in the air, in evident adoration of the sacred site. But neither these nor the separate shrines and images are susceptible of individualization or description. It is doubtful if they ever had specific meaning individually.

The presence of this Bodh Gaya plaque at Pataliputra need not surprise us. Such plaques as these, although this is an unusually elaborate one, were seemingly manufactured at the various sacred sites and sold to pilgrims, who then brought them to their several homes as souvenirs or mementoes of their pilgrimage. Doubtless, in the early centuries, some Buddhist monastery stood near the place where we recovered the plaque in excavation, some monastery built above the buried and perhaps forgotten palace, and the plaque before us was brought back from Gaya by some anchorite in this establishment. We owe him our most appreciative thanks. His piety has provided us with a document of fascinating interest, the oldest extant record of the most sacred shrine of ancient Buddhism. †

† প্রবন্ধ লেখক ডা. স্পুনার ও বিহার উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়, এম.এ., বি.এল মহাশয়দের অনুমতিক্রমে এই প্রবন্ধের মূল ইংরেজী অংশটুকু সমিতির পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত হইল।